বিশ্বসাহিত্যের আঙিনায়

প্রথম খণ্ড

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীনিভা মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৬৩

মুদ্রাকর :
শ্রীএককড়ি ভড়
নিউ শক্তি প্রেস
১০ রাজেন্দ্রনাথ সেন লেন
কলিকাতা-৬

শকুন্তলা

কল্যাণীয়াসু

সূচীপত্র

মুরাসাকি শিকিবু

আঃ ৯৭৮—১০১৬

সাহিত্যে মহিলাদের কৃতিত্বের উল্লেখযোগ্য নিদর্শনগুলি উপন্যাস শাখাতেই দেখা যায়। এটা স্বাভাবিক। উপন্যাস প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর। অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী ও প্রেমের কাহিনী। একজন সমালোচক বলেছেন, মানুষের দুটি প্রধান অনুভূতির—ভয় ও ভালোবাসার—প্রতীক এরা। ইতিহাসের প্রথম পর্বে যুদ্ধবিগ্রহ এবং অ্যাডভেঞ্চারের প্রাধান্য ছিল। তাই প্রাচীন সাহিত্য রচিত হয়েছে যুদ্ধ ও অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী কেন্দ্র করে। সংগ্রাম ও সঙ্কটে আসক্তি পুরুষোচিত গুণ। সুতরাং এ জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি করেছে পুরুষ। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসি প্রভৃতি পুরুষের রচনা।

একালে উপন্যাস বলতে আমরা যা বুঝি তার প্রধান বিষয়বস্তু হলো প্রেম এবং হৃদয়ের অন্যান্য অনুভূতি। পুরুষ কাজ নিয়ে ব্যস্ত; হৃদয়ানুভূতিকে লালন করে তাকে নিয়ে বিলাস করবার মতো স্বস্তি বা সুযোগ তার নেই। গৃহকোণে বসে মেয়েরাই মনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিস্তার করে কল্পনার জাল বুনতে পারে। রচনা করতে পারে ঘরোয়া জীবনের কাহিনী। উপন্যাসে তাই নারীসুলভ গুণের প্রাধান্য। বোধ হয় এই কারণেই প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে প্রথম উপন্যাস আমরা পেয়েছি একজন লেখিকার কাছ থেকে। এই লেখিকা জাপানের মুরাসাকি শিকিবু। তাঁর বৃহদাকার উপন্যাস 'গেঞ্জি মনোগাতারি' দিয়েই আধুনিক উপন্যাসের যাত্রা শুরু হয়েছে। ফরাসী কথা-সাহিত্যে নবযুগ প্রবর্তনের গৌরব দাবি করতে পারেন মাদাম দ্য লা ফায়েৎ। আধুনিক ইংরেজী উপন্যাসেও জেন অস্টিন এবং ব্রন্টি ভগিনীরা নতুন ধারার প্রবর্তন করেছেন।

প্রথমের গৌরবের সঙ্গে সাধারণতঃ অপরিণতির অবজ্ঞা ওতপ্রোত-ভাবে মিশে থাকে। কিন্তু গেঞ্জি মনোগাতারি প্রথম হলেও শিল্পকর্ম হিসাবে অপরিণত নয়। বরং এই প্রথম উপন্যাসটি আজ বিশ্ব-সাহিত্যের একটি ক্লাসিক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রাচ্যের একটি বই এ সম্মান সহজে পায়নি। আর্থার ওয়েলিকৃত গেঞ্জি মনোগাতারির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। তার পূর্ব পর্যন্ত পাশ্চাত্যের সমালোচকরা এ বইয়ের যথার্থ মর্যাদা দেননি। ভাষার বাধা দূর হয়ে যাবার পর সাহিত্যের একটি নতুন জগৎ অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হলো। এই ঐশ্বর্যময় জগতের সঙ্গে পরিচিত হবার পর সমালোচকরা গেঞ্জির কাহিনীকে ডেকামেরন, ডন কুইকসট প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেউ কেউ মুরাসাকির রচনায় এতই আধুনিকতার লক্ষণ দেখতে পেয়েছেন, মনোবিজ্ঞানের এমন সুষ্ঠু প্রয়োগ লক্ষ্য করেছেন যে, তাঁদের গেঞ্জির কাহিনী পড়তে পড়তে বার বার মনে পড়েছে প্রুস্তের 'রিমেমব্র্যান্স অব থিংস্ পাস্ট'-এর কথা। আসলে গেঞ্জি মনোগাতারির স্বাতন্ত্র্য এত স্পষ্ট যে, অন্য কোনো উপন্যাসের সঙ্গে এর তুলনা করা চলে না।

হেইয়ানকিয়ো শহর প্রতিষ্ঠিত হয় ৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। জাপানের ইতিহাসে হেইয়ান যুগের আরম্ভও হয়েছে সেই বছর থেকে। কামাকুরা সামরিক সরকার ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে শাসনভার গ্রহণ করবার পর হেইয়ান যুগের সমাপ্তি ঘটে। হেইয়ান যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল হেইয়ানকিয়ো নগর। গেঞ্জির কাহিনীতে এই নগরের—বিশেষ করে রাজপ্রাসাদের—জীবন প্রতিফলিত হয়েছে।

হেইয়ান আমলে ফুজিওয়ারা পরিবারের ছিল প্রবল প্রতিপত্তি। সম্রাট ছিলেন নামে মাত্র: আসলে রাজ্য শাসন করত এই ফুজিওয়ারা পরিবার। দেশের সর্বত্র এই পরিবারের লোক ছড়িয়ে পড়েছিল শাসনকর্তা হিসাবে শুধু প্রশাসনের ক্ষেত্রে নয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই পরিবার ছিল অগ্রগণ্য। হেইয়ান আমলের

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের প্রায় সবটাই পরিবারের লেখক-লেখিকারা রচনা করেছেন।

আনুমানিক ৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এই ফুজিওয়ারা পরিবারের এক শাখায় মুরাসাকি শিকিবুর জন্ম হয়। তাঁর পূর্বপুরুষদের অনেকে ছিলেন খ্যাতনামা কবি। পিতা তামেতোকি ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী; পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল তাঁর। কবিতাও তিনি লিখতেন, কিন্তু চীনা ভাষায়। তখন চীনা ছিল পণ্ডিতের ভাষা, জাপানী ভাষাকে দেখা হত একটু অবজ্ঞার চোখে। সাধারণ পাঠকের জন্য কিছু লিখতে হলে জাপানী ভাষা ব্যবহার করা হত। এ ভাষার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন লেখিকারা।

মুরাসাকি শিকিবুর পিতৃদত্ত নাম ছিল তো নো শিকিবু। পারিবারিক নাম যে কখন হারিয়ে গেল সে সম্বন্ধে সঠিক কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে, গেঞ্জি মনোগাতারি প্রচার লাভ করবার পর তাঁর নতুন নামকরণ হয়েছে। গেঞ্জি কাহিনীর একটি অন্যতম চরিত্রের নাম মুরাসাকি। রাজ-প্রাসাদের পাঠক-পাঠিকারা হয়তো এই চরিত্রের সঙ্গে লেখিকার মিল দেখতে পেয়ে মুরাসাকি বলে ডাকতে শুরু করেছিল। তারপরে অলক্ষ্যে তাঁর পারিবারিক নাম লুপ্ত হয়ে গেছে। মুরাসাকির যে আরো একটি নাম ছিল তার প্রমাণ আছে। গেঞ্জির কাহিনী পড়ে সম্রাট লেখিকার ইতিহাস জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হন। তাই তিনি তাঁর নামকরণ করেন 'ইতিহাস পারদর্শিনা'। প্রাসাদের অন্য সকলেও এই নাম ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন।

পিতার আগ্রহে মুরাসাকির শিক্ষা খুব অল্প বয়সেই শুরু হয়। হেইয়ান আমলে মেয়েদের চীনা ভাষা ও সাহিত্য পাঠের রীতি ছিল না। কিন্তু দাদার পড়া শুনে শুনে মুরাসাকি চীনা ভাষার পাঠ আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন: "দাদা তখন ছোট। বাবার আকাঙ্ক্ষা ছিল দাদাকে চীনা ভাষা ও সাহিত্যে পণ্ডিত করে তুলবেন। পড়াশুনার তত্ত্বাবধান

করতে বাবা প্রায়ই দাদার কাছে এসে বসতেন। আমিও বাবার সঙ্গে থাকতাম। দাদার পড়া শুনে চীনা ভাষার পাঠ শিখে ফেলেছিলাম। দাদা পড়ায় আটকে গেলে আমি বলে দিতে পারতাম চট করে। তা দেখে বাবা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলতেন, "তুমি ছেলে হলে আমার কত গৌরব আর আনন্দ হতো!"

কিন্তু সমকালীন রীতি লঙ্ঘন করে মুরাসাকি যে চীনা সাহিত্যের ক্লাসিকগুলি ভালোরূপেই আয়ত্ত করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় গেঞ্জি মনোগাতারি থেকে। এছাড়া বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র তিনি সবই পাঠ করেছিলেন। তাঁর রচনার সর্বত্র শাস্ত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

দেশের জীবন সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা হেইয়ানকিয়োর সমাজের উপরেই নির্ভরশীল ছিল না। পিতার সঙ্গে মফঃস্বলের কর্মস্থলে ঘুরে ঘুরে তিনি দেশকে দেখেছেন। একবার নগরে ফিরে আসবার পর তাঁর পরিচয় হল প্রভাবশালী সরকারী কর্মচারী নোবুতাকার সঙ্গে। নোবুতাকাও ফুজিওয়ারা বংশের লোক। বয়স প্রায় সাতচল্লিশ, মুরাসাকির বয়স বাইশ। নোবুতাকা মুরাসাকির পাণি প্রার্থনা করলেন। মুরাসাকি সহজে সম্মতি দেননি। একে তো বয়সের এত পার্থক্য; তার উপর নিশ্চয়ই তখনকার রীতি অনুযায়ী নোবুতাকার ঘরে কয়েকজন স্ত্রী ও উপপত্নী আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুরাসাকি তাঁকেই বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁদের বিবাহিত জীবন সুখের হয়েছিল। এ সুখ অবশ্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। বিয়ের বছর তিনেকের মধ্যেই স্বামীর মৃত্যু হলো। মুরাসাকি স্বামীর স্মৃতি অবলম্বন করে বাকি জীবন কাটিয়েছেন।

অথচ দ্বিতীয় বার বিয়ে করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। যাতে ভালো বিয়ে হতে পারে সে জন্য পিতা তাঁকে রানী আকিকোর সহচরী হিসাবে রাজপ্রাসাদে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু রাজপ্রাসাদের বিলাস এবং ঐশ্বর্যের পরিবেশে থেকেও মুরাসাকি স্বামীর কথা ভুলতে পারেননি। মনের বেদনা তিনি প্রকাশ করেছেন দিনলিপিতে:

তিনি লিখেছেন, 'শুধু মেয়ের জন্যই সংসার ত্যাগ করিনি, না হলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী হয়ে চলে যেতাম কোনো মঠে। মন আমার বিষাদে পূর্ণ; অথচ রানীর সহচরী হিসাবে আমাকে ভালো সাজপোশাক করতে হয়, আমোদপ্রমোদে যোগ দিতে হয় এবং সকলের সঙ্গে হেসে কথা বলতে হয়। এ এক বিষম বিড়ম্বনা।'

রাজপ্রাসাদে আসবার পর থেকে মুরাসাকি দিনলিপি লিখতে আরম্ভ করেন। প্রথম দিনের লিপি ১০০৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের একটি ঘটনা নিয়ে লেখা। প্রাচীন জাপানী সাহিত্যে মুরাসাকির ডায়েরি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। এই দিনলিপি থেকে মুরাসাকির ব্যক্তিগত জীবনের কথা এবং তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়।

স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম যে প্রলোভন সত্ত্বেও বিচলিত হয়নি কয়েকটি ঘটনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রানীর বিয়াল্লিশ বৎসর বয়স্ক পিতা মিশিনাগা মুরাসাকির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মিশিনাগা প্রধানমন্ত্রী, তাঁর প্রবল প্রতিপত্তি। যে কোনো রমণী তাঁর কৃপার পাত্রী হতে পারলে কৃতার্থ বোধ করত। কিন্তু মুরাসাকি তাঁকে বারবার ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ডায়েরি থেকে এক দিনের কথা বলছি। রানী আকিকোর ঘরে মিশিনাগা গেঞ্জি মনোগাতারি দেখতে পেয়ে কয়েক পাতা পড়লেন। তারপর ছোট একটি কবিতা লিখে পাঠালেন মুরাসাকির উদ্দেশে। সেই কবিতার ভাবার্থ এই যে, কুলগাছের ফুল সুন্দর, গন্ধ মিষ্টি; অথচ ফল এত টক। যে লেখিকা নিজের জীবন থেকে প্রেমকে বিসর্জন দিয়েছে—আশ্চর্য, সেই লিখেছে এমন প্রেমের কাহিনী। মুরাসাকি উত্তরে লিখলেন, আপনি ফুলকে (অর্থাৎ লেখিকাকে) চেনেন না; ফলের (অর্থাৎ গেঞ্জি মনোগাতারির) পরিচয় পেয়েছেন অন্যের কাছ থেকে (নিজে সবটা পড়েননি)। সুতরাং ফুল ও ফলের মধ্যে কি যোগ আছে তা যথার্থরূপে উপলব্ধি করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।

সেই রাত্রিতেই মিশিনাগা চুপিচুপি এলেন মুরাসাকির ঘরের

সামনে। দরজায় বারবার শব্দ করতে লাগলেন টক টক করে। মুরাসাকির ঘুম ভেঙে গেল, বুঝতে বাকি রইলো না এ আহ্বান কার। তিনি নিঃসাড় হয়ে বিছানায় শুয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে মিশিনাগা চলে গেলেন ব্যর্থমনোরথ হয়ে। দরজার ফাঁক দিয়ে রেখে গেলেন এক টুকরো কবিতা।

প্রাসাদের অন্য মেয়েরা মুরাসাকিকে প্রথমে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেনি। তিনি রানীকে চীনা ভাষা শেখাতেন। যে সব বই সাধারণতঃ কেউ পড়ে না সে সব পড়তেন। চটুল কথাবার্তায় যোগ দিতেন না, একটু দূরে দূরে থাকতেন; তাই মেয়েরা মনে করত তিনি গর্বিত। তাঁর সকল কাজ ও কথার মধ্যে উদ্দেশ্যের সন্ধান করত। মুরাসাকি লিখেছেন: যতদিন চাকরি করেছি ততদিন নিজের চিন্তা ভাবনা নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করিনি। যাদের উপলব্ধির ক্ষমতা নেই, যারা নিজেদের বড় মনে করে অন্য সবাইকে সমালোচনা করে, তাদের কাছে নিজের ভাবনাকে ব্যাখ্যা করতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

কিছু সময় কাটাবার পর প্রাসাদের রমণীদের ধারণা পরিবর্তিত হলো। তারা এসে বলল, আমাদের প্রথম মনে হয়েছিল আপনি অহঙ্কারী, অসামাজিক, আমাদের অবজ্ঞা করেন। এক কথায় আমরা আপনাকে মনে মনে ঘৃণা করেছি। কিন্তু পরিচয় হবার পর দেখছি আপনি কত নম্র, কত ভদ্র এবং আমাদের পূর্ব ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত।

রাজপ্রাসাদের জীবনযাত্রা যে তাঁর ভালো লাগত না ডায়েরির বহু জায়গায় তার উল্লেখ আছে। ১০১১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ইশিজোর মৃত্যুর পর আকিকোর শোকের অংশভাগী হতে হয়েছে তাঁকে। মুরাসাকির দাদা নোবুনোরির মৃত্যু হয় ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই সব শোকের আঘাতে তাঁর মন স্বভাবতই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। লোক-দেখানো মন্ত্র পাঠ এবং মালা জপায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তিনি লিখেছেন: পূজা ও প্রার্থনায় আর আমার আস্থা নেই।

একমাত্র ভগবান বুদ্ধের স্তব করি, তাঁর পায়ে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছি। এ জন্মে যত দুঃখ ভোগ করছি তা যে পূর্ব জন্মের কর্মফল তা উপলব্ধি করে মন বিষাদে পূর্ণ হয়ে যায়।

মুরাসাকির মৃত্যু হয় আনুমানিক ১০১৫ কিংবা ১০১৬ খ্রীষ্টাব্দে। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র আটত্রিশ বা উনচল্লিশ বছর।

গেঞ্জি মনোগাতারির রচনা কবে সম্পূর্ণ হয়েছে তার সঠিক তারিখ জানা যায় না। মুরাসাকি রাজপ্রাসাদে আসবার পরই যে কাহিনীটি লেখা হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ এই কাহিনীতে প্রাসাদের জীবনযাত্রার নিখুঁত ও বাস্তবানুগ চিত্র আছে; প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে এমন ছবি আঁকা সম্ভব নয়। তা ছাড়া গেঞ্জি কাহিনী রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়তো ছিল সম্রাজ্ঞী আকিকোর মনোরঞ্জন করা। সুতরাং ১০০২ থেকে ১০১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গেঞ্জি কাহিনীর অধিকাংশই লেখা হয়ে গিয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। সম্পূর্ণ হয়েছে ১০২১ খ্রীষ্টাব্দে বা দু-এক বছর পরে।

মুরাসাকি এই উপন্যাস কেন লিখলেন সে সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। একবার তাঁকে আদেশ করা হলো একটি উপন্যাস লিখে দেবার জন্য। আদেশ ঠিক কার কাছ থেকে এসেছিল তা নির্দিষ্ট জানা যায় না। হয়ত সম্রাজ্ঞী আকিকো, কিংবা রাজকুমারী সেনশি অথবা কোনো বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী আদেশ করেছিলেন। মুরাসাকি বিপদে পড়লেন। উপন্যাস কখনো লেখেননি, কি করে লিখতে হবে সে সম্বন্ধেও কোনো ধারণা নেই। সুতরাং প্রেরণা লাভের জন্য তিনি এলেন ওমি প্রদেশের অন্তর্গত ইশিয়ামাডেরা মন্দিরে। বিওয়া হ্রদের উপরে এই মন্দির। অষ্টম মাসের পূর্ণিমার রাত্রিতে চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হ্রদের দিকে নিবিষ্ট মনে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মুরাসাকি প্লটটি পেয়ে গেলেন। তৎক্ষণাৎ গেঞ্জি মনোগাতারির দুটি অধ্যায় লেখা হয়ে গেল। এখনো সেই মন্দিরে একটি ঘর সাজিয়ে রাখা হয়েছে, তাকে বলা হয় গেঞ্জির ঘর। এই

ঘরে বসেই নাকি মুরাসাকি গেঞ্জির কাহিনী লিখেছেন। তাঁর ব্যবহৃত দোয়াত-কলম আজও সেই ঘরে দেখা যায়।

তখন ছিল হাতে লেখা বইয়ের যুগ। নকলকারীরা কপি করবার সময় গেঞ্জি মনোগাতারি কিছু বদল করেছে, হয়তো কিছু যোগ করেছে। সুতরাং মুরাসাকির রচনা অবিকৃত নেই। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, পরিবর্তন সামান্যই হয়েছে।

এই বৃহদাকার উপন্যাসটি মোট চুয়ান্নটি অংশে বিভক্ত। চুয়ান্নটি বইও বলা যেতে পারে। কাহিনীর দুটি ভাগ। প্রথম একচল্লিশটি খণ্ডে নায়ক হিকারু গেঞ্জির জীবন-কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগের নায়ক কাওরু। কাওরু সকলের নিকট গেঞ্জির পুত্র হিসাবে পরিচিত ছিল। গেঞ্জি নিজেও তাই জানত। কিন্তু আসলে সে অন্যের ছেলে। গেঞ্জির এক স্ত্রী তাকে ঠকিয়েছে।

গেঞ্জি মনোগাতারি জীবনীমূলক কাহিনী। গেঞ্জির প্রেমের অ্যাডভেঞ্চারই প্রধান বিষয়বস্তু। কাহিনী দৃঢ়সংবদ্ধ নয়। মধ্যযুগের রোমান্সের মতো গল্পের বাঁধুনি শিথিল। গল্পের চুম্বকটুকু এই: সম্রাট সুন্দরী কিরিৎসুবোকে উপপত্নী হিসাবে গ্রহণ করায় সম্রাজ্ঞী কোকিদেন ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর রাগ বাড়ল যখন কিছুদিন পরে কিরিৎসুবো সম্রাটকে ছেলে উপহার দিল। ছেলেটি দেখতে চমৎকার: সহজেই সম্রাটের হৃদয় জয় করে নিল। কোকিদেন ঈর্ষায় পুড়ছেন। তাঁর আশঙ্কা এই ছেলে পাছে নিজের ছেলেকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করে। কিরিৎসুবোর মন ছিল ফুলের মতো কোমল। বিদ্বেষের উত্তাপে সে একদিন ফুলের মতোই শুকিয়ে গেল। অকালে মৃত্যু হলো তার।

সম্রাট এই ছেলের নাম রাখলেন হিকারু গেঞ্জি। যখন বারো বছর বয়স হলো তখন গেঞ্জির বিয়ে দিলেন মন্ত্রীর মেয়ে আওইর সঙ্গে। আওই ছিল গেঞ্জির চেয়ে চার বছরের বড়। তাই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারেনি।

গেঞ্জি ক্রমে রূপবান যুবক হয়ে উঠল। রাজপ্রাসাদে ভালো

চাকরি পেয়েছে। গান গাইতে, নাচতে, কবিতা আবৃত্তি করতে তার জুড়ি নেই। মেয়েদের কাছে দুর্নিবার তার আকর্ষণ। অতি সহজে তারা ধরা দেয়। আওই গেঞ্জির আচরণ পছন্দ করে না। স্বামীর কাছ থেকে সে দূরেই থাকে।

গেঞ্জির প্রথম প্রণয়িনী সম্রাটের এক উপপত্নী ফুজিৎসুবো। লোকে এই নিয়ে বলাবলি করত ; কিন্তু সম্রাটের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। তারপর একে একে গেঞ্জির প্রণয়িনীর সংখ্যা বাড়তে লাগল। গেঞ্জি কার প্রতি বেশী আকৃষ্ট এই নিয়ে পরস্পরের মধ্যে কলহের শেষ নেই। বিদ্বেষের পরিণতি একবার শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। রুগাও নামক এক সুন্দরী রমণীর সঙ্গে গেঞ্জি রাত্রি যাপন করছিল। হঠাৎ এক ছায়ামূর্তি এসে হত্যা করে গেল রুগাওকে। গেঞ্জির অন্য এক প্রণয়িনী রুগাওর সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে হত্যা করিয়েছে। এই শোচনীয় মৃত্যুর ফলে গেঞ্জি অসুস্থ হয়ে পড়ল। দেহ ও মন সুস্থ করবার জন্য রাজধানী থেকে দূরে এক পাহাড়ের উপরে কিছুদিন কাটিয়ে এল। পিতৃমাতৃহীন এক অনাথ বালিকাকে গেঞ্জি সঙ্গে নিয়ে এসেছে। নিজের কাছে রেখে তাকে লালন করতে লাগল।

কয়েক বছর পরে আওই সন্তান-সম্ভবা হলো। কিন্তু আওইর মনে শান্তি নেই। দিন দিন তার দেহ শীর্ণ হয়ে পড়ছে। গেঞ্জির প্রণয়িনীরা তার মৃত্যু কামনা করে—এই কেবল ভাবনা। এই দুশ্চিন্তা থেকে তার মুক্তি নেই। সন্তান জন্মের সময় আওইর মৃত্যু হলো। এই মৃত্যুর শোক গেঞ্জির জীবনে নতুন বাঁক রচনা করল। স্থির করল আর উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করবে না।

সেই অনাথ মেয়েটি এতদিনে বেশ বড় হয়েছে। নানা গুণে পারদর্শিতা লাভ করেছে। তার নাম মুরাসাকি-নো উয়ে। সংক্ষেপে সবাই ডাকত ‘মুরাসাকি’। গেঞ্জি এবার মুরাসাকিকে বিয়ে করে সংসারী হলো। গেঞ্জির বিবাহিত জীবন কিছুদিন খুব সুখেই কাটল। কিন্তু মুরাসাকির অকালে মৃত্যু হবার পর গেঞ্জির

সংসারে কোন আকর্ষণই রইল না। কিছুদিন পরে গেঞ্জিরও মৃত্যু হলো।

গেঞ্জির মৃত্যুর পর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নায়কের অভাবে পাঠকের আগ্রহ অনেকটা শিথিল হয়ে পড়ে। কাহিনীর শেষাংশের প্রধান বিষয় হলো কাওরু ও নিওউ-র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। নিওউ বেপরোয়া, নিজের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করবার ক্ষমতা আছে তার। কাওরু ভিন্ন প্রকৃতির লোক। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কাজ করতে সে অক্ষম। তার মনে কেবল দ্বিধা। যে মেয়েকে সে পেতে চায়, তাকে পাওয়া হয় না। কারণ দ্বিধা কাটিয়ে কাজ শুরু করতে গিয়ে দেখে নিওউ সে মেয়েকে এর মধ্যে জয় করে নিয়েছে। শেষাংশে পাত্র-পাত্রীদের মনের জগতের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

গেঞ্জি মনোগাতারি নিঃসন্দেহে মৌলিক উপন্যাস। তথাপি এর উপর পূর্ববর্তী সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু এই কাহিনীর প্রধান উপজীব্য সমকালীন সামাজিক জীবন, বিশেষ করে রাজপ্রাসাদের নর-নারীর জীবনযাত্রা। নিজে সেই জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন বলেই মুরাসাকি এমন নিপুণতার সঙ্গে রাজপ্রাসাদের জগৎকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন। চরিত্র-চিত্রণে এবং পরিবেশ বর্ণনায় মুরাসাকি বাস্তব প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অধিকাংশ পাত্র-পাত্রী ঐতিহাসিক নর-নারী, নিছক কল্পনার মানুষ নয়।

আধুনিক বাস্তববাদী লেখকদের মতো মুরাসাকি ভালো-মন্দ সব কিছু মিলিয়ে জীবনের সামগ্রিক রূপ পাঠকের সামনে উপস্থিত করবার পক্ষপাতী। উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে পারি গেঞ্জির মন্তব্য থেকে। গেঞ্জি একদিন লেডি তামাকাৎসুরার ঘরে এসে দেখতে পেল সে উপন্যাস নিয়ে এমন মগ্ন হয়ে আছে যে তার আগমন লক্ষ্যই করল না। মেয়েরা উপন্যাসের উদ্ভট কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতে ভালোবাসে বলে গেঞ্জি প্রথমে মৃদু তিরস্কার করল। কিছুক্ষণ পরে গেঞ্জি বলল, উপন্যাস সম্বন্ধে যা বললাম তা কিন্তু

আমার সত্যকার মত নয়। আমাদের জীবনে উপন্যাসের বিশেষ মূল্য আছে। পূর্বপুরুষদের জীবনযাত্রা কেমন ছিল তা উপন্যাস থেকেই জানা যায়। ইতিহাসে জীবনের সামান্য অংশ মাত্র ধরা পড়ে। কিন্তু ডায়েরি এবং রোমান্স থেকে লোকের ব্যক্তিগত জীবনের সব তুচ্ছ ঘটনাও জানা যায়। উপন্যাস-শিল্পের স্বরূপ কি এবং উপন্যাসের প্রচলন কেন হলো সে সম্বন্ধে আমার নিজের একটি মত আছে। অন্যের জীবনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করলেই উপন্যাস হয় না। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে কারো কারো এমন অভিজ্ঞতা হয়, যার ফলে অনুভূতি গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে ওঠে। চার পাশে কত ঘটনা ঘটছে। ইতিহাসের দৃষ্টিতে এরা তুচ্ছ। কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজের জীবনে এদের মূল্য অপরিসীম। তাই এদের ভুলে যেতে দিলে সমাজেরই ক্ষতি হবে। যাদের অনুভূতি প্রবল, অভিজ্ঞতার রত্নগুলি হারিয়ে যাবে এটা যারা চায় না, তারা বিস্মরণের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রাখে। এমনি করেই উপন্যাসের জন্ম হয়েছে।

এ থেকে স্পষ্টই দেখা যাবে যে, যা ভালো বা সুন্দর শুধু তার কথা লেখাই ঔপন্যাসিকের কাজ নয়। অবশ্য কখনো কখনো ধর্মের প্রাধান্য হতে পারে। তেমনি আবার অন্যত্র পাপের প্রাধান্য ঘটতে পারে। পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ—সবকিছুই উপন্যাসে স্থান লাভের যোগ্য। সংসারের সব কিছুই লেখক সংগ্রহ করে কাহিনী রচনা করবে। উপন্যাসের অযোগ্য বলে বাদ দেবার মতো কিছু নেই। তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে। কাহিনীটি আমাদের পার্থিব জগতের হওয়া চাই। মানুষের নাগালের বাইরে যে পরীর দেশ, তা নিয়ে উপন্যাস হতে পারে না। বাস্তব জীবনকে ভিত্তি করেই কাহিনী উন্মোচিত হবে ও বিস্তার লাভ করবে। উপন্যাসে পুণ্যের পাশে পাপ এবং জ্ঞানের সঙ্গে নির্বুদ্ধিতা দেখা যায় বলে ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয়। কারণ ঔপন্যাসিক নির্বিচারে সমগ্র জীবনের ছবি প্রতিবিম্বিত করেন।

হাজার বছর পূর্বে উপন্যাসের আদর্শ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা আজও সত্য। এই আদর্শ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় মুরাসাকি ছিলেন সাহিত্যে বাস্তবতার সমর্থক। গেঞ্জি কাহিনীর চরিত্র-চিত্রণে এবং পরিবেশ বর্ণনায় তিনি বাস্তবতার রীতি অনুসরণ করেছেন। অবশ্য এই পরিবেশ প্রাসাদের জীবনযাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর বাইরে যে বৃহত্তর জীবন আছে তার পরিচয় গেঞ্জি কাহিনীতে ধরা পড়েনি। অভিজাত ও সম্পন্ন নর-নারী এই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী। এমন কি, যারা পরিচারক তাদেরও বংশমর্যাদা কম নয়। জাপানে তখন শান্তির পরিবেশ। পুরুষদের যুদ্ধ বা অন্য কোনো সঙ্কটের সম্মুখীন হবার প্রয়োজন নেই। সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা, নৃত্য, কাব্যচর্চা এবং নানা উৎসবের আয়োজন করে দিন কাটে। পৌরুষের অভাব থাকলেও সৌন্দর্যপ্রীতি ও সুরুচিবোধ পাঠকের মন আকৃষ্ট করে। কিন্তু এটাই সম্পূর্ণ ছবি নয়। ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, ধর্মের নামে কুসংস্কারের প্রতি আসক্তি, বহুবিবাহ, মাত্রাহীন লোভ—এসবও মুরাসাকি লক্ষ্য করেছেন এবং ভালো-মন্দ মিশিয়ে এক অখণ্ড জীবনধারার চিত্র এঁকেছেন। রাজপ্রাসাদের জীবন হলেও তা সব সময় গুরুগম্ভীর নয়। ছোটখাটো কৌতুকজনক ঘটনা হালকা পরিবেশ সৃষ্টি করে, পাঠক বৈচিত্র্যের স্বাদ পায়। সম্রাটের বড় অফিসার সুকেদাতার কথাই ধরা যাক। তার কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রাসাদের সবাই তাকে আড়ালে 'কুমীর' বলে ডাকে। ক্রমে তার নামে গান রচিত হলো। একদিন সম্রাট নিজে বাঁশীতে সেই গানের সুর বাজালেন। প্রথমে খুব আস্তে আস্তে; পরে যখন খবর নিয়ে জানা গেল 'কুমীর' প্রাসাদে নেই, তখন উচ্চগ্রামে।

কঠোর কর্তব্যের দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকলে পুরুষ নারীর প্রতি বেশী করে আকৃষ্ট হয়। প্রাসাদ-কেন্দ্রিক সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্কের কথাই প্রাধান্য লাভ করেছে। গেঞ্জি মনোগাতারি মূলতঃ প্রেমের উপন্যাস। অবৈধ প্রেমের অনেক কাহিনী থাকলেও লেখিকা দেহের আকর্ষণকে সর্বদাই পশ্চাতে রেখেছেন। জাপানী চিত্রশিল্পী

যেমন নারীর নগ্নমূর্তি আঁকায় বিমুখ তেমনি মুরাসাকিও দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আকর্ষণের মাধ্যম হিসাবে বর্ণনা করেননি। যৌনতাকে উদ্দীপ্ত করতে পারে এমন বর্ণনা কোথাও নেই। দু-এক ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীকে এক শয্যায় রেখে লেখিকা বিদায় নিয়েছেন।

মুরাসাকির পাত্র-পাত্রী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদির দ্বারা। চোখে দেখবার পূর্বেই হয়ত গান শুনে হৃদয় বিনিময় হয়ে যায়। মুরাসাকি প্রেমকে প্রকৃতির বর্ণ গন্ধ এবং সৌন্দর্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি। তাই নারী-পুরুষের আকর্ষণ নিছক দেহসর্বস্ব হবার আশঙ্কা থেকে রক্ষা পেয়েছে। 'সম্রাট একদিন গেঞ্জিকে উপদেশ দিয়ে বললেন, মেয়েদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করো না। তোমার প্রণয়িনী যেন তোমাকে ভালোবেসে অপমানিত না হয়, অনুতপ্ত না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রেখে আচরণ করবে। গেঞ্জি উপদেশ শুনে মনে মনে ভাবল, সুন্দরের সামনে বিবেচনা হারিয়ে যায়। এই মুহূর্তে যদি একটি সুন্দর ফুল বা গাছ চোখে পড়ে তাহলে মুহূর্তের মধ্যে জীবন অর্থময় হয়ে উঠবে, দূর হয়ে যাবে সকল বিধি-নিষেধ, মনে হবে সুন্দরই একমাত্র সত্য।

সুতরাং নারীর প্রতি আকর্ষণ সৌন্দর্য উপভোগেরই আকাঙ্ক্ষা।

নায়ক গেঞ্জি আদর্শ প্রেমিক। সে রূপবান, নৃত্য, গীত, চিত্রশিল্প ও কাব্য রচনায় পারদর্শী। স্বভাব মধুর। রাজপুত্র হয়েও ঔদ্ধত্য নেই। সতেরো বছর বয়সেই নানা ঘটনায় সে জড়িয়ে পড়েছে। পাঠকের মনে হবে এই বখাটে ছেলের সংশোধনের আর আশা নেই। কিন্তু বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে গেঞ্জির মনে বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে এল। এই যে বহু নারীর প্রতি আকর্ষণ, সেজন্য যেন তার কিছু করবার নেই, এর হাত থেকে এড়াবার পথ নেই, ভাগ্য তাকে এ পথে চালিত করছে। ত্রিশ বছর বয়সেই নিজের কর্মফলের কথা ভেবে গেঞ্জি বিচলিত। সংসার ত্যাগ করে মঠে যাবে কি না সে কথাও তার মনে এসেছে।

বহু অবৈধ প্রেমের এই নায়ককে লম্পট হিসাবে চিহ্নিত করতে

পাঠক দ্বিধা বোধ করে। কারণ গেঞ্জির হৃদয় সহানুভূতিশূন্য নয়, অন্যকে দুঃখ দিয়ে সে বেদনা বোধ করে, তার চোখ জলে ভরে যায়। এবং জীবন যখন তার উপর প্রতিশোধ নেয়, তখন আর কোনো ক্ষোভ থাকে না। এক স্ত্রী মুরাসাকির মৃত্যু, অন্য স্ত্রী নিয়োসানের বিশ্বাসঘাতকতা প্রতিশোধ হিসাবে এসেছে গেঞ্জির জীবনে। কত পরস্ত্রীর হৃদয় সে জয় করেছে; অপমানিত স্বামীদের অভিশাপ লাগল তার জীবনে। নিয়োসান পরপুরুষের বাহুবন্ধনে ধরা দিল। লেখিকা এই বেদনাকে বড় করে মহৎ ট্র্যাজেডি সৃষ্টির প্রয়াস করেননি। গেঞ্জিকে হ্যামলেটের মতো ট্র্যাজিক হিরো করবার কথাও তাঁর মনে হয়নি। সংসারের আর পাঁচজনের মতো গেঞ্জি গভীর বেদনা ভোগ করে জীবনের ভার বহন করেছে।

গেঞ্জি মনোগাতারির ইংরেজী অনুবাদ ক্ষুদে অক্ষরে প্রায় সাড়ে এগারো শ' পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই বিরাট কাহিনীর সবটাই যদি গেঞ্জির জীবনের কথায় পূর্ণ থাকত তাহলে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটত নিঃসন্দেহে। কিন্তু মুরাসাকি গেঞ্জির জীবনকে বহুদল ফুলের মতো সাজিয়েছেন। যে সব নর-নারী নায়কের সংস্পর্শে এসেছে পাপড়ির মতো তারা গেঞ্জির জীবনের সঙ্গে যুক্ত। মুরাসাকি এদের জীবনের কাহিনী উপস্থিত করে পাঠককে বৈচিত্র্য উপভোগের সুযোগ দিয়েছেন।

মুরাসাকি চারশ'র অধিক নর-নারীকে কাহিনীর মধ্যে এনেছেন। জীবনের এক বিচিত্র মিছিল। এর মধ্যে প্রায় ত্রিশটি প্রধান চরিত্র। প্রত্যেকেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে। লেখিকার পক্ষে এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। বিশেষ করে মেয়েদের চরিত্র তিনি নিপুণতার সঙ্গে এঁকেছেন। তাদের ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি লোভ যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি আছে শিল্পপ্রীতি, সৌন্দর্যলিপ্সা, দয়া মমতার পরিচয়। নায়িকা মুরাসাকির মৃত্যুর দৃশ্যটি মনে আঁকা হয়ে যায়। এখানে মুরাসাকি যে আত্মীয়পরিজনকে রেখে চলে যাচ্ছে সে জন্য তার দুঃখই প্রাধান্য লাভ করেছে; কিন্তু যারা মুরাসাকিকে হারিয়েও বেঁচে থাকবে তাদের বেদনা গৌণ। যে সব পরিচারিকা

এতদিন সেবা করেছে, মৃত্যুর পরে তারা অসহায় হয়ে পড়বে—এই ভাবনায় মুরাসাকি বিচলিত। এক আত্মীয়াকে অনুরোধ করে গেল এদের দেখাশুনা করতে।

লেখিকা কোনো চরিত্রকেই সম্পূর্ণ ভালো অথবা সম্পূর্ণ মন্দ করে দেখাননি। সকলের জন্যই তাঁর সহানুভূতি আছে। সুয়েৎসুমুহানা অত্যন্ত লাজুক মেয়ে। কেন এই অস্বাভাবিক লজ্জা? পরে বোঝা গেল দেখতে খুব কুৎসিত বলেই কারো সামনে আসতে চায় না। বিশেষ করে লম্বা লালচে নাকটি এতই বিশ্রী দেখতে যে, সকলেরই সর্বাগ্রে ঐ দিকে চোখ যায়। কিন্তু সুয়েৎসুমুহানার চুল খুব সুন্দর, এখানে সব মেয়েকে তার কাছে হার মানতে হয়।

প্রত্যেকটি চরিত্র নিজের অন্তরের প্রেরণায় কাজ করে, কথা বলে, হাসে কাঁদে। তারা লেখিকার নির্দেশে পুতুলের মতো বিশেষ ভঙ্গীতে পাঠকের সামনে উপস্থিত হয় না। পাত্র-পাত্রীদের মনের জগৎ বিশ্লেষণ করে দেখাতে পেরেছেন বলেই সব কিছু স্বাভাবিক মনে হয়, সাজানো বলে সন্দেহ হয় না।

মুরাসাকির রচনার এ সব গুণ থাকা সত্ত্বেও এত দীর্ঘ কাহিনী পড়বার ধৈর্য কজনের থাকত বলা কঠিন। চমকপ্রদ ঘটনা নেই যে পাঠক আকর্ষণ অনুভব করবে। পাঠক আকৃষ্ট হয় অন্য কারণে। কাব্যময় ভাষা, ইঙ্গিতময়তা, গভীর প্রকৃতিপ্রেম, এবং সর্বোপরি লেখিকার স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের বিকাশ গেঞ্জি মনোগাতারিকে অসামান্য করেছে। শিল্প সাহিত্য ও জীবন সম্বন্ধে দার্শনিক মন্তব্য এবং ছোট ছোট বহু কবিতার সন্নিবেশ কাহিনার আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জীবনের নিবিড় যোগ লক্ষ্য করেছেন লেখিকা। মানুষের মনের আনন্দ-বেদনা প্রকৃতির দৃশ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রকৃতির নানা দৃশ্যের সঙ্গে জীবনের তুলনা করা হয়েছে। যেমন ধরা যাক গেঞ্জি ও তার বন্ধুদের নারীচরিত্র সম্বন্ধে আলোচনার কথা। একজন বলল, মেয়েরা হলো ঘাসের উপরে শিশিরবিন্দুর মতো, স্পর্শ করতে গেলেই যা মাটিতে পড়ে হারিয়ে যায়। আর একজন

বলল, মেয়েরা চকচকে শিলার মতো, যা হাতের মুঠিতে রাখলে গলে যায়। ঘাসের উপরকার শিশিরবিন্দু যেমন শুকিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, মুরাসাকিও ঠিক তেমনি করেই একদিন সংসার থেকে হারিয়ে গেল। মুরাসাকির মৃত্যুর পর থেকে একটা অশ্রুর পর্দা গেঞ্জিকে সংসার থেকে পৃথক করে দিল।—এমনি আরও বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

একটি কেমন সুন্দর কল্পনা দেখুন। বনের মধ্যে একা বাস করে এক রমণী। প্রিয়তম আসবে সেই প্রতীক্ষায় তার দিন কাটে। কিন্তু প্রিয়তমের আগমন দুর্লভ। কেমন দুর্লভ? কোটি কোটি মাইল দূরের নক্ষত্রের আলো বনের ফাঁক দিয়ে ঘরের দাওয়ায় রাখা গামলার জলে প্রতিবিম্বিত হওয়াটা যেমন দুর্লভ, তেমনি।

লেখিকা অনেক ক্ষেত্রে কিছু না বলে ব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিতের সাহায্যে বেশী বুঝিয়েছেন। এর সবচেয়ে সুন্দর উদাহরণ গেঞ্জির মৃত্যু। মুরাসাকি গেঞ্জির মৃত্যুর কোনো বর্ণনা দেননি। পাঠক যে অধ্যায়ে গেঞ্জির মৃত্যুর কথা জানবে বলে ভাবে সেখানে কিছুই লেখা নেই। অধ্যায়টির নাম দেওয়া হয়েছে 'মেঘের পশ্চাতে আলো'। অর্থাৎ, গেঞ্জি যতদিন মেঘের সামনে ছিল ততদিন তাকে আমরা দেখেছি। মৃত্যুর পরে সে চলে গেছে মেঘের পশ্চাতে। আত্মা অবিনশ্বর ; তাই আলো নির্বাপিত হয়নি। নামটি ছাড়া আর একটি শব্দও নেই ঐ অধ্যায়ে। মৃত্যু কথাটি ব্যবহার না করেও গেঞ্জির পরলোকগমন সম্বন্ধে লেখিকা ইঙ্গিত দিতে পেরেছেন। এবং এই ইঙ্গিত অধিক-ব্যঞ্জনাময়। পরবর্তী অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে—'গেঞ্জি আর নেই…'।

মিগুয়েল দ্য সার্ভেণ্টিস্

১৫৪৭—১৬১৬

ক্যাস্টিলের পাহাড়ী অঞ্চলে ছোট শহর আলকালা। অ্যানারাস নদীর তীরে। নদীর পাশ দিয়ে অ্যাকাসিয়া গাছের ছায়ায় ঢাকা আঁকা-বাঁকা পথ চলে গেছে। বিকেল হলে আলকালার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের দল নানা বিষয়ে তর্ক করতে করতে ঘুরে বেড়ায়। আর দূরের মাঠ-খামার থেকে গাড়ি বোঝাই পাকা আঙুর সেই পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় চোলাইয়ের কারখানায়।

অক্টোবর শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে শীতের আক্রমণ তীব্র হয়ে উঠল। অ্যাকাসিয়ার পাতায় পথ ঢেকে গেছে; ছোট নদী আরও শীর্ণ হয়েছে; দূরের পাহাড়ের চূড়ায় সাদার ছোপ চোখে পড়ে। পশ্চিমের পাহাড়টার ওপারে সূর্য চলে গেলেই সমস্ত শহরটা নিঝুম। কুণ্ডলী পাকানো শীতার্ত সাপের মতো পড়ে থাকে শহরটা।

এই শীত আরও তীক্ষ্ণ হয়ে দেখা দিল ডন রোড্রিগো দ্য সার্ভেন্টিসের সংসারে। সামান্য ডাক্তার, পশার নেই বললেই চলে। অথচ বংশমর্যাদা টনটনে। স্ত্রী এবং তিনটি সন্তানের ভরণপোষণ দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। জীর্ণ ঘরে কোনো রকমে এই নিঃস্ব দম্পতির দিন কাটে। কর্ত্রী লিওনোর দ্য কার্টিনাস সর্বদাই অভিযোগ করেন। রোজই অভাব। তারই ফিরিস্তি দেন। সৌভাগ্যক্রমে কর্তাকে সে সব শুনতে হয় না। কারণ ডাক্তার বধির, তাঁর কানে এ সব কিছুই প্রবেশ করে না। তিনি একান্ত দারিদ্র্যের মধ্যেও প্রচণ্ড আশাবাদী। হবে, সব হবে। একদিন আসবে সুদিন। আসবে পূর্বপুরুষদের পুণ্যবলে।

১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে এই দরিদ্র পরিবারে নতুন অতিথি এলো। চতুর্থ সন্তান। দিন চারেক পরে গির্জায় নবজাত

পুত্রের নামকরণ হলো মিগেল দ্য সার্ভেন্টিস। নামকরণের তারিখ ৯ই অক্টোবর।

ছিপছিপে গড়ন, একমাথা লালচে চুল, সর্বদাই চঞ্চল, দুষ্টুমিভরা বড় বড় দুটি চোখ। মিগেল একটু বড় হবার পর থেকেই পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। ছোট ঘরে জায়গা নেই, চারজন থেকে ভাই-বোনের সংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে সাত। তাছাড়া দরিদ্র পরিবারের পরিবেশে শিশুর মন অস্বস্তিবোধ করে। এর চেয়ে ভালো পথে পথে ঘোরা। বাজারে বা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে চারণদের মুখে নাইটদের বীরত্বগাথা শোনা যায় তন্ময় হয়ে। আর একটু বড় হলে পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরতে যেতেন সুযোগ পেলেই। তাছাড়া বড়দের কাছে বসে দেশবাসীর শৌর্যবীর্যের কাহিনী শোনার আকর্ষণও কম ছিল না। ষোড়শ শতাব্দী ছিল স্পেনের ইতিহাসের গৌরবময় যুগ। ইহুদীদের বিতাড়িত করা হয়েছে; মূরদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আফ্রিকায়। স্পেনের পৃথক বিভাগগুলি মিলিত হয়ে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রের পত্তন করেছে! আমেরিকা আবিষ্কার ও জয় স্পেনের আর একটি কৃতিত্ব। তার দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীকে ভয় করে না এমন কোনো রাষ্ট্র তখন য়ুরোপে ছিল না।

স্পেনের সেনানীদের দেশে-বিদেশে নানা অভিযানে বীরত্বের কথা শুনতে শুনতে কিশোর মিগেলের কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত। বড় হয়ে এমনি অভিযানে বেরিয়ে পড়বেন স্বপ্ন দেখতেন তিনি। এই স্বপ্ন তাঁকে রক্ষা করত কঠোর দারিদ্র্যের প্রতিদিনের নিপীড়ন থেকে।

মিগেলের স্কুলের পড়া আরম্ভ হলো আলকালায়। কিন্তু বেশিদিন চলল না। কারণ বাবা সপরিবারে আলকালা ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন ভাগ্যান্বেষণে। এক শহর থেকে আর এক শহরে। অদম্য তাঁর আশা। সুদিন আসবে। কিশোর মিগেলের খুব ভাল লাগত এই নতুন নতুন জায়গা দেখা। দেশের লোকদের চিনলেন, আর পরিচিত হলেন স্পেনের প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে।

মিগেল যখন বাবার সঙ্গে মাদ্রিদ এসে পৌঁছলেন তখন তাঁর বয়স উনিশ। সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপ রাজধানী সাজাবার জন্য ব্যগ্র। তাঁর নতুন প্রাসাদ শিল্পমণ্ডিত করবার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন দেশ-বিদেশের কত শিল্পী। আর রাজানুগ্রহ লাভের আশায় লেখকরাও আছেন রাজধানীতে। সুতরাং মিগেল শিল্প-সাহিত্যের পরিবেশে এসে পড়লেন। কবিতার ভক্ত ছিলেন তিনি। খুঁজে খুঁজে তরুণ কবিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন।

যে বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন সেখানকার অধ্যক্ষ খুবই স্নেহ করতেন মিগেলকে। সেটা তাঁর ছাত্র হিসাবে কৃতিত্বের জন্য নয়। কারণ পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সকল শক্তি নিঃশেষিত করবার কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। বইয়ের পৃষ্ঠার বাইরে যে জগৎ, সেই জগৎ থেকে সরাসরি পাঠ নিতে তিনি আগ্রহী ছিলেন। ছাত্রবয়সেই এক বয়স্কা রমণীর প্রণয়ী হয়েছিলেন বলে শোনা যায়। তবে তাঁর জীবনের অনেক কিছুই জানা যায় না। এই প্রথম প্রেম সম্বন্ধেও কিছু নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।

বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তাঁকে ভালোবাসতেন অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও মধুর ব্যবহারের জন্য। সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ দেখে তিনি মিগেলকে কবিতা লিখতে উৎসাহিত করতেন। কবিতা লিখে নাম করবার একটা সুযোগও এসে গেল।

যুবরাজ ডন কার্লোর শোচনীয় অকাল মৃত্যুতে সমগ্র দেশ শোকে মগ্ন। শোকগাথার একটি সংকলন সম্পাদনা করবার দায়িত্ব পড়ল অধ্যক্ষের উপর। মিগেলের শোক-গাথাটি সহপাঠী, শিক্ষক এবং অন্যান্য সকলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করল। হঠাৎ এক নগণ্য ছাত্রের উপর চোখ পড়ল রাজধানীর অভিজাত সম্প্রদায়ের। তরুণ কবিকে অভিনন্দন জানালো সবাই।

মিগেল এই সাফল্যে কিছুদিন নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করলেন; তিনি সাধারণ নন, অন্যদের চেয়ে একটু আলাদা, একথা ভাবতেও মন ভরে ওঠে। কিন্তু দারিদ্র্যের পীড়ন কিছুদিনের মধ্যেই

আবার তাঁকে বাস্তব জগতের নিষ্ঠুর পরিবেশে ফিরিয়ে আনল। মিগেলের পুঁথিগত বিদ্যার প্রতি কোনো আকর্ষণ ছিল না। সুতরাং বিদ্যালয় ত্যাগ করে এবার অর্থোপার্জন শুরু করা স্থির করলেন। কিন্তু কোন্ পথে উপার্জন? রাজসভার অনুগ্রহ না পেলে কোনো ভদ্র রকমের চাকরি পাওয়া সম্ভব নয়। হয়তো সাধারণ সৈন্যদলে নাম লেখানো যেতে পারে ছোট ভাইয়ের মতো। কিন্তু এত কষ্টের জীবন বরণ করে, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে উপার্জন যা হবে তা দিয়ে দারিদ্র্য ঠেকানো যাবে না। তাছাড়া কাব্যের সঙ্গে সেনানীর জীবনের যোগা-যোগই বা কতটুকু থাকবে?

এমন সময় মাদ্রিদে এলেন পোপের দূত জুলিয়া অ্যাকোয়াভাইভা। নানা দেশের শিল্পী এবং লেখকেরা তাঁর দরবারে ভিড় করবে,—এই ছিল জুলিয়ার আকাঙ্ক্ষা। মাদ্রিদে পৌঁছে তিনি পারিষদ সংগ্রহে মন দিলেন। কবি হিসাবে মিগেলের নাম তখন অনেকেরই জানা। জুলিয়ার পারিষদ হিসাবে নাম লেখালেন তিনি।

স্বদেশ ও স্বজন ত্যাগ করে মিগেল ইতালীর পথে বেরিয়ে পড়লেন অনিশ্চিতের সন্ধানে। আশা ছিল, বড়লোকের দরবারে খাওয়া-পরার চিন্তা থাকবে না, সব সময় লিখবেন। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলেন, দরবারের পরিবেশ সৃষ্টিকর্মের সহায়ক নয়। এখানে অর্বাচীন তরুণদের ভিড়, তোষামোদই তাদের একমাত্র কাজ। শিল্প-সাহিত্যের পরিবেশ নেই।

কিছুদিনের মধ্যেই দরবারের ছকে বাঁধা কৃত্রিম জীবনে মিগেলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল। এর চেয়ে ভালো সৈনিকের জীবন। অ্যাড্ভেঞ্চার আছে, প্রতিমুহূর্ত জীবন্ত করে তোলার মতো উপাদান আছে।

স্পেনের কয়েকটি সেনাদল ইতালীতে ছিল অধিকৃত অঞ্চল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। তারই একটিতে নাম লেখালেন মিগেল। তুর্কী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম অভিযান। তুর্কীবাহিনী ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে আক্রমণ করে নগর গ্রাম ধ্বংসস্তূপে

পরিণত করে দিত। এদের নিষ্ঠুরতার সীমা ছিল না। মহামান্য পোপের নেতৃত্বে য়ুরোপের দেশগুলি মিলিতভাবে তুর্কী আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য সংঘবদ্ধ হলো। এই মিলিত সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হলেন ডন জুয়ান অব অস্ট্রিয়া। স্পেনের সম্রাট পঞ্চম চার্লসের জারজ পুত্র ছিলেন ডন জুয়ান। মিগেল এবং ডন জুয়ান সমবয়সী, হু'জনেরই বয়স চব্বিশ। ডন জুয়ান নানা যুদ্ধের অধিনায়কত্ব করে এর মধ্যেই খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর শৌর্যের কাহিনী লোকের মুখে মুখে, অ্যাড্‌ভেঞ্চার প্রয়াসী তরুণদের আদর্শ তিনি।

মিগেল প্রথম প্রকৃত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লাভ করলেন লেপান্তোর নৌ-যুদ্ধে। ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর। লেপান্তো উপসাগরে খ্রীষ্টান ও তুর্কীবাহিনীর জাহাজ পরস্পরের সম্মুখীন হলো। ডন জুয়ান খ্রীষ্টান বাহিনীর অধিনায়ক। মিগেল সেদিন জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে ছিলেন। কামানের শব্দে নিচে থেকে উঠে এলেন উপরে। ক্যাপ্টেন তাঁকে শুয়ে থাকতে বললেন। কিন্তু জীবনের এমন একটি সুযোগ হারালে চলবে না। তিনি হাতিয়ার তুলে নিলেন। সারাদিন যুদ্ধ চলল। মিগেলের দেহে কয়েক জায়গায় গুলি লেগেছে, কিন্তু মোহগ্রস্তের মতো তিনি বন্দুক চালিয়ে যাচ্ছেন। বিকেলের দিকে একটা গুলি এসে লাগল বাঁ হাতে। রক্ত ঝরছে, অবশ হয়ে আসছে হাত। তবু ব্যাণ্ডেজ বেঁধে আবার বন্দুক তুলে নিলেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার আগেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন ডেকের উপরে। সন্ধ্যার সময় খ্রীষ্টান বাহিনীর জয়োল্লাসে সমুদ্রবক্ষ যখন মুখর হয়ে উঠল মিগেল তখন অচেতন।

লেপান্তোর বিজয়-গৌরব বহুলাংশে ডন জুয়ানের প্রাপ্য। তবু মিগেলের মতো আরও হু-একজন তাঁদের বীরত্বের জন্য স্বীকৃতি পেলেন। কিন্তু এ স্বীকৃতি প্রধানতঃ মৌখিক। দীর্ঘ সময় মিগেলকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছে। তখন ডন জুয়ান তাঁকে দেখতে এসেছেন। হাসপাতাল থেকে যখন মুক্তি পেলেন তখন দেখা গেল বাঁ হাতটি প্রায় অকর্মণ্য হয়ে গেছে। এর জন্য অবশ্য মিগেলের

তেমন দুঃখ নেই। কারণ এই অকর্মণ্য হাতই হবে বীরত্বের সাক্ষী, খ্রীষ্টানুগত্যের সার্টিফিকেট।

ডন জুয়ানের সঙ্গে তুর্কীদের বিরুদ্ধে আরো দুটি অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন মিগেল। কিন্তু সাফল্যমণ্ডিত হয়নি এ দুটি অভিযান। মিগেল শ্রান্ত; অনেকদিন দেশের বাইরে আছেন। এবার দেশে ফিরে রাজসভায় আবেদন করলে হয় ভদ্রগোছের কোনো চাকরির জন্য। তাঁর বীরত্বের প্রমাণ তো রয়েছেই। তার উপর ডন জুয়ানের কাছ থেকে নিলেন সুপারিশপত্র। ছোট ভাই রোড্রিগো তখন ইতালীতে। দু'জনে একই সঙ্গে যাত্রা করলেন দেশের উদ্দেশ্যে।

জাহাজ ছেড়ে দিল পাল তুলে। এতদিন দেশের কথা, মা-বাবা এবং ভাই বোনদের কথা খুব বেশি মনে পড়েনি। কিন্তু এখন দেশের দিকে যাত্রা করতেই মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। কতদিনে পরিচিত পরিবেশে আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে মিলিত হবেন!

হঠাৎ কয়েকদিন পরে বিপদসূচক ধ্বনি উঠল। তুর্কীরা আক্রমণ করেছে। শত্রুরা আদেশ করল, আত্মসমর্পণ করো। স্প্যানিশ নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ উত্তর দিলেন, মরব, তবু হার স্বীকার করব না। সারাদিন প্রচণ্ড লড়াই চললো, যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিলো অর্ধেকেরও বেশি। যারা বেঁচে রইলো তারা সব বন্দী হলো রাত্রির অন্ধকারে। এই বন্দীদের মধ্যে ছিলেন মিগেল ও তাঁর ছোট ভাই। এতদিনের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল। পায়ে পড়ল শিকল। তুর্কী দলপতির ক্রীতদাস। মিগেলের পকেটে পাওয়া গেছে ডন জুয়ানের পরিচয়পত্র। তাতে ওঁর মূল্য বেড়েছে শত্রুর কাছে। ভেবেছে, অভিজাত সমাজের লোক, মোটা মুক্তিপণ আদায় করা যাবে।

বন্দীদের নিয়ে তুর্কী জাহাজগুলি এসে ভিড়ল আলজিয়ার্সের বন্দরে। বন্দর থেকে মিগেল এবং আরও একদল বন্দীকে নিয়ে আসা হলো দলপতি দালি মামির প্রাসাদে। বাকি বন্দীদের পাঠানো হলো বিভিন্ন তুর্কী নেতাদের বাড়ি। দালি মামি কয়েক

হাজার স্প্যানিশ ক্রীতদাসের মালিক। নতুন বন্দীদের শিক্ষা দেবার পাকা ব্যবস্থা আছে তার। মিগেলের পায়ে বেড়ি পরানো হলো, কোমরে মোটা শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হলো অন্ধকার নির্জন ঘরে। কতদিন রাখা হয়েছিল জানা যায় না। নিশ্চয়ই অবশ্য ততদিন, যতদিন না তিনি মৃত্যুর কাছাকাছি এসে পৌঁছেছিলেন। বন্দীদের এটা প্রথম পাঠ; প্রথমেই বুঝিয়ে দিতে হবে পালাবার চেষ্টা করলে কী সাংঘাতিক শাস্তির আশঙ্কা। অর্ধচেতন হয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে মিগেলের প্রায়ই মনে হতো একটু খোলা হাওয়া গায়ে না লাগলে কিংবা নীল আকাশের উপর খানিকক্ষণ চোখ রাখতে না পারলে পাগল হয়ে যাবেন বুঝি।

কর্তা যখন বুঝল বন্দীর আর পালাবার ক্ষমতা নেই, ষড়যন্ত্র করবার মতো উদ্যম নেই, মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে—তখন তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হলো। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পরিবর্তে বেঁচে থাকবার মতো সামান্য খাবার পাওয়া যায়। মিগেল শহরে বেড়াবার সুযোগও পেলেন। কর্তার তাতে কোনো ভয়ের কারণ ছিল না। কারণ আলজিয়ার্স একটি বৃহত্তর জেলমাত্র। শহরের বাইরে যাওয়া-আসার পথ সুরক্ষিত। পালিয়ে যাবার উপায় নেই।

শহরে বেড়াবার সুযোগ পেয়ে মিগেলের মন কিন্তু আরো খারাপ হয়ে গেল। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখতে পেলেন তাঁর স্বদেশবাসী কত হাজার হাজার লোক বন্দিদশায় পশুর মতো জীবনযাপন করছে। স্পেনের অনেক খ্যাতনামা পরিবারের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রয়েছেন তাঁদের মধ্যে।

মিগেল সঙ্কল্প করলেন, এখান থেকে পালাতে হবে, দেশে গিয়ে এই বন্দীদের শোচনীয় অবস্থার কথা জানিয়ে সকলের মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এখন মাঝে মাঝে দু'একজন খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী স্পেন থেকে আসেন আলজিয়ার্সে বন্দীদের মুক্তিপণ নিয়ে কথাবার্তা চালাতে। তাঁদের পক্ষে সকলের সংবাদ নেওয়া সম্ভব নয়। মুক্তিপণ দেবার মতো সামর্থ্য আছে ক'জনেরই বা? কিন্তু স্পেনের নাগরিক

হিসাবে এদের প্রত্যেকের মুক্তি সম্বন্ধেই স্পেন সরকারের দায়িত্ব আছে।

মিগেলের মনে দিন-রাত্রিতে কেবল এক চিন্তা,—কি করে এখান থেকে পালানো যায়। যদি সব বন্দীরা বিদ্রোহ করে? প্রহরীদের হত্যা করে পালানো কি অসম্ভব? তার আগে অবশ্য বন্দরে একটা জাহাজের ব্যবস্থা করে রাখতে হবে। কিন্তু এ সব তো আর সম্ভব নয়! শুধু স্বপ্ন দেখা।

এর চেয়ে বাস্তব প্রস্তাব স্পেন অধিকৃত ওরানে পালিয়ে যাওয়া। আলজিয়ার্স থেকে ওরান বেশি দূরে নয়। কিন্তু মাঝখানে গভীর বনে সমাচ্ছন্ন পাহাড়শ্রেণী। হিংস্র সিংহের জন্য সে বন কুখ্যাত। সেই বনের মধ্য দিয়ে পথ চিনে যাওয়া দুঃসাধ্য, অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক না থাকলে। তবু এই বন্দিদশার চেয়ে মুক্তির জন্য মৃত্যুবরণ করাও ভালো। মিগেল একান্ত গোপনে কয়েকজন বন্দীর সঙ্গে ওরানে পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে ফেললেন। একজন বিশ্বস্ত মূরকে পাওয়া গেল পথপ্রদর্শক হিসাবে। বসন্তকালের এক রাত্রিতে মিগেল সদলে বেরিয়ে পড়লেন ওরানের পথে। সারারাত পথ চলে বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন সকালের দিকে। এদিক-ওদিক ঘুরলেন; কিন্তু সঠিক পথের হদিস নেই। সকলের পা কেটে রক্ত পড়ছে। পথপ্রদর্শক শেষ পর্যন্ত জানালো তার পথ ভুল হয়েছে, সে ওরান যেতে পারবে না। কি করা যায় এখন? সারাদিন ঘোরাঘুরি করেও যখন পথের নিশানা পাওয়া গেল না তখন স্থির হলো আবার ফিরে যাবেন আলজিয়ার্সে। সেখানে ফিরে যাওয়ার অর্থ সবারই জানা। তবু এখানে মরবার চেয়ে তুর্কীর হাতে মৃত্যু ভালো। তাহলে অন্তত একদিন মৃত্যু-সংবাদটা দেশে পৌঁছবে। রাত্রির অন্ধকারে আবার সবাই ফিরে এলো আলজিয়ার্সে। সকলকেই কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হলো। তবু যতটা আশঙ্কা করা হয়েছিল ততটা নয়। কারণ আলজিয়ার্সের শাসনকর্তা তখন বদল হচ্ছে। এ ব্যাপার নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবার মতো সময় ছিল না।

মিগেল বাড়িতে চিঠি পাঠিয়েছেন। টাকা সংগ্রহ করে মুক্তিপণ পাঠাতে পারলে দেশে ফেরা সম্ভব হবে। বাবা নিঃস্ব, মুক্তিপণের টাকা কোথায় পাবেন? বোনরা যা পারল দিল। ছেলের কথা ভেবে মা বড়লোকদের বাড়ি বাড়ি টাকার জন্য ঘুরতে লাগলেন। স্বামী বেঁচে; তবু নিজের পরিচয় দিলেন বিধবা হিসাবে। তাতে হয়তো দানের পরিমাণ বাড়বে, এই আশা। ছেলের জন্য সবই করা যায়। কিন্তু তাতেও যা দরকার তার সামান্য অংশ মাত্র পাওয়া গেল।

মিগেলের আশা ছিল ডন জুয়ানের উপর। চিঠিও দিয়েছিলেন তাঁকে। লেপান্তোর যুদ্ধের কথা নিশ্চয়ই তাঁর মনে আছে। মিগেলের বিপদের কথা জানলে তিনি নিশ্চয়ই সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন। মুক্তিপণের টাকা দেবেন, অথবা আলজিয়ার্স আক্রমণ করে বন্দীদের মুক্ত করবেন। কিন্তু মিগেল জানতেন না ডন জুয়ান নিজেই রাজদরবারের চক্রান্তে পড়ে বিপদাপন্ন। অন্যের কথা ভাববার সময় নেই; থাকলেও, কিছু করবার সামর্থ্য নেই।

এর পরের বার যখন স্পেন থেকে লোক এলো আলজিয়ার্সের শাসকের সঙ্গে মুক্তিপণ নিয়ে আলোচনা করতে, তখন মিগেল রোদ্রিগোকে দেশে যাবার কথা বললেন। মা মুক্তিপণ হিসাবে যে টাকা সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন তাতে ভাইয়ের মুক্তি কেনা যাবে। তাঁর নিজের জন্য আরো অনেক বেশি টাকা দরকার। ভাইয়ের হাতে গোপনে চিঠি দিলেন বন্ধুদের নামে, তারা যেন ছোট একটা জাহাজ পাঠায়। সেই জাহাজে করে যত জন সম্ভব পালাবে আলজিয়ার্স থেকে।

বন্ধুরা অনুরোধ রাখল। কয়েকমাস পরে রাত্রির অন্ধকারে চুপি চুপি একটি জাহাজ এসে প্রবেশ করল শহরের প্রান্তে খাঁড়ির মধ্যে। মিগেল সংবাদ পেয়েছিলেন কিছুদিন আগেই। সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ। সদলে মিগেল এসেছেন সমুদ্রতীরে। জাহাজের সিঁড়ি নামানো হয়েছে। এবার কয়েক মিনিটের মধ্যে জাহাজে উঠে সিঁড়ি টেনে

নেওয়া। তারপর একবার সমুদ্রে ভেসে পড়তে পারলে আর কে পায়! কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস। ঠিক সেই মুহূর্তে কয়েকজন জেলে এসে পড়ল সেখানে। রাত্রির অন্ধকারে স্প্যানিশ বন্দীদের দেখে সন্দেহ হলো, তারা চিৎকার শুরু করে দিল। ছুটে এল নগররক্ষীরা। এদিকে জাহাজের নাবিকরা ভয় পেয়ে সিঁড়ি তুলে নিয়ে জাহাজ ছেড়ে দিল। স্বাধীনতাপ্রয়াসী নিরুপায় নির্বাসিতের দল নতুন করে বন্দী হলো রক্ষীদের হাতে।

মিগেল অপূর্ব দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন, তিনিই সব কিছুর জন্য দায়ী। তাঁর সঙ্গীরা নিরপরাধ।

আবার কারাবাস। অত্যাচার। কিন্তু জুয়ানের উপর যে নিষ্ঠুর আচরণ করা হলো সে তুলনায় তা কিছুই নয়। মিগেলের প্রধান সহায়ক ছিল সদা হাস্যময় তরুণ জুয়ান। পরদিন দলের সবাইকে নিয়ে যাওয়া হলো জুয়ানের শাস্তি দেখতে। জুয়ানের দুই পা মোটা দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো গাছের উঁচু ডাল থেকে। সমস্ত দেহ ঝুলে আছে নিচের দিকে। কপিকলের মতো দড়ি টেনে একবার তাকে উপরে তুলছে, আবার দড়িতে ঢিল দিয়ে নামিয়ে দিচ্ছে নিচে। কিছুক্ষণ পরে নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। আরও কিছু পরে মাটিতে নেমে এলো জুয়ানের মৃতদেহ।

এত অত্যাচারেও মিগেলের মুক্তিপ্রচেষ্টা বন্ধ হয়নি। এবার তিনি ওরানের গভর্নরকে চিঠি লিখলেন। তাঁকে আহ্বান জানালেন আলজিয়ার্স আক্রমণ করে স্প্যানিশ বন্দীদের মুক্ত করতে। চিঠি নিয়ে চলল একজন বিশ্বস্ত মূর। সীমান্ত অতিক্রম করবার সময় রক্ষীরা তল্লাসী করে চিঠি আবিষ্কার করল। বিচারে মূরের শূলদণ্ড হলো। শূলে চড়েও মূর কিন্তু কে তাকে চিঠি দিয়েছে তা প্রকাশ করলো না।

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই দমন করা যায় না। মিগেল আরো একবার পালাবার পরিকল্পনা করলেন। এবারও জাহাজে করে। সব আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। শেষ মুহূর্তে একজন বিশ্বাস-

ঘাতকতা করল। ব্যর্থ হয়ে গেল সব। আর এক প্রস্থ অমানুষিক অত্যাচার চলল তাঁর উপরে।

দীর্ঘ চার বছর হয়ে গেল আলজিয়ার্সে। আর মুক্তির আশা নেই। বারবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হতে হয়েছে। এখন পায়ে বেড়ি আর কোমরে শিকল নিয়ে জেলের অন্ধকার ঘরে পড়ে আছেন মিগেল। ক্রমাগত ব্যর্থতার ফলে দেহে ও মনে অবসাদ নেমে এসেছে।

এমন সময় একদিন জেলের অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করলেন ফাদার জুয়ান গিল। বন্দীদের জন্য মুক্তিপণের ব্যবস্থা করতে তিনি এসেছেন। ১০৮ জন বন্দীর মুক্তির ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ফাদার মিগেলের নাম স্পেনে এবং এখানকার বন্দীদের মুখে শুনেছেন অনেকবার। তাই তাঁর ইচ্ছা ওঁকেও টাকা দিয়ে মুক্ত করে নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে. কিন্তু মিগেলের পরিবার যে টাকা সংগ্রহ করেছিল তা তো ভাইকে দেশে পাঠাতেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া তাঁর জন্য মুক্তিপণ দাবি করা হয়েছে অন্যান্য বন্দীদের তুলনায় তিন চার গুণ বেশি। ফাদার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে পণের পরিমাণ কিছু কমালেন। সম্পূর্ণ টাকাটা তুললেন নানা সূত্র থেকে। তারপর মিগেল মুক্ত।

দশ বছর পরে ফিরে এলেন মাদ্রিদ, নিজের পরিবারের মধ্যে। তাঁর জন্য মা-বাবা এবং ভাই-বোনের মনে অপরিসীম স্নেহ ও ভালোবাসা সঞ্চিত ছিল। কিন্তু কঠোর দারিদ্র্য পারিবারিক পরিবেশ করে তুলেছে রুক্ষ আর নির্মম। এতদিন পরে বাড়ি এসে যে ক'দিন বিশ্রাম করবেন নিশ্চিন্তে, তার জো নেই। এই মুহূর্তে উপার্জন দরকার। মিগেলের নিশ্চিত ভরসা ছিল দেশসেবার প্রতিদান হিসাবে রাজদরবারে তিনি সমাদর পাবেন। ডন জুয়ান আছেন সাক্ষ্য দিতে। আর আছে তাঁর অকর্মণ্য বাঁ হাত। কিন্তু মাদ্রিদে কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করে বুঝতে পারলেন তাঁর আশা ভিত্তিহীন। ডন জুয়ান নিজেই রাজদরবারের চক্রান্তের শিকার হয়ে পড়েছেন। স্পেন

সাম্রাজ্যে ফাটল ধরেছে। বয়স ও শোকের ভারে সম্রাট জর্জরিত, প্রশাসনের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ হয়েছে শিথিল। কয়েকজন ক্ষমতাশালী কর্মচারী এবং সভাসদ্ তাদের পেটোয়া লোকের মধ্যে অনুগ্রহ বিতরণ করে। যোগ্যতা কিংবা দেশসেবা চাকরির মাপকাঠি নয়। কত বন্ধু এবং সহকর্মী এখন বড় পদে অধিষ্ঠিত। কিন্তু তাঁকে কেউ আমল দিল না। হয়তো এই অভিজ্ঞতাই ডন কুইক্সটের মুখ দিয়ে আমাদের শুনিয়েছে: "স্যাঙ্কো, মনে রেখো উচ্চ পদ পেলে মানুষের চরিত্র বদলে যায়। যদি গভর্নর হও তবে নিজের মা'কেই আর চিনতে পারবে না।"

পর্তুগালে স্পেনের আধিপত্য কিছুদিন আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেউ কেউ পরামর্শ দিল, সেখানে হয়তো চাকরি পাওয়া যেতে পারে। সেই আশায় বৃথা ঘুরে এলেন পর্তুগাল। মা-বাবার বয়স হয়েছে। বড় ছেলের উপর তাঁদের কত আশা-ভরসা। তাঁরা মুখে কোনো অভিযোগ করেন না। শুধু নীরবে অসহায়ভাবে চেয়ে থাকেন।

বেকার মিগেল সময় কাটাবার জন্য কবি এবং নাট্যকারদের আড্ডায় যাতায়াত শুরু করলেন। তখনো বই ছাপানো সহজ হয়নি। লেখকরা নিজেদের লেখা আড্ডায় আবৃত্তি করে শোনাতেন। মিগেল নিজের লেখা আবৃত্তি করতেন, শুনতেন অন্যের লেখা। এই সব আড্ডায় যাতায়াত করে আবার লেখার অভ্যাস ফিরে এলো। কবিতা ছাড়া লিখতে আরম্ভ করলেন ইতালিয়ান স্টাইলের প্যাস্টোরাল উপন্যাস 'লা গ্যালাটিয়া'। গদ্যে-পদ্যে রচিত এই কাহিনীতে সমসাময়িক অনেক ব্যক্তিকে তিনি এনেছেন নতুন নামে। 'গ্যালাটিয়া' রচনা হিসাবে সার্থক নয়। তবু এ বই সম্পূর্ণ করতে পেরে মিগেল আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলেন। প্রেরণা পেলেন আরো লেখবার।

১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'গ্যালাটিয়া' ছাপা হলো। সে বছর ডিসেম্বরে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল মিগেলের জীবনে। তিনি মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতেন ছোট বোন আন্দ্রিয়ার বাড়ি। সেখানে আলাপ হলো ক্যাটালিনার সঙ্গে অবস্থা খুব ভালো, অনেক খামারের

মালিক। গ্রামের বাড়ি, সম্পত্তি, চাষাবাদের প্রতি গভীর আকর্ষণ। মিগেলের মুখ থেকে যখন যুদ্ধের বিবরণ, আলজিয়ার্সের বন্দিজীবনের কাহিনী ইত্যাদি শুনলেন তখন ক্যাটালিনা ওফেলিয়ার মতোই মুগ্ধ হলেন। আদ্রিয়ার ঘটকালিতে দু'জনের বিয়ে হলো।

ক্যাটালিনার বাড়ি ও খামারের ছোট জগতের মধ্যে জীবন কাটাতে পারলে মিগেলের হয়তো কোনো সমস্যাই থাকত না। কিন্তু যাঁর অভিজ্ঞতা এত বিস্তৃত তাঁর পক্ষে সঙ্কীর্ণ গৃহকোণে আবদ্ধ থাকা সম্ভব নয়। ক্রমশ দেখা গেল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বভাবের পার্থক্য গভীর। ক্যাটালিনা অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনতে ভালোবাসেন, জীবনে কোনো অ্যাডভেঞ্চার বা অনিশ্চয়তা চান না। হাতের মুঠোর মধ্যে যা পাওয়া যায়, যা ছোঁয়া যায়, তা নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট। অল্পদিনের মধ্যেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিল। মিগেল ফিরে এলেন মাদ্রিদে।

সব দিকেই কেবল ব্যর্থতা। চাকরির কোনো সুবিধা হলো না। দাম্পত্য জীবনে সুখের আশাও গেল মিথ্যা হয়ে। বাস্তব জীবনে ব্যর্থতার শোধ তুলতে চাইলেন রঙ্গমঞ্চে। থিয়েটারের মালিকদের সঙ্গে আগেই যোগাযোগ হয়েছিল। স্প্যানিশ থিয়েটারের মান উঁচু করলেন তিনি। গ্রীক নাট্যকাররা ক্লাসিক্যাল যুগে যেমন নাটক দিয়ে দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন, তিনিও তেমনি করলেন স্পেনের শৌর্য-বীর্য নাটকে রূপায়িত করে। লেপান্তোর যুদ্ধ এর মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করল।

১৫৮৫ সালে তাঁর কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ হলো। উৎসাহ বেড়ে গেল। পরপর কতকগুলি নাটক লিখে ফেললেন। 'লা গ্যালাটিয়া' কিছু খ্যাতি দিয়েছিল। নাট্যকার হিসাবে সে খ্যাতি আরও ছড়িয়ে পড়ল। এতদিন তিনি বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে আদ্য নামেই পরিচিত ছিলেন। লেখক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করায় 'সার্ভেন্টিস্' নামই প্রচার হতে লাগল।

কিন্তু দুর্ভাগ্য সর্বদা পেছনে লেগেই আছে। আর একজন

নাট্যকার দেখা দিলেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে। তিনি লোপ দ্য ভেগা। কবি হিসাবে তিনি আগেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। এবার নাটক রচনায় হাত দিয়ে অকস্মাৎ খ্যাতির শিখরে উঠে গেলেন। তাঁর সব নাটকের প্লটই মেলোড্রামাটিক, যা অতি সহজেই জনতার চিত্ত জয় করে নিল। সার্ভেন্টিসের আদর্শমূলক নাটকের আর চাহিদা রইলো না। এত দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে যে আশার আলোটুকু দেখা দিয়েছিল হঠাৎ তা অদৃশ্য হয়ে গেল। সার্ভেন্টিস্ নিজেই বুঝতে পারলেন দ্য ভেগার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তিনি পারবেন না। চমৎকার তাঁর চেহারা, খুব মিশুকে, বলতে কইতে তাঁর জুড়ি নেই; দ্য ভেগার খ্যাতি যেন খড়ের আগুনের মতো হঠাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে অন্য সবাইকে ম্লান করে দিল।

সার্ভেন্টিস্ নীরবে সরে দাঁড়ালেন সাহিত্যের প্রতিযোগিতা থেকে। কিন্তু বাঁচতে তো হবে। ভালো চাকরির আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। সামান্য বেতনের অতি নগণ্য একটা কাজ পেলেন নৌ-বাহিনীর খাদ্য সরবরাহ বিভাগে। ১৫৮৬ সালে স্পেন আয়োজন করছিল নতুন অভিযানের। তার জন্য অধিক খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা দরকার। সার্ভেন্টিস্ গ্রামে গ্রামে ঘুরে খাদ্য সংগ্রহ করবার চাকরি পেলেন। প্রত্যেক চাষীর কত পরিমাণ খাদ্যশস্য দিতে হবে তা নির্দিষ্ট করা থাকতো। সার্ভেন্টিসের কাজ ছিল সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য আদায় করে মজুত করা, টাকার হিসাব রাখা, ইত্যাদি। প্রতিদিন তাঁকে কলহের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হতো। চাষীরা নির্দিষ্ট মূল্যে শস্য গভর্নমেণ্টকে দিতে চাইত না; তারা অভিযোগ করত, অন্যায়ভাবে বেশি পরিমাণ শস্য আদায় করে নেওয়া হচ্ছে। আবার সরকার পক্ষের মনে সর্বদা সন্দেহ—কর্মচারীরা বেশি আদায় করে বাজারে একটা অংশ বিক্রি করে দিচ্ছে। দুর্নীতি দমনের জন্য রয়েছেন বিচারকের দল। এর উপর রয়েছে সরকারী হিসাব পরীক্ষকের দপ্তর। খাদ্য-শস্যের হিসাব এবং তার জন্য দেওয়া টাকার হিসাব রাখা চাই নির্ভুলভাবে। অথচ যাঁদের এত দায়িত্ব

তাঁদের মাইনে বছরের পর বছর বাকি পড়ে থাকে। কর্তৃপক্ষের ধারণা উপরি পাওনাতেই এদের চলে। মাইনেটা তো ফাউ, সেটা না পেলেও বড় একটা যায় আসে না।

বেশি করে খাদ্যশস্য আদায় করবার মিথ্যা অভিযোগে একবার বিচারক তাঁকে জেলে পাঠালেন। ভালো করে তদন্ত না করেই। মফঃস্বলের জেল, নরক-কল্পনার মূর্ত রূপ। আলজিয়ার্সের বন্দিদশায় যে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেননি, এখানে—স্বদেশবাসীর হাতে নিগৃহীত হয়ে সেই যন্ত্রণা তাঁকে বিদ্ধ করতে লাগল অনুক্ষণ। অবশ্য বেশিদিন তাঁকে জেলে থাকতে হয়নি। কারণ তিনি যে সত্যি নিরপরাধ তা প্রমাণিত হতে দেরি হয়নি।

এদিকে যে জন্য খাদ্য সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল তা শেষ হয়ে গেল। যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর নিকট আর্মাডার হার হলো। অনিয়মিত বেতনের সামান্য চাকরিও আর রইলো না। সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের কাছে সরাসরি আবেদন জানালেন দেশসেবার পুরস্কার হিসাবে তাঁকে যেন চাকরি দিয়ে আমেরিকায় পাঠানো হয়। সার্ভেন্টিসের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল নিশ্চয়ই ফল হবে। তাঁর আবেদনপত্র যে একটা মামুলি মন্তব্যের পর ফাইল করে রাখা হয়েছে সে খবর সার্ভেন্টিসের কাছে পৌঁছয়নি। তিনি শুভ সংবাদের জন্য প্রতীক্ষা করে আছেন। কিছুদিন পরেই আবার খাদ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হলো। পুরনো চাকরিতে ফিরে যাবার সুযোগ পেলেন সার্ভেন্টিস্। চাকরি তো শুধু নামে, ঝামেলার শেষ নেই; যে মাইনে, তা দিয়ে নিজের খরচই চলে না। কিন্তু একটা আকর্ষণ আছে। তা হলো দেশ ও দেশের মানুষদের দেখবার সুযোগ। মাদ্রিদে বসে এমন করে দেখা হয়নি।

এক পরিচিত ব্যক্তির অনুগ্রহে আর একটি চাকরি পাওয়া গেল। মাইনে সামান্য একটু বেশি। ঝঞ্ঝাট আগের চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। ঘুরে ঘুরে বিক্রয়-কর আদায়ের কাজ। শুধু আদায় নয়। হিসাব রাখতে হবে ঠিক মতো, তারপর নিয়মিত টাকা জমা দিতে হবে।

একবার সামান্য কিছু টাকা জমা দিতে দেরি হওয়ায় সার্ভেন্টিসের জেল হলো। অনেকবার তাঁকে জেলে যেতে হয়েছে তুচ্ছ কারণে। সে সব ঘটনার পূর্ণ বিবরণ এখন পাওয়া যায় না। মফঃস্বলের জেলে ট্যাক্স দারোগার মতো সামান্য এক কর্মচারীর খবর রাখবার আগ্রহ কারও ছিল না।

অনেকদিন কারাবাসের ফলে একটা লাভ হয়েছিল। সময় কাটাবার জন্য সার্ভেন্টিস্ লিখতে আরম্ভ করলেন। কবিতা নয়, নাটক নয়, উপন্যাস। তবে 'লা গ্যালাটিয়ার' মতো নয়। সম্পূর্ণ আলাদা জাতের। একেবারে অনন্য। আট-নয় বছরের অজ্ঞাত জীবনের যবনিকা যখন উঠল তখন, ১৬০৩ সালে, সার্ভেন্টিস্ মাদ্রিদে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে 'ডন কুইক্সটের' বিরাট পাণ্ডুলিপি। প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে "অ্যাড্ভেঞ্চারস্ অব দি ইনজিনিয়াস্ নাইট ডন কুইক্সট দ্য লা মাঞ্চা" প্রকাশিত হলো। প্রকাশক কিছু টাকা দিয়ে স্বত্ব কিনে নিয়েছে। যদিও ছাপাবার পূর্বেই বিভিন্ন সাহিত্যিক আড্ডায় এ বইয়ের কিছু কিছু অংশ পাঠ করায় লোকের মুখে মুখে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল, তবু প্রকাশক এত বড় বই প্রকাশের ঝুঁকি নিতে প্রথমে রাজী হয়নি। কপিরাইট লিখে দিয়ে তাকে সম্মত করাতে হয়েছে।

সামান্য কয়েকটি টাকা পাওয়াতেই ছেলেমানুষের মতো খুশি। মা-বাবার মৃত্যু হয়েছে। শুধু দু'বোন আছে। এই ক'টা টাকা হাতে নিয়ে যে তাদের সামনে দাঁড়াতে পারবেন তাতেই আনন্দ।

বই খুব বিক্রি হচ্ছে। কয়েক মাসের মধ্যে ছাপা হলো নতুন সংস্করণ। লোকের মুখে মুখে ডন কুইক্সটের নাম। এই সাফল্যে কিন্তু সার্ভেন্টিস্ পুরোপুরি তৃপ্ত নন। আশা ছিল রাজসভায় ডাক পড়বে, রাজকবির সম্মান তাঁকে দেওয়া হবে জাতীয় উৎসবে। কিছুই হলো না। হলো না রাজসভায়, কিন্তু জনসাধারণের ঘরে ঘরে পেলেন তিনি রাজসম্মান। শুধু রাজানুগ্রহ পেলে, যেমন

পেয়েছিলেন লোপ দ্য ভেগা—আজ তাঁকে কে মনে রাখত? তবু লোভী ছেলের মতো নগদ পাওনার জন্য ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। তাই 'ডন কুইক্সটের' লেখকও কবিতা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন পুরস্কারের লোভে। এই প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন তাঁর পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী লোপ দ্য ভেগা। অনুকম্পা করে দ্য ভেগা পুরস্কার সার্ভেন্টিস্‌কেই দিয়েছিলেন।

সরকারের কাছ থেকে সম্মান পাননি। পেলেন চরম অপমান। ডন কুইক্সট বের হবার মাস ছয়েক পরের ঘটনা। সন্ধ্যার পর সার্ভেন্টিসের বাড়ির দরজায় এক যুবক আততায়ীর হাতে সাংঘাতিকরূপে আহত হলো। সার্ভেন্টিস্ তাকে ঘরে এনে পরিচর্যার ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু বাঁচলো না সে। এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এক ষড়যন্ত্র দেখা দিল। এর ফলে সার্ভেন্টিস্ এবং তাঁর দুই বোন কারারুদ্ধ হলেন। নরহত্যার অভিযোগে পুলিস তাঁদের বাড়ি থেকে জেল পর্যন্ত শহরের রাস্তা দিয়ে কৌতূহলী জনতার চোখের উপর দিয়ে নিয়ে গেল। কেউ বাধা দিল না। এগিয়ে এসে বলল না, ডন কুইক্সটের লেখক কখনো এমন কাজ করতে পারেন না।

আর অর্থও পাননি ডন কুইক্সট হাজার হাজার কপি বিক্রি হলেও। বোন মাগ্‌দালেনার মৃত্যু হলো। কবর দেবার জন্য যে টাকা দরকার তা ছিল না সার্ভেন্টিসের। মঠের সন্ন্যাসিনীরা চাঁদা তুলে টাকার ব্যবস্থা করেছিলেন।

দেশে যোগ্য স্বীকৃতি পাননি। কিন্তু তাঁর বই এর মধ্যেই ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়ান প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। ইংরেজীতে আরম্ভ হয়েছে তর্জমা। অনুমতিবিহীন চোরাই সংস্করণও হয়েছে কয়েকটি। কিন্তু লেখকের কোনো লাভ নেই। কপিরাইট বিক্রি করে দিতে হয়েছে।

তবে রয়েলটির পরিমাণ দিয়ে তো বইয়ের বিচার হয় না। ডন কুইক্সট লেখককে টাকা দেয়নি, দিয়েছে অবিস্মরণীয় খ্যাতি। আধুনিক যুগের এটি প্রথম উপন্যাস এবং সর্বাধিক পঠিত উপন্যাস।

বালক বৃদ্ধ সকলের নিকট সমান প্রিয়। বালক হেনরিক হাইনে ডন কুইক্‌সটের দুঃখে কেঁদেছিলেন। যুগের পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু ডন কুইক্‌সটের সমাদর কমেনি। সমসাময়িক স্পেনের জীবন-যাত্রার মিছিল। সমাজের সকল স্তরের কত বিচিত্র নরনারীর ভিড়। সেই সমসাময়িকতার বহু ঊর্ধ্বে স্থান লাভ করেছে ডন কুইক্‌সট। মধ্যযুগীয় নাইটদের শিভালরি-প্রীতিকে বিদ্রূপ করবার জন্যই সার্ভেন্টিস কলম ধরেছিলেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু কাহিনী অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রূপ কোমল হয়ে এসেছে। কৌতুক ও পরিহাস এবং মমত্ববোধে ডন কুইক্‌সটের অ্যাড্‌ভেঞ্চারের বিবরণ উজ্জ্বল। সার্ভেন্টিস সারাজীবন কত অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে রচিত এই মহৎ উপন্যাসে সেই অভিজ্ঞতার তিক্ততা এতটুকু ছায়া ফেলতে পারেনি। তাঁর জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষার নায়ক কুইক্‌সট। তিনি রাজানুগ্রহ পাননি, নারীর প্রেম পাননি, অর্থভাগ্য তাঁর ছিল না, দেশের লোকের কাছ থেকে লেখক হিসাবে যথাযোগ্য মর্যাদা পাননি জীবিতকালে। এই সব অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা জয় করবার জন্য অ্যাড্‌ভেঞ্চারে বেরিয়েছে মাঞ্চা গ্রামের নাইট ডন কুইক্‌সট। নাইটের সহকারী সাঙ্কো পাঞ্জার স্বপ্নবিলাস নেই, তার আছে রূঢ় বাস্তববুদ্ধি। এই দুজনে মিলে জীবনের পূর্ণ রূপ—স্বপ্ন আর বাস্তব। বাস্তবের আঘাতে স্বপ্ন যখন ভেঙে গেলো, তখনই এলো ডন কুইক্‌সটের মৃত্যু। একি শুধু সার্ভেন্টিস্‌ এবং কুইক্‌সটের কথা? না, এটা আমাদের সকলের কথা। এই পৃথিবীতে আমরা সবাই স্বপ্নের হাতে বন্দী। মুক্তি পেয়ে বাস্তবে জেগে ওঠার আঘাতে মৃত্যু হয় আমাদের।

সার্ভেন্টিস্‌ তাঁর পাঠকদের উদ্দেশ করে কয়েকবার বলেছেন, ঈশ্বর তোমাদের সুখ দিন, আমি তাঁর কাছে চাই শুধু দুঃখ সইবার শক্তি। শেষ জীবনে সুখ চাইবার মতো সাহস তাঁর আর ছিল না। সহ্য করবার শক্তি আছে কি না সে পরীক্ষা শীগ্‌গিরই দিতে হলো তাঁকে।

কে একজন ছদ্মনামে ডন কুইক্‌সটের দ্বিতীয় খণ্ড বের করেছে। ভূমিকায় সার্ভেন্টিস্‌কে ব্যঙ্গ করা হয়েছেঃ বৃদ্ধ, বাঁ হাত অকর্মণ্য, ব্যক্তিত্বহীন চেহারা, হিংসুটে, কলহপরায়ণ, মূর্খ ইত্যাদি। সার্ভেন্টিস্‌ দুঃখ পেলেন; কিন্তু কি করবার আছে? দ্রুত দ্বিতীয় ভাগ শেষ করবার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন। দ্বিতীয় খণ্ড ছাপা শেষ হলো ১৬১৫ সালে।

ডন কুইক্‌সট প্রকাশিত হবার পর সার্ভেন্টিস্‌ আরও যে-সব বই লিখেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যঃ এগ্‌জেম্‌প্লারি টেলস্‌ (১৬১৩), জার্নি টু পার্নাসাস (১৬১৪) এবং পার্সাইল্‌স্‌ অ্যাণ্ড সিগিসমুণ্ডা। এই সব রচনার সাহিত্য-মূল্য এত কম যে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, সার্ভেন্টিস্‌ই ডন কুইক্‌সটের প্রকৃত লেখক কি না।

দেশে লেখক হিসাবে সার্ভেন্টিস্‌ তেমন স্বীকৃতি পাননি। কিন্তু বিদেশে পাঠকদের হৃদয়ে স্থান লাভ করেছেন এর মধ্যেই। ডন কুইক্‌সটের দ্বিতীয় খণ্ড তখনও বের হয়নি। ফ্রান্স থেকে দূত এসেছেন সরকারী কাজে। দূত তাঁর প্রিয় লেখক সার্ভেন্টিসের খবর জানতে চাইলেন। লা গ্যালাটিয়া ও ডন কুইক্‌সটের অনেক পৃষ্ঠা তাঁর মুখস্থ। শুধু তাঁর নয়, ফ্রান্সের অনেকের। মাদ্রিদ যখন এসেছেন, দেখা করে যেতে হবে প্রিয় লেখকের সঙ্গে। রাজকর্মচারীরা নিবৃত্ত করতে চাইল। বুড়ো-হাবড়া মানুষ, দরিদ্র, বাড়ি গেলে বসতে দেবার মতো জায়গা নেই, বিদেশী রাজদূতের সেখানে যাবার দরকার নেই। কিন্তু দূত শুনলেন না তাদের কথা। স্পেনের শ্রেষ্ঠ লেখককে শ্রদ্ধা জানাতে একদিন গিয়ে উপস্থিত হলেন সার্ভেন্টিসের নিরলঙ্কার ছোট ঘরে। জীবিতকালে এই একবার তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পেয়ে গেলেন।

দূত যখন ঘরে প্রবেশ করলেন তখন সার্ভেন্টিস্‌ মাথা নিচু করে লিখছিলেন। লিখে টাকা না পেলে খাওয়া চলবে না। বৃদ্ধ বয়সেও অনিশ্চয়তার প্রাত্যহিক যন্ত্রণা। দূত শুনে বললেন, দারিদ্র্যের

জন্যই যদি আপনাকে লিখতে হয় তাহলে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করব তিনি যেন আপনাকে কখনো ধনী না করেন। আপনার দারিদ্র্যে বিশ্ব-সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হোক।

ডন কুইক্‌সটের দ্বিতীয় খণ্ড বের হবার পর থেকেই সার্ভেন্টিসের শরীর ভেঙে পড়ল। প্রধান হয়ে দেখা দিল সর্বাঙ্গের শোথ। স্ত্রী ক্যাটালিনা শেষের ক'দিন তাঁর পাশে ছিলেন। সার্ভেন্টিস্ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ২৩শে এপ্রিল ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে। ঠিক সেই দিন ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে আর একজন বিশ্ববন্দিত লেখকের মৃত্যু হলো—শেক্সপীয়রের।

কোন্ গির্জার চত্বরে সার্ভেন্টিস্‌কে কবর দেওয়া হয়েছিল শুধু সেইটুকু এখন জানা যায়। কিন্তু ঠিক কোথায় তাঁর কবর তার হিসাব কেউ রাখেনি। তাঁর দেশবাসী কিংবা পরিজন সামান্য একটি স্মৃতিফলক দিয়ে স্থানটিকে চিহ্নিত করে রাখা প্রয়োজন বোধ করেনি।

উইলিয়াম শেক্সপীয়র

১৫৬৪—১৬১৬

শেক্সপীয়র মানব-জীবনের বিচিত্র মিছিলকে তাঁর নাটকের মধ্যে অমর করে রেখেছেন। অসংখ্য নরনারীর কত সুখ-দুঃখ, কত আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর লেখনীর স্পর্শে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কিন্তু যিনি এদের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর জীবনের সুস্পষ্ট কোনো ছবি নেই। নাটকের প্রযোজকের মতো দৃশ্যপটের অন্তরালে তাঁর অবস্থান; নিজের জীবনকে মঞ্চের উপরে উপস্থাপিত করেননি। কিংবা হয়তো নাটকের সকল পাত্র-পাত্রী এবং কাহিনীর মধ্যে নিজের জীবনকে তিনি ছড়িয়ে রেখেছেন; হঠাৎ চোখে পড়ে না, সাল-তারিখের চিহ্ন দিয়ে মেলানো যাবে না, তা শুধু তন্ময় পাঠকের উপলব্ধির বিষয়।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গোটা চল্লিশেক সমকালীন দলিলে শেক্সপীয়রের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। সুনির্দিষ্ট প্রমাণের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প বলেই জীবনীকারকে অনেকাংশে অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। এবং তাঁর প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেই মতভেদের আশঙ্কা থেকে যায়।

অবশ্য এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকারদের জীবন সম্বন্ধে এই অবহেলা অনেকটা স্বাভাবিক ছিল। অধিকাংশ নাট্যকারের জীবনের তথ্য আমাদের জানা নেই। বেন জনসন বোধ হয় একমাত্র ব্যতিক্রম। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যাদের যোগ ছিল সমাজ তাদের অবজ্ঞা করত। অভিনেতারা যদি কোনো অভিজাত ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে না পারত, তাহলে আইনের দৃষ্টিতে তাদের স্থান ছিল "rogues, vagabonds, and sturdy beggars"-দের সঙ্গে একই

শ্রেণীতে। সুতরাং যাদের সামাজিক মর্যাদা এই, তাদের জীবনী সম্বন্ধে কারো আগ্রহ থাকবার কথা নয়।

কতকগুলি অপূরণীয় ফাঁক থাকা সত্ত্বেও শেক্সপীয়রের জীবন সম্পর্কে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। ১৫৬৪ সালের এপ্রিল মাসে উইলিয়াম শেক্সপীয়রের জন্ম হয়েছিল এটা ঠিক। তবে দিনটি ঠিক জানা যায় না। হয়তো বাইশে কিংবা তেইশে এপ্রিল। স্ট্র্যাটফোর্ডের গির্জায় ঐ বছর ছাব্বিশে এপ্রিল যে তাঁর নামকরণ হয়েছিল তার প্রমাণ আছে।

আভন নদীর তীরবর্তী স্ট্র্যাটফোর্ড শহরের ব্যবসায়ী জন শেক্স-পীয়রের প্রথম পুত্র উইলিয়াম। মার নাম মেরী। উইলিয়ামের দুটি বোন হয়েছিল; কিন্তু জন্মের অল্পদিন পরেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। জন শেক্সপীয়রের ব্যবসায় থেকে বেশ ভালো আয় হতো। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির তিনি অল্ডারম্যান ছিলেন অনেক দিন। শেষে হয়েছিলেন মেয়র। তিনি যে এই ছোট শহরের প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। উইলিয়াম পিতার সামাজিক মর্যাদার সুযোগে সমাজের বিভিন্ন স্তরের নানা ধরনের লোক দেখবার সুবিধা পেয়েছিলেন। বৃহত্তর জীবনের এই অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে কাজে লেগেছিল।

বছর সাতেক বয়সে উইলিয়ামকে বোধ হয় ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল স্ট্র্যাটফোর্ড গ্রামার স্কুলে। কিন্তু স্কুলের পড়া শেষ করবার সুযোগ তিনি পাননি। পিতার আকস্মিক কোনো আর্থিক দুর্বিপাকের জন্য আনুমানিক ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল ছাড়িয়ে তাঁকে লাগিয়ে দেওয়া হয় পারিবারিক ব্যবসায়ে।

বছর পাঁচেক উইলিয়ামের আর কোনো খবর পাওয়া যায় না। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে পাওয়া যায় তাঁর বিয়ের সংবাদ। ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে ছাব্বিশ বছরের তরুণী অ্যান হাথাওয়েকে বিয়ে করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। উইলিয়ামের বয়স তখন আঠারো বছর ছয় মাস, তখনও নাবালক। সুতরাং বিয়ের জন্য বিশেষ লাইসেন্সের ব্যবস্থা

করতে হয়েছিল। বিয়ের পাঁচ মাস পরে প্রথম সন্তান সুসানার জন্ম হয়। দু'বছর পরে জন্ম হয় যমজ সন্তান হ্যামনেট ও জুডিথের।

এর পর ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে শেক্সপীয়রের লণ্ডন অবস্থিতি সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। ঠিক কবে এবং কেন তিনি স্ট্র্যাটফোর্ড ত্যাগ করেছিলেন তা জানা যায় না। হয়তো পারিবারিক দায়িত্ববৃদ্ধির জন্য অধিক উপার্জনের তাগিদে তাঁকে বাড়ি থেকে বেরুতে হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন তাঁকে পালাতে হয়েছিল পুলিসের ভয়ে। কারণ তিনি নাকি স্যার টমাস লুসির হরিণ চুরির দায়ে ধরা পড়েছিলেন। তাঁর 'চতুর্থ হেনরি' ও 'মেরি ওয়াইভ্‌স্ অব উইণ্ডসর' নাটকে এই ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় বলে জীবনীকার সিড্‌নি লী-র বিশ্বাস। ইতালীর পটভূমিকা শেক্সপীয়র এত বেশী ব্যবহার করেছেন যে অনেকের ধারণা তিনি স্ট্র্যাটফোর্ড থেকে ইতালী চলে গিয়েছিলেন। প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফলে ইতালী তাঁর রচনায় প্রাধান্য লাভ করেছে।

১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ শেক্সপীয়র জীবিকার্জনের সন্ধানে লণ্ডনে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন বলে ধরা যেতে পারে। লণ্ডনে তখন দু'টি থিয়েটার ছিল,—একটি 'দি থিয়েটার', অন্যটি 'দি কার্টেন'। সামান্য চাকরি নিয়ে এরই একটিতে শেক্সপীয়র যোগ দিলেন। যে-সব দর্শক থিয়েটার দেখতে আসত ঘোড়ায় চড়ে, তাদের ঘোড়া দেখাশোনা করাই ছিল শেক্সপীয়রের কাজ। শীঘ্রই তাঁর পদোন্নতি হলো। প্রম্পটারের সহকারী হিসাবে আস্তাবল থেকে উঠে এলেন রঙ্গমঞ্চের উপরে। ক্রমে তিনি নাটকের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা আরম্ভ করলেন। সম্পাদনা করতে গিয়ে কোনো কোনো অঙ্ক বা দৃশ্য নতুন করে লিখতে হতো। আর সেই সঙ্গে তিনি ছোটখাটো চরিত্রে অভিনয়ও শুরু করলেন। অন্যের পাণ্ডুলিপিতে সংশোধন ও সংযোজন করতে করতে শেক্সপীয়র নিজেই লিখলেন মৌলিক নাটক। অবশ্য তাঁর প্রথম পর্বের রচনায় কাহিনীর মৌলিকত্ব সামান্যই ছিল। সমকালীন নাট্যকারদের নিকট তিনি বিশেষরূপে ঋণী। তথাপি শেক্সপীয়রের রচনায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যার জন্য তিনি

অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠালাভ করতে পেরেছিলেন।

কিশোর-জীবনের অভিজ্ঞতা নাটকরচনায় কাজে লেগেছিল। পিতা ছিলেন ব্যবসায়ী এবং মেয়র। এ দু'টি সূত্রে শেক্সপীয়র বহু লোকের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। স্কুলে ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষা, ক্লাসিক্যাল সাহিত্য, বাইবেল ইত্যাদি যে ভালো করেই পড়েছিলেন,—নাটক থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। স্ট্র্যাটফোর্ডের বন মাঠ গাছ ফুল পশু-পাখি, খেলাধূলা, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদির সঙ্গে ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়। এই পরিচয়ের সদ্ব্যবহার তিনি করেছিলেন নাটকরচনায়।

সে সময় ইংলণ্ডে ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারের খুব প্রচলন ছিল। স্ট্র্যাটফোর্ডেও এই সব থিয়েটারের দল আসত এবং তাদের অনুষ্ঠানে মেয়রের পরিবার ছিল সম্মানিত অতিথি। কিশোর শেক্সপীয়র অভিনয় দেখে অভিভূত হতেন। এবং পরবর্তী জীবনে রঙ্গমঞ্চে যোগ দেবার ভূমিকা অলক্ষ্যে তখনই রচিত হয়েছিল। বাড়ি থেকে বাইরে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর হয়তো কোনো থিয়েটারের দলের সঙ্গেই তিনি স্ট্র্যাটফোর্ড ত্যাগ করেছিলেন।

১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ শেক্সপীয়র যে নাট্যজগতে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় সমকালীন নাট্যকার রবার্ট গ্রীনের ঈর্ষাকাতর মন্তব্য থেকে। আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ A Groatsworth of Wit-এ তিনি শেক্সপীয়র সম্বন্ধে বলেছেন: "an upstart crow, beautified with borrowed feathers...."

ধার করা পালক দিয়ে নিজেকে সাজাবার অভিযোগ শেক্সপীয়র সম্বন্ধে করা যেতে পারে। তাঁর নাটকের কাহিনী ইংরেজী, ল্যাটিন, ফরাসী ভাষায় রচিত ইতিহাস, রূপকথা, রোমান্স, নাটক ইত্যাদি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। সমকালীন নাট্যকারদের কাছেও তাঁর ঋণ কম নয়। বিশেষ করে মার্লোর প্রভাব তাঁর প্রথম পর্বের রচনায় সুস্পষ্টরূপেই ধরা পড়ে। এলিজাবেথীয় যুগে সুপ্রচলিত কাহিনী নিয়ে নাটকরচনার রীতি ছিল। শেক্সপীয়র সেই রীতি অনুযায়ী

আখ্যানভাগটি বিভিন্ন সূত্র থেকে গ্রহণ করে তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন। এই প্রাণপ্রতিষ্ঠার শিল্পকলার মধ্যেই শেক্সপীয়রের মৌলিকত্ব। গ্রীন তা উপলব্ধি করতে পারেননি।

১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শেক্সপীয়রের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'ভেনাস অ্যাণ্ড অ্যাডোনিস' প্রকাশিত হয়। অবশ্য আখ্যাপত্রে তাঁর নাম ছাপা হয়নি। স্ট্র্যাটফোর্ডের অধিবাসী রিচার্ড ফিল্ড লণ্ডনে ছাপাখানা খুলেছিল। শেক্সপীয়রের প্রথম কয়েকটি বই ছাপা হয়েছিল রিচার্ড ফিল্ডের সহায়তায়। এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে 'লাভ্‌স্ লেবারস্ লস্ট', 'দি কমেডি অব এররস', 'ট্যু জেণ্টল্‌মেন অব ভেরোনা', 'কিং হেনরি (ষষ্ঠ)', 'কিং রিচার্ড (তৃতীয়)', 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' রচিত এবং অভিনীত হয়েছে। 'লাভস্ লেবারস্ লস্ট' লেখকের নামসহ মুদ্রিত আকারে প্রথম বের হয় ১৫৯৮ সালে। আখ্যাপত্রে শেক্সপীয়রের নাম এই বইয়েই প্রথম ছাপা হয়েছিল।

১৫৯৮ সালে শেক্সপীয়রের জীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে Palladis Tamia or The Wit's Treasury নামে একটি বই Francis Meres সম্পূর্ণ করেন। শেক্সপীয়রের রচনার প্রশংসা সর্বপ্রথম আমরা এই বইয়ে পাই। মিয়ার্স বলেছেন ঃ

"the sweet witty soul of Ovid lives in mellifluous and honey-tongued Shakespeare...."—। মিয়ার্স শেক্সপীয়রের বারোটি নাটকের উল্লেখ করে বলেছেন ঃ ল্যাটিন সাহিত্যে প্লটাস ও সেনেকাকে যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ কমেডি ও ট্র্যাজেডি লেখক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু শেক্সপীয়রের মধ্যে আমরা তুজনকেই একসঙ্গে পেয়েছি।

শেক্সপীয়র যে জীবিত থাকতেই সমালোচকদের প্রশংসা পেয়েছিলেন উপরোক্ত মন্তব্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৫৯৪ সালে তিনি লর্ড চেম্বারলেনের নাট্যগোষ্ঠীতে যোগ দেন। ১৫৯৯ সালে গ্লোব থিয়েটারের নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়। শেক্সপীয়র

এই থিয়েটারের একজন অংশীদার ছিলেন। পরে ১৬০৯ সালে তিনি ব্ল্যাকফ্রায়ার্স থিয়েটারেরও অংশীদার হন। ১৬০৩ সালে প্রথম জেমস সিংহাসনে আরোহণ করবার পর শেক্সপীয়রের থিয়েটারের দল তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এবং দলের নাম হয় 'কিংস্ মেন'।

১৫৯৬ সালে হ্যামনেটের মৃত্যু শেক্সপীয়রের জীবন ও রচনাকে প্রভাবান্বিত করেছিল। প্রথম পর্বের লঘুরস অতিক্রম করে ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে পৌঁছতে সহায়তা করেছে পুত্রশোক। 'কিং জন' নাটকের তৃতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে নিজের মৃতপুত্রের কথা স্মরণ করে শেক্সপীয়র লিখেছেন :

Grief fills the room up of my absent child.
Lies in his bed, walks up and down with me,
Puts on his pretty looks, repeats his words,
Remembers me of all his gracious parts,
Stuffs out his vacant garments with his form ;...

শেক্সপীয়রের স্ত্রী ছিলেন স্বামীর চেয়ে বয়সে বড়। সুতরাং শেক্সপীয়র বিবাহিত জীবনে খুব সুখী ছিলেন মনে হয় না। হয়তো নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন 'টুয়েলফথ্ নাইট' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে। বলেছেন : "Let still the woman take/An elder than herself."

এমন ইঙ্গিত আরও তাঁর রচনায় ছড়িয়ে আছে। শেক্সপীয়র লণ্ডনে সপরিবারে থাকতেন না বলেই মনে হয়। স্ত্রীর প্রতি গভীর আকর্ষণ থাকলে এটা হতো না। হ্যামনেটের শোকে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের নিকটে এসেছিলেন। এর পর থেকে শেক্সপীয়র প্রায়ই স্ট্র্যাটফোর্ডে আসতেন।

লণ্ডনে তিনি কাজ নিয়ে ডুবে থাকতেন। নাটক লেখা অভিনয় করা এবং প্রযোজনা সম্বন্ধে নির্দেশ দিতেই সব সময় পার হয়ে যেত। প্লেগের সময় সদলবলে লণ্ডনের বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কাজের ফাঁকে হয়তো কখনো কখনো যেতেন সাহিত্য-মজলিশ 'মারমেড

ট্যাভার্নে'। স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে, বেন জনসন, বোমণ্ট, ফ্লেচার এবং আরও অনেকে সেখানে নিয়মিত আড্ডা জমাতেন।

'হেনরী দি এইট্থ্' বোধ হয় শেক্সপীয়রের শেষ নাটক। এই নাটকের যখন অভিনয় চলছিল তখন হঠাৎ আগুন লেগে গ্লোব থিয়েটার ভস্মীভূত হয়ে যায়। এটা ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা। এর পর থেকে শেক্সপীয়র অধিকাংশ সময় স্ট্র্যাটফোর্ডেই কাটাতেন। কঠোর পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। মৃত্যুর দেরি নেই মনে করে তিনি ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে উইল করেন। আত্মীয়-পরিজন, প্রতিবেশী এবং বন্ধুদের জন্য কমবেশী অর্থ কিংবা অন্যকিছু দিয়ে যান। থিয়েটার অনেক দিন ত্যাগ করলেও সহকর্মীদের কথা তিনি ভুলতে পারেননি। গ্লোব থিয়েটার নতুন বাড়ি তৈরী করেছে। উদ্বোধনের জন্য তিনি কোনো নতুন নাটক লিখে দিতে পারেননি। দর্শকরা হতাশ হয়েছে। নাটক লিখতে না পারলেও থিয়েটারের কথা, সহকর্মীদের কথা তাঁর মনে পড়ত। তাই উইলে তিনজন সহ-অভিনেতা রিচার্ড বারবেজ, জন হেমিং এবং হেনরী কণ্ডেল-এর জন্য অর্থ বরাদ্দ করে গিয়েছিলেন। মৃত্যুর পরে এই অর্থ দিয়ে তাঁদের স্মারক-আংটি কিনে দেওয়া হবে,—তাঁরা যেন শেক্সপীয়রকে না ভুলে যান।

এপ্রিল মাসে বেন জনসন ও কবি মাইকেল ড্রেটন শেক্সপীয়রের অতিথি হয়েছিলেন স্ট্র্যাটফোর্ডে। রাত্রির ভোজ বাড়িতে শেষ করে পানীয়ের জন্য শেক্সপীয়র বন্ধুদের নিয়ে গিয়েছিলেন কিছু দূরের এক হোটেলে। পুরনো দিনের গল্প করতে করতে তাঁদের ফিরতে রাত হয়েছিল। হয়তো ঠাণ্ডা লেগে শেক্সপীয়র অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। শেক্সপীয়রের জন্মদিন ও মৃত্যুদিন বোধ হয় একই। ২৩শে এপ্রিল ১৬১৬ তিনি পরলোকগমন করেন। অনেকের মতে ৫২ বছর পূর্বে ২৩শে এপ্রিলই তাঁর জন্ম হয়েছিল।

বিখ্যাত লোকদের কবর দেওয়া হয় ওয়েস্টমিন্স্টার অ্যাবিতে। শেক্সপীয়রের সে গৌরবের আকাঙ্ক্ষা ছিল না। স্ট্র্যাটফোর্ডকে তিনি

ভালোবাসতেন প্রাণ দিয়ে। দেহাবশেষ স্ট্র্যাটফোর্ডেই থাকবে এই ছিল তাঁর শেষ ইচ্ছা। কেউ যদি দেহাবশেষ সরাতে চেষ্টা করে তাহলে তার অমঙ্গল হবে—এই সাবধানবাণী খোদাই করা আছে তাঁর কবরের উপরে :

Good friend, for Jesus' sake forbear
To dig the dust enclosed here
Blest be the man that spares these stones
And curst be he that moves my bones.

শেক্সপীয়রের নাটক ও কাব্য রচনার সঠিক কালানুক্রমিক পঞ্জী সংকলন করা সম্ভব নয়। শেক্সপীয়রের জীবিতকালে তাঁর আঠারোটি নাটকের 'কোয়ার্টো' সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। মৃত্যুর পরে তাঁর নাটকের সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত শেক্সপীয়র-বিশেষজ্ঞ ই কে চেম্বার্সের অভিমতের উপর ভিত্তি করে রচনার তারিখ অনুযায়ী শেক্সপীয়রের রচনাবলীর একটি তালিকা দেওয়া হলো :

1590-1	Second Part of King Henry VI Third Part of King Henry VI
1591-2	First Part of King Henry VI
1592-3	King Richard III, The Comedy of Errors, Venus and Adonis
1593-4	Titus Andronicus, The Taming of the Shrew, The Rape of Lucrece
1594-5	Two Gentlemen of Verona, Love's Labour's Lost, Romeo and Juliet
1595-6	King Richard II, A Midsummer Night's Dream, The Sonnets
1596-7	King John, The Merchant of Venice
1597-8	First Part of King Henry IV, Second Part of King Henry IV

1598-9	Much Ado about Nothing, King Henry V
1599-1600	Julius Caesar, As You Like It, Twelfth Night
1600-1	Hamlet, The Merry Wives of Windsor, The Phoenix and the Turtle
1601-2	Troilus and Cressida
1602-3	All's Well that Ends Well
1603-5	Measure for Measure, Othello
1605-6	King Lear, Macbeth
1606-7	Antony and Cleopatra
1607-8	Coriolanus, Timon of Athens
1608-9	Pericles
1609-10	Cymbeline
1610-11	The Winter's Tale
1611-12	The Tempest

শেক্সপীয়রের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'ভেনাস অ্যাণ্ড অ্যাডোনিস' (১৫৯৩) বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। অল্পসময়ের মধ্যেই এ বইয়ের দশটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়। এটি তাঁর প্রথম বই। শেক্সপীয়র নিজেই বলেছেন, বইটি হলো "the first heir of my invention." 'ভেনাস অ্যাণ্ড অ্যাডোনিসে'র সাফল্য লেখকের মনে আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছিল। কোনো কোনো সমালোচকের এই কাব্যের লঘু সুর এবং আদিরসের প্রাধান্য ভালো লাগেনি। যেন তাঁদের উত্তর দেবার জন্যই পরবৎসর প্রকাশিত হলো 'দি রেপ অব লুক্রিস'। এর বিষয়বস্তু যে গুরুগম্ভীর সে বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। দুটি বই-ই আর্ল অব সাদাম্পটনকে উৎসর্গ করা হয়েছিল।

শেক্সপীয়রের কবি-খ্যাতি নির্ভর করে প্রধানতঃ তাঁর সনেট-

সংগ্রহের উপর। যদিও ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তথাপি সনেটগুলির রচনাকাল আরম্ভ হয়েছে ১৫৯১ সাল নাগাদ। ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এদের মধ্যে পাওয়া যায়। অবশ্য কয়েকটি এমন সনেটও আছে যাদের কাব্যমূল্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পূর্বেই শেক্সপীয়রের সনেট-গুলি স্বীকৃতি লাভ করেছে। ফ্রান্সিস মিয়ার্স ১৫৯৮ সালে লিখেছেন যে, শেক্সপীয়রের 'সুগারড্' সনেটগুলি বন্ধুরা পড়ে আনন্দ পান। উইলিয়াম জাগার্ড-সম্পাদিত সঙ্কলন-গ্রন্থ 'দি প্যাশানেট পিলগ্রিম' (১৫৯৯)-এ শেক্সপীয়রের দুটি সনেট ছাপা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, সঙ্কলনে বিভিন্ন লেখকের একুশটি কবিতা থাকা সত্ত্বেও লেখক হিসাবে আখ্যাপত্রে ছাপা হয়েছিল শেক্সপীয়রের নাম। সে-নাম পাঠকমহলে তখন এতই পরিচিত যে বই তাড়াতাড়ি বিক্রি হবে বলে প্রকাশকের বিশ্বাস ছিল।

টমাস থর্প নামে একজন ঠক প্রকাশক শেক্সপীয়রের অজ্ঞাতে সনেটের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে ছাপিয়ে দিয়েছিল। একশ' চুয়ান্নটি সনেটের এই সংগ্রহ সমালোচকদের নিকট জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সনেটগুলি কাকে উৎসর্গ করা হয়েছে? কয়েকটি সনেটে যে রহস্যময়ী শ্যামবর্ণা মহিলার উল্লেখ পাওয়া যায় তিনি কে? উত্তরের সন্ধানে নানা মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে, সমাধান পাওয়া যায়নি। সমস্যা শুরু হয়েছে উৎসর্গপত্র থেকে। সনেটগুলি উৎসর্গ করা হয়েছে: To the onlie begetter of these insuing sonnets Mr. W. H.... 'বিগেটার' যদি প্রেরণাদাতা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং উৎসর্গপত্র যদি শেক্সপীয়র লিখে থাকেন তাহলে ডবলিউ এইচ-এর অর্থ হলো Henry Wriothesley, Third Earl of Southampton II। পূর্ববর্তী কাব্যদুটিও এঁকেই উৎসর্গ করা হয়েছে। 'বিগেটার', 'প্রকিউরার' বা যে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে দিয়েছে,—এই অর্থেও প্রকাশক ব্যবহার করতে পারে। তাহলে ডবলিউ এইচ কে তা খুঁজে বের করা কঠিন।

শেক্সপীয়র লণ্ডনে সপরিবারে থাকতেন না। স্ত্রী তাঁর চেয়ে বয়সে বড়। সুতরাং অন্য কোনো রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। কে সেই 'ডার্ক লেডি'? পেমব্রোকের প্রণয়িনী মেরি ফিটন? রানীর সুন্দরী সহচরী এলিজাবেথ ভারনন, যাকে আর্ল অব সাদাম্পটন বিয়ে করেছিলেন? অথবা অক্সফোর্ডের ক্রাউন ট্যাভার্নের মালিকের স্ত্রী জেন ড্যাভেনাণ্ট? লণ্ডন থেকে স্ট্র্যাটফোর্ড যাবার পথে তিনি প্রায়ই সেই ট্যাভার্নে যেতেন এবং জেনের চতুর্থ পুত্রের ধর্মপিতা হয়েছিলেন। সেই অঞ্চলে তখন গুজব রটেছিল যে ধর্মপিতা নন, শেক্সপীয়রই ছিলেন আসল পিতা।

পশ্চাৎপট অজ্ঞাত থাকলেও ক্ষতি নেই। নিছক কাব্য হিসাবে সনেটগুলির রসাস্বাদন করা চলে। এদের প্রধান বিষয় হলো কবির আত্মবিলোপকারী বন্ধুপ্রেম। বন্ধু তরুণ রূপবান এবং বিত্তশালী। কবি বন্ধুর কাছ থেকে ভালোবাসার আশানুরূপ প্রতিদান পান না বলে একটু ক্ষুব্ধ। তারপর দুই বন্ধুর মধ্যে এসে উপস্থিত হলো সেই রহস্যময়ী 'ডার্ক লেডি'। এর ফলে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিল তা আরও তীব্র হলো কয়েকজন প্রতিদ্বন্দ্বী কবি যোগ দেওয়ায়। ভালোবাসা কালো মেয়েকেও রূপসী করেছে। কবি বলছেন:

Thine eyes I love, and they, as pitying me,
Knowing thy heart torments me with disdain,
Have put on black, and loving mourners be,
Looking with pretty ruth upon my pain···
Then will I swear beauty herself is black,
And all they foul that thy complexion lack.

নিম্নসংখ্যক সনেটগুলি কাব্যগুণে বিশেষরূপে সমৃদ্ধ: ১২; ১৫; ১৭; ১৮; ২৫; ২৯; ৩০; ৩৩; ৫৫; ৬০; ৬৬; ৭১; ৭৩; ৯৭; ৯৮; ৯৯; ১০৬; ১০৭; ১১৬ এবং ১৪৬।

নাটকগুলি সংরক্ষণের জন্য শেক্সপীয়রের কোনো যত্ন ছিল না। তাঁর জীবিতকালে যে কয়েকটি নাটক ছাপা হয়েছিল তা ছাড়া

অন্য সবগুলিই হয়তো চিরদিনের জন্য হারিয়ে যেত যদি না তাঁর বন্ধু ও সহ-অভিনেতা হেমিং এবং কণ্ডেল উদ্যোগী হতেন। সে যুগে আস্ত একটি নাটকের পাণ্ডুলিপি পাওয়া সহজ ছিল না। অভিনেতাদের যার যতটা পাঠ তাকে ততটা লিখে দেওয়া হতো। সম্পূর্ণ নাটক রাখা হতো না পাছে ঠক প্রকাশক অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী থিয়েটারের দলের হাতে পড়ে। হেমিং এবং কণ্ডেল থিয়েটারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে যুক্ত ছিলেন বলে টুকরো টুকরো অংশগুলি সংগ্রহ করে ১৬২৩ সালে শেক্সপীয়রের নাটক-সংগ্রহ প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ছত্রিশটি নাটক। হেমিং ও কণ্ডেল সম্পাদিত এই নাটক-সংগ্রহ 'ফার্স্ট ফোলিও' নামে সুপরিচিত। কণ্ডেল এবং হেমিং ভূমিকায় বলেছেন যে, নিজেদের নাম প্রচার অথবা অর্থ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে এই সংস্করণ তাঁরা প্রকাশ করেননি, শেক্সপীয়রের স্মৃতি চিরজাগ্রত করে রাখবার জন্যই তাঁরা কাজ করেছেন। এই সংস্করণের মোট আড়াইশ' কপি ছাপা হয়েছিল। পৃথিবীর দুষ্প্রাপ্যতম বইগুলির অন্যতম এটি। প্রথম যখন বের হয় তখন আজকের মূল্যমানে 'ফার্স্ট ফোলিও'র এক কপির দাম ছিল তেরো টাকা। ১৯৪৬ সালে নিউ ইয়র্কে এক কপি বিক্রি হয়েছে প্রায় পৌনে দু'লক্ষ টাকায়।

'ফার্স্ট ফোলিও'র পরে শেক্সপীয়র-রচনাবলী প্রথমে সম্পাদনা করেন নিকোলাস রো, ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ স্যামুয়েল জনসন-সম্পাদিত আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সম্পাদকের ভূমিকাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। শেক্সপীয়রের রচনাবলীর সামগ্রিক মূল্যায়নের প্রথম চেষ্টা এটি। আজ পর্যন্ত শেক্সপীয়রের রচনার দুই শতাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোলরিজ, ল্যাম, হ্যাজলিট, আর্নল্ড প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখক শেক্সপীয়রের নাটকগুলির বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা আরম্ভ করেন। বিংশ শতকে শেক্সপীয়র-সমালোচকের সংখ্যা অগুণতি। তাঁরা সম্ভাব্য সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। শুধু ইংরেজীতে

শেক্সপীয়রের উপরে যত বই বেরিয়েছে তা দিয়ে একটি ভালো লাইব্রেরি গড়ে তোলা যায়।

সমালোচকরা শুধু যে শেক্সপীয়রের নিন্দা ও প্রশংসা করেছেন তা নয়; তাঁর অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করবার চেষ্টা হয়েছে। অনেকে বলেছেন, সেক্সপীয়রের নাটকগুলির আসল লেখক স্যার ফ্রান্সিস বেকন। তাঁর মতো পণ্ডিত ছাড়া এত সব গভীর তত্ত্বের কথা কে লিখতে পারে। রানী এলিজাবেথের প্রিয়পাত্র কবি আর্ল অব অক্সফোর্ডকেও অনেকে নাটকগুলির লেখক বলে মনে করেন। এই সম্মান ক্রিস্টোফার মার্লোকেও দেওয়া হয়েছে। আবার এমন কথাও উঠেছে যে, শেক্সপীয়র কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়; শেক্সপীয়র হচ্ছে একটি দলের ছদ্মনাম; এই দল থিয়েটারের জন্য মিলিতভাবে নাটক রচনা করত।

সমকালীন সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে শেক্সপীয়রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয় হতে পারি। 'ফার্স্ট' ফোলিও'তে শেক্সপীয়রের প্রতি বেন জনসনের যে শ্রদ্ধাঞ্জলি ছাপা হয়েছে তাতে তিনি বলেছেন, 'হি (শেক্সপীয়র) ওয়াজ নট অব অ্যান এজ্, বাট ফর অল টাইম'। আজ চারশ' বছরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে তিনি শুধু সর্বকালের নন, সকল দেশেরও। কোন্ গুণে শেক্সপীয়র এমন প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন তা বিশ্লেষণ করা যায় না। প্রতিভার পথ বিচিত্র, ব্যাখ্যার অতীত।

তথাপি শেক্সপীয়রের রচনাবলীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। তাঁর নাটকের কাহিনী মানব-হৃদয়ের মৌলিক অনুভূতি কেন্দ্র করে রচিত। তাই সকল দেশের পাঠক বা দর্শকের নিকট তাঁর রচনার আবেদন অক্ষুণ্ণ আছে। শেক্সপীয়রের পাত্র-পাত্রীরা শয়তান অথবা দেবতা নয়, তারা রক্ত-মাংসের মানুষ, দোষ-গুণের সমন্বয়ে গঠিত। তাঁর গভীর সহানুভূতি সমস্ত নাটকের উপর একটি স্নিগ্ধতার পরিবেশ সৃষ্টি করে। তাঁর ভাষা কাব্যময় এবং ভাবগর্ভ। সর্বোপরি শেক্সপীয়র অতুলনীয় গল্পকার। হোমার যুদ্ধবিগ্রহ ও

অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কাহিনী লিখেছেন; সফোক্লিস, টলস্টয়, টমাস হার্ডি বলেছেন মানবজীবনের বিপর্যয়ের কাহিনী; প্লুটার্ক দিয়েছেন ইতিহাস, অ্যারিস্টোফেনিস কমেডি, হ্যান্স অ্যাণ্ডারসন লিখেছেন ছেলেদের জন্য রূপকথা। কিন্তু শেক্সপীয়র লিখেছেন ইতিহাস, মেলোড্রামা, কমেডি, ট্রাজেডি, রূপকথা ও প্রেমের উপাখ্যান,—সবকিছু। মানবজীবনের সামগ্রিক শিল্পী বলেই সংসারের সকল রূপই তাঁর রচনায় ধরা পড়েছে।

ড্যানিয়েল ডিফো

১৬৬০ ?—১৭৩১

ষাট বছর বয়সে প্রথম একটি কাহিনী রচনা করেই বিশ্বসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করবার দৃষ্টান্ত কেবল একটিই আছে। সেই দৃষ্টান্ত ড্যানিয়েল ডিফোর। ডিফো এর আগে লিখেছেন অনেক। কিন্তু সে সব রাজনৈতিক কিংবা ধর্মবিষয়ক পুস্তিকা। সমসাময়িক ইতিহাসে এদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। প্রকৃতপক্ষে তাঁর জীবনের কোনো কোনো পর্বে এই পুস্তিকা রচনাই ছিল জীবিকার প্রধান উপায়। ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে 'রবিনসন ক্রুসো' যখন প্রথম বের হলো তখন ডিফোর বন্ধু, অনুরাগী এবং শুভানুধ্যায়ীরা সবাই তাঁকে একটু অবজ্ঞার চোখে দেখতে আরম্ভ করল। এত ভালো ভালো বিষয় ছেড়ে শেষ পর্যন্ত ডিফো কিনা গল্প লিখতে বসলেন?

তখন অবশ্য ডিফো নিজেও জানতেন না রবিনসন ক্রুসো হবে আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রথম যুগের অন্যতম উপন্যাস। তাঁর পাঠকরাও এ বইয়ের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুঝতে পারেননি।

ডিফোর জন্মের সঠিক তারিখ জানা যায় না। তবে আধুনিক জীবনীকারদের ধারণা তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। চসার ও শেক্সপীয়রের মধ্যযুগীয় লণ্ডনে ডিফোর জন্ম। ছ' বছর পরে, অর্থাৎ ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে, এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে লণ্ডনের অনেক প্রাচীন কীর্তি ভস্মীভূত হয়ে যায়। এর ফলে শুরু হয় আধুনিক লণ্ডনের গোড়াপত্তন। ডিফোর বাড়ির নিকটেই কবি মিলটন থাকতেন। বালক ডিফো যেতে-আসতে অন্ধ কবিকে রোদ পোহাতে দেখেছেন বাড়ির সামনে রাস্তার উপরে।

বাবা চোম্‌স্ ফো ছিলেন চর্বি দিয়ে তৈরী মোমবাতির ব্যবসায়ী।

অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল। ড্যানিয়েল ডিফোর ছেলেবেলার অধিকাংশ সময় কেটেছে লণ্ডনের অলিতে-গলিতে ঘুরে ঘুরে। ডঃ জনসন, ডিকেন্স এবং চার্লস ল্যাম্ লণ্ডনকে ভালোবাসতেন, তাঁদের রচনায় লণ্ডনের জীবনকে অমর করে রেখেছেন। কিন্তু ডিফোর মতো লণ্ডনের সঙ্গে তাঁদের এমন অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল না। ডিফো পরিচিত ছিলেন বস্তিজীবনের পঙ্কিলতার সঙ্গে, জানতেন কোথায় পতিতা নারীদের আস্তানা, কোথায় গুণ্ডাদের আড্ডা। শুধু লণ্ডনকে নয়, লণ্ডনের অধিবাসীদের সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় পরিচয়। ছেলেবেলার এই অভিজ্ঞতা লেখক-জীবনে কাজে লেগেছিল। মানবচরিত্রের অভিজ্ঞ জহুরী ছিলেন ডিফো। আর তাঁর অদম্য ভ্রমণলিপ্সারও সূত্রপাত হয়েছিল লণ্ডনের পথে পথে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে।

লণ্ডনের এই পথ-বিলাসী ছেলেটিকে সবাই জানত ড্যানিয়েল ফো (Foe) নামে। বড় হয়ে স্কুলে পড়বার সময় তিনি স্বাক্ষর করতেন D. Foe II। বয়স যখন বছর চল্লিশ তখন বংশমর্যাদার প্রশ্ন দেখা দিল। নিজেই তৈরি করে নিলেন ভুয়ো বংশতালিকা, আর সেই সঙ্গে বদলে নিলেন পদবী। এবার থেকে তাঁর নাম হলো ড্যানিয়েল ডিফো—Daniel Defoe II। বাবার নির্দেশ ছিল, পাদ্রি হও বা ব্যবসায়ী হও সেটা বড় কথা নয়; সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ভদ্রলোক হতে হবে। ড্যানিয়েল বাবার কথা রাখতে চেষ্টা করেছিলেন।

সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ভালো শিক্ষা অত্যাবশ্যক। জেম্স্ ফো ছেলের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন ভালো করেই। কিন্তু ব্যবস্থা করা সহজ ছিল না। জেম্স্ ধর্মবিশ্বাসে ছিলেন ডিসেণ্টার, অর্থাৎ, চার্চ অব ইংলণ্ডের বিরুদ্ধবাদী। এর ফলে লণ্ডনের কোনো ভালো স্কুলে অথবা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ড্যানিয়েলের পক্ষে ভর্তি হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ, চার্চ অব ইংলণ্ডই তখন দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রধান নিয়ামক; ডিসেণ্টারদের শিক্ষার সুযোগ দিতে রাজকীয় চার্চের মোটেই আগ্রহ ছিল না। ইংলণ্ডে ডিসেণ্টারদের

সবচেয়ে নামকরা বিত্থালয় মর্টন্‌স্ অ্যাকাডেমিতে ড্যানিয়েলকে ভর্তি করে দেওয়া হলো। জায়গাটা স্বাস্থ্যকর, লণ্ডন থেকে বেশী দূরে নয়। কয়েক বছর আগে ড্যানিয়েলের মা'র মৃত্যু হয়েছে। স্বাস্থ্য কিছুতেই ভালো যাচ্ছে না। চিকিৎসায় কোনো ফল হয়নি। স্থান পরিবর্তনে হ্তে পারে। এই সব দিক ভেবে বাবা ড্যানিয়েলকে মর্টন্‌স্ অ্যাকাডেমিতে পাঠালেন। ১৬৭৪ থেকে ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বিত্থালয়ে পড়েছেন ড্যানিয়েল। রেভারেণ্ড চার্লস্ মর্টনের তত্ত্বাবধানে এখানে পড়াশুনা সত্যি ভালো হতো এবং ড্যানিয়েলের জীবনে গভীর প্রভাব পড়েছে এই প্রতিষ্ঠানের।

প্রোটেস্টাণ্ট পাদ্রি হওয়ার জন্ম যে সব শিক্ষা প্রয়োজন, ড্যানিয়েল তা সবই পেয়েছিলেন। কিন্তু পরে তাঁর মনে হলো এ পথ তাঁর নয়। একুশ বছর বয়সেই তিনি স্থির করলেন, পাদ্রি হবেন না, ব্যবসা করবেন।

মাত্র বছর তু'য়েকের মধ্যেই ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করলেন ড্যানিয়েল। লণ্ডনের খুব বেশী ভাড়ার অঞ্চলে আপিস খুলেছেন। ব্যবসা ছাড়া তাঁর প্রথম রাজনৈতিক পাম্‌ফলেট এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এই সময়ই তিনি বিয়ে করলেন। যদিও তাঁর শত্রুরা ইঙ্গিত করত যে কনের সম্পত্তিই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, তবু একথা নিঃসন্দেহ যে মেরিকে ভালোবেসেই বিয়ে করেছিলেন তিনি। তাঁদের উনপঞ্চাশ বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতিহাসই এর সাক্ষ্য দেবে।

বিয়ের অল্প কিছুকাল পর থেকেই আরম্ভ হলো ডিফোর বিচিত্র জীবনধারা। ব্যবসায়ে, রাজনীতিতে এবং লেখায় এমন উত্থান-পতন কদাচিৎ দেখা যায়। প্রথমেই তিনি ডিউক অব মনমাউথের পক্ষ অবলম্বন করে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ডিউক অব মনমাউথের দাবি অগ্রাহ্য করে দ্বিতীয় জেম্‌স্‌কে সিংহাসনে বসানো হয়েছে। তারই প্রতিবাদে মনমাউথের সশস্ত্র বিদ্রোহ। আর সেই বিদ্রোহী দলে যোগ দিলেন ডিফো। স্বেচ্ছায় এরূপ বিপদ বরণ করবার কারণ তাঁর অ্যাড্‌ভেঞ্চারপ্রিয়তা, ন্যায়ের পক্ষে সংগ্রামের

আগ্রহ এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অত্যাচারী সরকারকে অপসারণের অভিপ্রায়। আরও অনেকে যোগ দিয়েছিলেন মনমাউথের পক্ষে। কিন্তু তাঁদের শোচনীয় হার হলো। গ্রেফ্তার এড়াবার জন্য ডিফো আরও অনেকের মতো দেশ ছেড়ে চলে গেলেন য়ুরোপে। বছর তিনেক কাটলো পালিয়ে পালিয়ে।

তারপরে দেশে ফিরে আবার আরম্ভ করলেন ব্যবসা। নানা রকমের। জমির, গেঞ্জির, কাপড়ের, ইঁট ও টালির, আরও কত জিনিসের। কিন্তু রাজনীতি ত্যাগ করে কোনো ব্যবসাতেই সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করতে পারেননি। তার ফলে এবং ঝুঁকিপ্রিয়তার জন্য কয়েক বছরের মধ্যে ডিফোকে আদালত থেকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করা হলো। তাঁর ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় সাড়ে সতেরো হাজার পাউণ্ড, আজকের বিনিময় হারে ভারতীয় মুদ্রায় তিন লক্ষ টাকা। তখন আইন ছিল অন্য রকম। দেউলিয়া হলেই ঋণ শোধের দায় থেকে মুক্ত হওয়া যেত না। ডিফো বারো হাজার পাউণ্ড ঋণ শোধ করেছিলেন, আর মাত্র পাঁচ হাজার পাউণ্ড বাকি। তাও হয়তো শোধ হয়ে যেত যদি না তাঁকে গ্রেফতার করা হতো 'দি সরটেস্ট ওয়ে উইদ দি ডিসেণ্টারস্' লেখার অভিযোগে।

'দি সরটেস্ট ওয়ে'-তে ডিফো প্রস্তাব দিয়েছেন যে ডিসেণ্টাররা যদি চার্চ অব ইংলণ্ডকে স্বীকার করে না নেয় তাহলে তাদের ফাঁসি দেওয়া হোক। সমস্যা সমাধানের এটাই সবচেয়ে সহজ পথ। এমন পথের কথা শুনে ডিসেণ্টাররা তো আঁতকে উঠল। চার্চ অব ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ প্রথম খুব খুশি হলেন। কিন্তু পরে যখন অন্তর্নিহিত বিদ্রূপটা স্পষ্ট হয়ে গেল তখন তাঁদের ক্রোধ ধৈর্যের সীমা ভাঙল। চার্চ অব ইংলণ্ড এবং সরকারের বিরুদ্ধে এই ব্যঙ্গ-আক্রমণ নীরবে সহ্য করা যায় না। লেখককে গ্রেপ্তার করা হলো।

১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দের দোসরা জানুয়ারি ডিফোর বিরুদ্ধে 'দি সরটেস্ট ওয়ে' লেখার জন্য অভিযোগ উত্থাপন করা হলো। পরদিনই ওয়ারেণ্ট বের হলো তাঁর নামে। ডিফো আগে থেকে খবর পেয়ে গা ঢাকা

দিলেন। এখন তাঁর ইট টালি তৈরির কারখানা খুব ভাল চলছে। এমনি চললে দেনা সম্পূর্ণ শোধ করতে দেরি হবে না। ঋণশোধ ছাড়াও আছে সংসারের খরচ চালাবার প্রশ্ন। সুতরাং তিনি তাঁর পূর্বপরিচিত ক্ষমতাপন্ন লোকেদের কাছে চিঠি লিখতে লাগলেন ঠিকানা না জানিয়ে। কয়েকটি পাম্‌ফলেটও ছাপালেন আত্মপক্ষ সমর্থন করে। কিন্তু কেউ তাঁকে রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে এলো না। এদিকে ধরে দিতে পারলে পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হলো গেজেটে।

ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে মাত্র কিছুকাল আগে ডিফো ছিলেন রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের পরামর্শদাতা। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক ব্যাপারে তাঁর উপদেশ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো। রাজকীয় শোভাযাত্রায় কতবার অংশ গ্রহণ করেছেন ডিফো। রাজা তৃতীয় উইলিয়াম তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন 'দি ট্রু বর্ন ইংলিশম্যান' (১৭০১) কবিতাটি পড়ে। ডিফো এই কবিতায় ইংরেজ জাতির অন্য জাতিকে ছোট করে দেখা এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্বাভিমানকে বিদ্রূপ করেছেন। উইলিয়াম নিজে ইংরেজ ছিলেন না বলে এই কবিতাটি তাঁর খুব ভালো লেগেছিল। এক বছর আগে উইলিয়ামের মৃত্যু হয়েছে ; সুতরাং এখন ডিফোর আবেদনে সাড়া দেবার মতো কেউ নেই। রাজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এতদিন যারা ঈর্ষার চোখে দেখেছে, আজ তারা ডিফোকে শায়েস্তা করবার সুযোগ পেয়েছে।

প্রায় সাড়ে চার মাস আত্মগোপন করে রইলেন ডিফো। তারপর ধরা পড়লেন, বিচার হলো ; টাকার অভাবের জন্য কোনো ভালো আইনজ্ঞকে পক্ষ সমর্থনের জন্য নিযুক্ত করতে পারেননি। বিচারে ডিফোর জরিমানা হলো, তিনদিন পিলরিতে দাঁড়াবার নির্দেশ দেওয়া হলো এবং সাত বছর সৎভাবে জীবন যাপন করবার জামিন দেবার আদেশ দেওয়া হলো। অপরাধের তুলনায় শাস্তি খুবই বেশী।

এর মধ্যে পিলরিতে দাঁড় করানোটাই সবচেয়ে কঠোর সাজা। খোলা জায়গায় কাষ্ঠস্তম্ভে হাত পা এবং গলা এমনভাবে আটকে দেওয়া হয় যে নড়াচড়া যায় না। অনেকটা ক্রুশের মতো, তবে হাত

পা পেরেক দিয়ে আটকানো হয় না। ফাঁকের মধ্যে হাত পা গলা ঢুকিয়ে আটকে রাখার বন্দোবস্ত আছে। মাথার উপর লিখে দেওয়া হয় অপরাধের বিবরণ। কৌতূহলী দর্শকের ভিড় জমে যায় তামাসা দেখবার জন্য। তারপর মজা দেখবার জন্য জনতা ঢিল ছুঁড়তে থাকে পিলরিতে আবদ্ধ বন্দীকে লক্ষ্য করে। রক্ষীরা বাধা দেয় না, এটা জনতার বহুদিনের অলিখিত অধিকার। কত বন্দী প্রাণ দিয়েছে ঢিলের আঘাতে, কত বন্দী জন্মের মতো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হারিয়েছে। ডিফোর ভয় এই পিলরিকে। একদিন নয়। তিনদিন দাঁড়াতে হবে।

নিজেকে ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করলেন ডিফো। ভয়ে অন্য ডিসেন্টাররা তাঁকে ত্যাগ করেছে; টাকা দিতে পারেননি বলে আইনজ্ঞরা সাহায্য করতে এলো না; বন্ধুরা মুখ ফিরিয়েছে; যে হুইগ দলের নেতাদের জন্য এত করেছেন তারাও তাঁর আবেদনে বিন্দুমাত্র সাড়া দিল না। সুতরাং নির্বিকারচিত্তে শাস্তি গ্রহণ করা ছাড়া উপায় কি?

কিন্তু আশ্চর্য, জনতা ত্যাগ করেনি তাঁকে। ভিড় কম হয়নি, দলে দলে নর-নারী এসে খোলা জায়গা ভরে ফেলেছে। পিলরিতে দাঁড়িয়ে ডিফোর সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছে। দূর থেকে সব ভালো করে দেখতে পাচ্ছেন না। তবু দেখতে পেলেন হাজার হাজার কপি 'দি সরটেস্ট ওয়ে' বিক্রি হচ্ছে। ক'মাস আগে সরকারের আদেশে এ বই প্রকাশ্যে পোড়ানো হয়েছিল। এখন নতুন করে ছাপানো হয়েছে, দর্শকরা সাগ্রহে কিনছে। এ ছাড়া জেলে বসে যে ক'টি কবিতা লিখেছিলেন তাও এক রাত্রির মধ্যে তাড়াতাড়ি ছাপিয়ে এনেছে ভালো বিক্রি হবে এই আশায়। একটি কবিতা 'এ হিম টু দি পিলরি' থেকে কতকগুলি লাইন আবৃত্তি করছে অনেকে:

Hail hieroglyphic state machine
Contrived to punish fancy in:
Men that are men, in thee can feel no pain.

অন্য সকলে ত্যাগ করলেও জনতা তাঁকে ত্যাগ করেনি। তাঁকে

লক্ষ্য করে একটি ঢিলও ছুঁড়লো না কেউ। বরং সম্মান দেখিয়েছে তাঁরই বই পড়ে পিলরির চার পাশে।

মুক্তি লাভের পর ডিফোর জীবনে একটা পরিবর্তন এলো। ব্যবসা করবার চেষ্টা আর করলেন না। ব্যবসা করতে গেলে মুশকিলও আছে। একটু উন্নতির দিকে যাচ্ছে দেখলেই পাওনাদাররা এসে চড়াও হয়। তাই স্থির করলেন লেখাকেই করবেন পেশা। প্রধান কাজ হলো রিপোর্টারের। টাকা নিয়ে রাজনৈতিক দলের পক্ষে ইংলণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে গোয়েন্দাগিরি করেছেন এবং রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। নিজে একটি পত্রিকা 'দি রিভিয়্যু' সম্পাদনা করেছেন ১৭০৪ থেকে ১৭১৩ পর্যন্ত। এর একটি নিয়মিত বিভাগ 'অ্যাডভাইস ফ্রম দি স্ক্যাণ্ডেলাস ক্লাব' আধুনিক রম্যরচনার সূত্রপাত করেছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। স্টিল তাঁর 'ট্যাট্‌লার' কাগজে অনেক বিষয়ে ডিফোর অনুসরণ করেছেন।

সাংবাদিকতা ছাড়া ডিফোর প্রধান অবলম্বন হলো পাম্‌ফলেট লেখা। নানা বিষয়ে লিখেছেন। রাজনীতি, অর্থনীতি, ভ্রমণ, জীবনী, ইতিহাস ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ের উপরে লিখেছেন তিনি। এই সব লেখায় চিন্তার নবত্ব, গভীরতা এবং বলিষ্ঠতা সহজেই পাঠকের মন আকৃষ্ট করে। অষ্টাদশ শতকেও যে তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিকল্পনা করেছিলেন তা দেখে চমক লাগে। চতুর্দশ লুইকে ব্রিটিশ সেনা-বাহিনীর হাতে খুব নাকাল হতে হলো। ব্রিটিশের এই জয়কে ডিফো পৃথিবীর কাজে লাগাতে চাইলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন, ইংলণ্ড ও তার মিত্রশক্তিরা মিলে এমন একটি সংঘ স্থাপন করুক যেখানে সকল বিরোধের নিষ্পত্তি করা হবে। এর ফলে শক্তিশালী রাষ্ট্রের আক্রমণাত্মক অভিযান সংযত হবে এবং দুর্বল রাষ্ট্রগুলি নিরাপত্তা অনুভব করবে।

জীবিকার্জনের জন্য ডিফো এমন অনেক কাজ করেছেন যা এখন সমর্থন করা যায় না। হয়তো একই সঙ্গে তিনি হুইগ এবং টোরি দলের পক্ষে লিখেছেন। করেছেন রাজনৈতিক গোয়েন্দাগিরি। কিন্তু

তথাপি তাঁর নানা রচনায় ছড়িয়ে আছে একটি বৃহত্তর আদর্শের প্রতি আনুগত্য। দুই বিরুদ্ধবাদী রাজনৈতিক দলের সেবা করলেও তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শের মধ্যে কোনো সঙ্কীর্ণতা ছিল না। তিনি বলতেন সকল নাগরিকের মঙ্গল সাধনই গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য দরকার হলে গভর্ণমেণ্টকে নীতি বদলাতে হবে।

ডিফো বই লিখেছেন আড়াইশ'র বেশী। কিন্তু আজ লোকে মনে রেখেছে মাত্র এই ক'টি : The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe (1719); The Fortunes and Misfortunes of the Famous Moll Flanders (1722); A Journal of the Plague Year (1722). ষাট বছর বয়সে ডিফো আবিষ্কার করলেন তাঁর সত্যিকার প্রতিভা কথাসাহিত্যিকের, ব্যবসায়ীর বা রাজনৈতিক পুস্তিকা লেখকের নয়। জীবনের শেষ ক'বছর তাই তিনি শুধু উপন্যাসই লিখেছেন। আর এমন দ্রুত লিখেছেন যে সবাই বিস্মিত হয়ে যেত। তাঁর এই শেষ বয়সের উপন্যাসের মধ্যে 'দি কিং অব পাইরেট্স', 'দি অ্যাডভেঞ্চারস্ অব ডানকান ক্যামবেল', 'মেমোয়রস্ অব এ ক্যাভেলিয়ার', 'ক্যাপটেন সিঙ্গলটন,' 'কর্নেল জ্যাক', 'রোক্সনা' প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য।

১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল তারিখটি ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঐ দিন প্রকাশিত হলো 'রবিনসন ক্রুসো'। দীর্ঘ নামটি লোকে এখন ভুলে গেছে, সংক্ষিপ্ত নাম 'রবিনসন ক্রুসো'ই মনে রেখেছে। বাইবেল ছাড়া এর আগে অন্য কোনো বই এমন জনপ্রিয় হয়নি গ্রেট ব্রিটেনে। এটি ইংরেজী সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। বানিয়ানের 'দি পিলগ্রিম্স্ প্রগ্রেস'-এ উপন্যাসের কিছু কিছু লক্ষণ থাকলেও আসলে উপন্যাস নয়। প্রথম উপন্যাসের এরকম সাফল্য অভূতপূর্ব।

সন্দেহ নেই, ডিফো তাঁর কাহিনী রচনা করেছিলেন

আলেকজাণ্ডার সেলকার্কের অ্যাডভেঞ্চারের উপর ভিত্তি করে। সেলকার্ক চিলির কাছে একটি জনমানবহীন দ্বীপে স্বেচ্ছায় চার বছর চার মাস (১৭০৪-১৭০৯) কাটিয়েছিলেন। সেলকার্কের কথা লোকের মুখে মুখে ইংলণ্ডের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এই কাঠামোটিকে নিয়ে ডিফো আশ্চর্য শিল্প সৃষ্টি করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত 'রবিনসন ক্রুসো'র সাতশ' সংস্করণ, অনুবাদ ও রূপান্তর হয়েছে। শিশু, কিশোর, স্বল্পশিক্ষিত বয়স্ক ব্যক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকের উপযোগী করে রবিনসন ক্রুসোর পরিবর্তন করেছেন সম্পাদকরা। তবু এর আকর্ষণ কমেনি। পৃথিবীর সকল দেশের সকল শ্রেণীর পাঠকের জন্য আছে 'রবিনসন ক্রুসো'। এই সর্বজনীন আবেদনের রহস্যটি কি?

এই রহস্যটি সংক্ষেপে সুন্দর করে বলেছেন ওয়াল্টার ডি লা মেয়ার: "It taxes no ordinary intelligence. There is nothing delicate, abstruse, subtle to master. It can be opened and read with ease and delight at any moment, and anywhere. Its thought is little but an emanation of Crusoe's seven senses and his five wits. Its sentiments are universal."

ডিকেন্স অভিযোগ করেছেন, 'রবিনসন ক্রুসো'তে এমন কিছু নেই যা পাঠককে হাসাতে অথবা কাঁদাতে পারে। নাই বা থাকল। হাসি-কান্নার বাইরে যে জীবন, সে জীবন আছে এই কাহিনীতে। গোর্কির মতে 'রবিনসন ক্রুসো' হলো "the Bible of the Unconquerable." রবিনসন ক্রুসো আদর্শ ইংরেজের প্রতিনিধি। তার দুঃসাহসিক অভিযানপ্রিয়তা, সমুদ্রের প্রতি গভীর আকর্ষণ, কর্মক্ষমতা এবং ধর্মবোধ স্বভাবতঃই ইংরেজ পাঠককে আকৃষ্ট করেছিল। তাছাড়া সকল মানুষের নিকটই রবিনসন ক্রুসোর কাহিনী তার নিজেরই ইতিহাস। আমাদের পূর্বপুরুষরা কেমন করে একে একে সভ্যতার প্রাথমিক স্তরগুলি অতিক্রম করে এসেছে, তারই

ইতিহাস পাওয়া যায় এখানে।

ডিফোর নিজের জীবনের প্রসার ঘটেছে এই কাহিনীতে, তাই এত প্রাণবন্ত। ষাট বছর বয়সে ডিফো দেখলেন তাঁর জীবনের সকল অভিলাষ ব্যর্থ হয়েছে; তিনি নিঃসঙ্গ; বড় ছেলে তাঁকে পথে বসিয়েছে, পাওনাদারদের এড়াবার জন্য পরিবার থেকে দূরে একা থাকতে হয়। সুতরাং পরিচিত জগৎ ও পরিবেশ থেকে বহু দূরে কল্পনায় নিজের এক পৃথিবী গড়ে তুললেন, সেখানে তিনি সার্থক হয়েছেন, বাস্তব জীবনের বিফলতার মধ্যে এইটুকু তাঁর সান্ত্বনা। সেই নির্জন দ্বীপে হুইগ বা টোরি নেই, পাওনাদার নেই, আছে গভীর প্রশান্তি। কল্পনায় নিজেকে সেই জগতের সঙ্গে একাত্ম করতে না পারলে লেখক এমন আশ্চর্য ব্যক্তিগত স্টাইল প্রয়োগ করতে পারতেন না; পড়তে পড়তে কোথাও মনে হয় না কাল্পনিক কাহিনী। যেন নায়ক নিজেই তার কথা বলছে। সরল বেগবান ভাষা সরাসরি পাঠককে স্পর্শ করে। সাহিত্যের ভাষাকে গণতন্ত্রীকরণের এই প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা। আর 'রবিনসন ক্রুসো'ই প্রথম উপন্যাস যা এক বৃহৎ পাঠকগোষ্ঠী গড়ে তুলতে পেরেছিল।

রবিনসন ক্রুসো উপন্যাসটি নিঃসঙ্গ দ্বীপে এক পুরুষের বাঁচবার জন্য সংগ্রামের কাহিনী; 'মল ফ্ল্যাণ্ডার্স' জনাকীর্ণ সংসারে এক নারীর বেঁচে থাকবার প্রাণান্তকর প্রয়াসের কাহিনী। অপরূপ সুন্দরী নায়িকা বারো বছর বেশ্যাবৃত্তি করেছে, পাঁচ বছর ছিল গৃহিণী; বারো বছর করেছে চৌর্যবৃত্তি; তারপর নির্বাসন দণ্ড ভোগ করেছে আট বছর ভার্জিনিয়ায়। কিন্তু শেষ বয়সে সৎ জীবনযাপন করেছে সচ্ছল অবস্থায়।

পরিচিত পরিবেশের পটভূমিকায় এমন বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চার এর পূর্বে ইংরেজ পাঠক পায়নি। কাহিনীর অন্তর্গত বিভিন্ন ঘটনাগুলি দৃঢ়সংবদ্ধ নয়, সেদিক থেকে উপন্যাস হিসাবে ত্রুটি আছে। কিন্তু লেখকের হাতে ছোট-বড় চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'রবিনসন ক্রুসোর' তুলনায় এখানে উপন্যাসের লক্ষণগুলি অনেক বেশী পরিস্ফুট।

'এ জার্নাল অব দি প্লেগ ইয়ার'-এ ডিফোর রচনাশৈলীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিয়েছিল। ডিফোর বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর। যে আতঙ্কে সমগ্র লণ্ডন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল, ডিফোর তা উপলব্ধি করবার বয়স হয়নি। কিন্তু ডিফো এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মহামারীর বিবরণ দিয়েছেন, মৃত্যুর এবং অন্যান্য বিষয়ের এমন সংখ্যাতত্ত্ব উদ্ধৃত করেছেন যে পাঠকের নিশ্চিত বিশ্বাস হবে যে, লেখক নিজে লণ্ডনের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বুঝি সব দেখেছেন। বইয়ে লেখকের নাম না থাকায় একে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসাবে গ্রহণ করতে কারো দ্বিধা হয়নি। ডিফোর বই প্রকাশিত হবার পর সরকারী দপ্তরের কর্তারাও পরিবেশিত তথ্য ঐতিহাসিক এবং নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকার করেছেন। আলবেয়ার কামু তাঁর উপন্যাসে প্লেগের পরিবেশ সৃষ্টি করতে এ বইয়ের সহায়তা নিয়েছেন।

সাহিত্যের ইতিহাসে এ বইটি একটি ধাপ্পার দৃষ্টান্ত। অবশ্য ধাপ্পা প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে লেখকের দাবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিবরণ সবই তথ্যভিত্তিক। তথ্য সংগ্রহ এবং বিন্যাসে ডিফো অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্লেগ মহামারী প্রত্যক্ষ করেছিলেন স্যামুয়েল পেপিস। তিনি তাঁর ডায়েরিতে প্লেগ-আক্রান্ত মুমূর্ষু লণ্ডনের যে ছবি দিয়েছেন তার তুলনায় ডিফোর বর্ণনা অনেক বাস্তব মনে হয়।

'রবিনসন ক্রুসো' এবং অন্যান্য বই ডিফোর জীবিতকালেই জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু বই বিক্রির টাকা ডিফো পাননি। পাওনাদাররা নিয়ে যেত। পরিবার থেকে দূরে দূরে পালিয়ে বেড়াতে হতো তাঁকে আত্মগোপন করে। সেই অবস্থাতেই লিখতেন; লিখেছেন প্রায় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। কিন্তু শান্তি ছিল না। সুখও ছিল না।

ডিফোর জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস জানা যায় না। তবু শেষ বয়সের বেদনার কথা তাঁর নিজের দু-একটি চিঠিপত্র থেকে জানা যায়। নিজের ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত তাঁর দুঃখের কারণ হয়েছিল। পাওনাদারদের

হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য যা-কিছু অর্থ ও সম্পত্তি ছিল সব রেখেছিলেন বড় ছেলে বেঞ্জামিনের নামে। এই ছেলে মা-বাবা এবং ভাই-বোনদের বঞ্চিত করে নিজে সব আত্মসাৎ করল। এক চিঠিতে ডিফো এই সম্বন্ধে দুঃখ করে বলেছেন: "It has been the injustice, unkindness, and I must say, inhuman dealings of my own son which has both ruined my family, and, in a word, broken my heart ;....I depended upon him, I trusted him, I gave up my two dear unprovided daughters into his hands ; but he has no compassion, and suffers them and their poor dying mother to beg their bread at his door···"

শুধু তাই নয়। বেঞ্জামিন পিতার বিরুদ্ধে কাগজেও লিখত।

এক হোটেলে ডিফো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেদিন ২৪শে এপ্রিল, ১৭৩১। আত্মীয়স্বজন কেউ নিকটে ছিল না। হোটেলের কেউ জানতো না তাঁর পরিচয়। ডিফো নয়, সেখানে তাঁর নাম ছিল ডুবৌ। কয়েক বছর আগে দেনার দায়ে যখন তাঁর নামে মামলা করা হয়েছিল তখন বিচারক তাঁকে চিহ্নিত করেছিলেন সুইণ্ডলার হিসাবে। প্রতারক। 'প্রতারক' ডিফো তারপর থেকে অসুস্থ দেহে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। বাড়িতে স্ত্রী অসুস্থ; তাঁকে দেখবার উপায় ছিল না। নিজের ঠিকানা দিয়ে একখানি চিঠি লেখাও সম্ভব ছিল না।

শুধু স্বপ্ন দেখতেন এমন এক-দ্বীপের, যেখানে পাওনাদার নেই, যেখানে নিজের খুশিমতো কাজ করবার অবাধ স্বাধীনতা, যেখানে নেই সভ্যতার মুখোশ-পরা মানুষের হানাহানি।

ডিফো আর নেই; কিন্তু সে স্বপ্ন তিনি রেখে গেছেন 'রবিনসন ক্রুসো'র লক্ষ লক্ষ পাঠকের মনে।

জোনাথান সুইফ্‌ট

১৬৬৭—১৭৪৫

হোটেলের অল্পবয়সী পরিচারিকাটিকে বেশ ভালো লাগল তাঁর। চটপটে, বুদ্ধিমতী। যাবার সময় তার হাতে কিছু টাকা দিয়ে বললেন, তোমার জন্য কোনো জিনিস কিনে নিও। কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ডের জিনিস হওয়া চাই, না হলে কিন্তু খুব রাগ করব। পরের বার এসে দেখব কি কিনেছ।

বেশ কিছুদিন পরে টেবিলে বসেই খোঁজ করলেন সেই পরিচারিকার, খবর পেয়ে সে ছুটে এলো।

—কই দেখি, কি কিনলে ?

আবার ছুটে বেরিয়ে গেল মেয়েটি। ফিরে এলো বইয়ের বোঝা অ্যাপ্রনে বেঁধে। একে একে টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখল। সবগুলির লেখক জোনাথান সুইফট।

—একি, এ যে বই !

হাসিমুখে মেয়েটি বলল, হ্যাঁ, বই। এ বইগুলির চেয়ে খাঁটি আইরিশ জিনিস আর কি আছে ?

সুইফ্‌টের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সমাজের সকল স্তরের লোকের কাছ থেকে সুইফ্‌ট এমনি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেয়েছেন। আবার উঁচুতলার অনেকের কাছ থেকে পেয়েছেন আঘাত ও ঘৃণা। সেই আঘাত ছিল এমন প্রচণ্ড ও মর্মান্তিক যে সুইফ্‌ট কিছুতেই তা ভুলতে পারেননি। মৃত্যুর পূর্বে এই বেদনাই তাঁর মন আচ্ছন্ন করে রেখেছে, জীবনে যত শ্রদ্ধা ও প্রীতি পেয়েছেন তা হয়ে পড়েছিল গৌণ। স্বরচিত এপিটাফে তিনি লিখেছেন যে, এখন তাঁর বাস এমন জায়গায় 'হোয়ার র‍্যাথফুল

ইনডিগনেশান ক্যান টিয়ার হিজ হার্ট নো ফারদার।' কবরে আশ্রয় নিয়েছেন, এখন আর ক্রুদ্ধ ঘৃণা তাঁর হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন করতে পারবে না।

সুইফ্‌টের সমগ্র জীবনটাই বৈপরীত্যের সমষ্টি। তাঁর অনেক কাজ ও আচরণের কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। একটি অযত্ন-রক্ষিত প্রাচীন পাণ্ডুলিপির মতো তাঁর জীবন। পাণ্ডুলিপির অনেক পাতা হারিয়ে গেলে যেমন বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা উপলব্ধি করা কঠিন হয়ে পড়ে তেমনি সুইফ্‌টের জীবনকাহিনীতে অনেক ফাঁক আছে যার জন্য তাঁকেও সম্পূর্ণরূপে জানা কঠিন। সুইফ্‌টের জীবনীকারদের মধ্যেও দুই দল। কেউ কেউ সহানুভূতিসম্পন্ন আবার অন্যরা তাঁর প্রতি বিরূপ। ইংরেজী সাহিত্যের এক রহস্যময় লেখক সুইফ্‌ট।

সুইফ্‌ট বলেছেন, জন্মের অব্যবহিত পর থেকে যে সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁর দিন কেটেছে তারই প্রভাব পড়েছে পরবর্তী জীবনে। ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর জোনাথান সুইফ্‌ট জন্মগ্রহণ করেন ডাবলিন শহরে। জন্মের পূর্বেই পিতাকে হারিয়েছেন। বয়স এক বছর পূর্ণ না হতেই ঘটল আর এক বিচিত্র ব্যাপার। যে ধাত্রী তাঁকে পালন করত তার বাড়ি ছিল ইংলণ্ডে। খবর এল তার এক আত্মীয় মৃত্যুশয্যায়। দেশে যেতে হবে, অথচ এই বাচ্চাকে এত ভালোবাসে যে ছেড়ে যেতে মন চায় না। একদিন কাউকে কিছু না বলে সুইফ্‌টকে নিয়ে ধাত্রী জাহাজে উঠে বসল। কয়েক মাস পরে মা খবর পেলেন তাঁর ছেলে ভালো আছে ধাত্রীর বাড়িতে। তিনি চিঠি লিখে দিলেন, এত অল্প সময়ের মধ্যে এতটুকু শিশুর আসা-যাওয়ার সমুদ্রযাত্রার ধকল সইবে না। সুতরাং একটু বড় হলে ওকে নিয়ে আসবে। এখন তোমার কাছেই থাক।

ধাত্রী যে সুইফ্‌টের শুধু খাওয়া-দাওয়ার যত্ন করেছে তা নয়। ঐ বয়সেই তাঁকে পড়াতে শুরু করেছিল। ডাবলিনে ফিরে আসবার পর দেখা গেল সুইফ্‌ট বানান করে পড়তে শিখেছেন। তিন বছর

বয়সেই বাইবেল পড়তে পারতেন।

ছ'বছর বয়সে তাঁকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হলো। আট বছর পরে, ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে, এসে ভর্তি হলেন বিখ্যাত ট্রিনিটি কলেজে। ছাত্র হিসাবে তিনি কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। কোনো কোনো বিষয়ে পরীক্ষায় ফেলও করতেন। তাছাড়া উদ্ধত- ব্যবহার এবং শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে তাঁকে সাজা দেওয়া হয়েছে অনেকবার এমন প্রমাণও পাওয়া যায়। এই কলেজ থেকে ডিগ্রি পরীক্ষা পাশ করে সুইফ্‌ট চলে আসেন ইংলণ্ডে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে।

সুইফ্‌টের পড়ার খরচ দিতেন তাঁর এক কাকা। টাকার পরিমাণ এত কম ছিল যে তাঁকে বেশ কষ্ট করে থাকতে হতো এবং এই কষ্টের দিনগুলির কথা কোনোদিনই তিনি ভোলেননি। বাবাকে তো দেখেনইনি। মা'র সঙ্গ পেয়েছেন খুব কম। কিছুদিন কাটল ধাত্রীর বাড়ি, তারপর ছাত্রজীবনে থাকতে হলো মা'র কাছ থেকে দূরে। ছুটির সময়ও সম্ভবত মা'র সঙ্গে দেখা হতো না। মনে হয় ছেলে স্কুলে ভর্তি হবার পর মা ইংলণ্ডে চলে গিয়েছিলেন। তাঁরও কোনো সম্বল ছিল না। ছেলের ভার কাকা নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর নিজের এবং এক মেয়ের জীবিকার পথ করে নিতে হবে।

সুইফ্‌ট তাই বলা যেতে পারে জন্মের পর থেকেই পিতামাতার স্নেহ পাননি, গৃহের পরিবেশ থেকেও তিনি ছিলেন বঞ্চিত। স্নেহময় পারিবারিক পরিবেশে মানুষ হতে পারেননি বলেই তাঁর জীবন থেকে অনিশ্চয়তার ভাব কখনো দূর হয়নি, আর হয়তো এই জন্যই তিনি মানব-বিদ্বেষী ব্যঙ্গ-সাহিত্যের লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

আয়র্ল্যাণ্ডে তখন স্বাধীনতার যুদ্ধ চলছে। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সসৈন্যে রাজা জেমস ডাবলিন আক্রমণ করবেন এমন আশঙ্কা দেখা দিলে ট্রিনিটি কলেজের ছাত্রদের দীর্ঘ ছুটি দিয়ে দেওয়া হলো। সুইফ্‌ট মা'র কাছে চলে এলেন লীচেস্টারশায়ারে। মা'র উপর বোঝা হয়ে বেশীদিন থাকা সম্ভব নয়, তাঁরই চলে না।

সুতরাং চাকরির চেষ্টা দেখতে হবে। মামাবাড়ির দিক থেকে দূর-সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল স্যার উইলিয়ম টেম্পল-এর সঙ্গে। টেম্পল ছিলেন ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক নেতা, লেখক এবং সাহিত্যরসিক। রাজদরবারেও ছিল তাঁর প্রভাব। টেম্পল সুইফ্‌টকে চাকরি দিলেন। তাঁর একান্ত সচিব। অন্যান্য কাজ ছাড়া তাঁর স্মৃতিকথা লিখতে সাহায্য করতে হবে। থাকা খাওয়া ছাড়া মাসিক বেতন কুড়ি টাকা। সুইফ্‌ট এ চাকরি গ্রহণ করলেন। কিন্তু মাত্র ছ' মাসের জন্য। ছ' মাস পরে টেম্পল-এর সুপারিশ নিয়ে আয়র্ল্যাণ্ডে ফিরে এলেন চাকরির উদ্দেশ্যে। আয়র্ল্যাণ্ডের অবস্থা তখন অনেকটা শান্ত।

কিন্তু আয়র্ল্যাণ্ডে বিশেষ সুবিধা হলো না। ইংলণ্ডে ফিরে কিছুদিন মা'র কাছে এবং কিছুদিন অক্সফোর্ডে থেকে আবার পুরনো চাকরি নিলেন টেম্পল-এর বাড়িতে। ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত থাকলেন এখানে। তারপর কর্তার সঙ্গে কোনো ব্যাপার নিয়ে মনোমালিন্য হওয়ায় ফিরে গেলেন আয়র্ল্যাণ্ডে। পরবৎসর জানুয়ারি মাসে পাদ্রির চাকরি পেলেন, মাইনে একশো টাকার মতো মাসে।

প্রথম চাকরি কিলরুটের গির্জায়। এখানকার নিঃসঙ্গ জীবনে তাঁর প্রধান আনন্দ ছিল জেন ওয়ারিং-এর সাহচর্য। প্রতিষ্ঠাপন্ন পরিবারের সতেরো বছরের মেয়ে। কেমন করে তাঁদের প্রথম আলাপ হয়েছিল এবং তা ক্রমে ভালোবাসায় পরিণত হয়েছিল তার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। সুইফ্‌ট জেনের নাম দিয়েছিলেন ভ্যারিনা। ভ্যারিনার কাছে লেখা তাঁর যে কটি চিঠি রক্ষা পেয়েছে তা থেকে দেখা যায় প্রেম তাঁর জীবনের সমগ্র সত্তাকে কেমন করে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ভ্যারিনার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছেন তিনি। নিজের আর্থিক সঙ্গতির কথা না ভেবেই বিয়ে করে ঘর বাঁধতে রাজী। কিন্তু তেমন সহজে রাজী হতে পারে না ভ্যারিনা। তার পরিবারের দিক থেকেও নানা বাধা আছে। ভ্যারিনা ধরা দেয় না। এমন কথাও বলে না, তোমার আশা নেই।

দিনের পর দিন শুধু উৎসুক অপেক্ষা। জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে।

ওদিকে টেম্পল-এর কাছ থেকে আবার আহ্বান এসেছে। এবার চাকরির শর্ত অনেক ভালো। ফিরে যাওয়াই স্থির করলেন সুইফ্‌ট। তৃষ্ণার জল সামনে অথচ পিপাসার্ত হয়েই থাকতে হবে অনির্দিষ্টকাল। দূরে গেলে এ যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। তাছাড়া নিজের উপরেও রাগ হলো। লেখাপড়া শিখে, এমন যুক্তিবাদী হয়ে এমনভাবে একটি মেয়ের কাছে যুক্তিহীন আত্মসমর্পণের জন্য নিজেকে বড় ছোট মনে হয়। প্রতিজ্ঞা করলেন, জীবনে যেন এমন ভুল আর না হয়। এ প্রতিজ্ঞা রেখেছিলেন তিনি। ভালোবেসেছিলেন, কিন্তু আত্মহারা হননি। ভ্যারিনার স্মৃতি তাঁকে রক্ষা করেছে।

এবার সুইফ্‌টকে বিশেষভাবে সম্মানিত করলেন টেম্পল তাঁর রচনাবলীর সম্পাদনা ও প্রকাশের দায়িত্ব দিয়ে। টেম্পলের বাড়িতে তাঁর শেষ পর্যায়ের চাকরির সময়টি বেশ আনন্দেই কেটেছে। ইংলণ্ডের অনেক খ্যাতিমান লেখক, রাজনীতিক এবং সমাজসেবীর আনাগোনা ছিল সে বাড়িতে। তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন সুইফ্‌ট। এমনকি টেম্পল-এর প্রতিনিধি হিসাবে তিনি রাজার সঙ্গে একান্তে দেখা করবার সুযোগ পেয়েছেন। কোনো কোনো বিষয়ে মতভেদ ঘটলেও টেম্পল-এর প্রতি সুইফ্‌টের ছিল সত্যিকার শ্রদ্ধা।

টেম্পল-এর বাড়িতে সুইফ্‌টের পরিচয় হয় ইসথার জনসনের সঙ্গে। সুইফ্‌ট আদর করে তাকে ডাকতেন স্টেলা বলে। স্টেলার অর্থ হলো 'তারা'। ইসথার সুইফটের জীবনের ধ্রুবতারা ছিল এবং স্টেলা নামেই ইংরেজী সাহিত্যে সে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সুইফ্‌ট যখন প্রথম এলেন টেম্পল-এর চাকরি নিয়ে তখন তাঁর বয়স বাইশ, স্টেলা আট বছরের মেয়ে। ঘন কালো চুল, ঘন কালো চোখ—যা সচরাচর ইংরেজ মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় না। টেম্পল-এর ভগ্নীর সহচরীর মেয়ে স্টেলা। ঐ বাড়িতেই থাকে। পরিবারের একজনের মতোই তার সমাদর। এই শান্ত আজ্ঞাবহ মেয়েটি সুইফ্‌টের

নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গে অজ্ঞাতেই জড়িয়ে গেল। সুইফ্‌ট তাকে পড়াতেন, বলতে গেলে তাঁর কাছেই স্টেলার প্রথম পাঠ শুরু।

শেষবার যখন টেম্পল-এর বাড়িতে এলেন সুইফ্‌ট, তখন স্টেলা পনেরো বছরের কিশোরী। ভ্যারিনার কাছ থেকে আঘাত পেয়ে এসেছেন, তাই স্টেলার উপরে বেশী করে দৃষ্টি পড়ল। সে যুগে পনেরো বছরের কিশোরীকে তরুণীর মর্যাদা দেওয়া যেত। স্টেলা কিছুই চায় না, চপলতা নেই তার মধ্যে, সুইফ্‌টকে সে দেখে গুরুর মতো। তাঁর সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, লেখা নকল করে দিতে ক্লান্তি নেই। স্টেলার হাতের লেখার ছাঁদ হুবহু সুইফ্‌টের মতো। কোন্‌টা যে কার লেখা তা চিনে নেওয়া কঠিন হতো। সুইফ্‌টের ছায়া হয়ে থাকাতেই তার আনন্দ। দু'জনের মধ্যে একটা অদৃশ্য অচ্ছেদ্য বন্ধন গড়ে উঠতে লাগল ধীরে ধীরে। চরিত্রগত পার্থক্য থাকলে আকর্ষণের তীব্রতায় জীবন উদ্বেল হয়ে ওঠে। সুইফ্‌ট আর স্টেলার মধ্যে তেমন সম্পর্কের সুযোগ ছিল না।

টেম্পল-এর বাড়ির আনন্দময় পরিবেশ বেশ কিছুদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকলে সম্পর্কটা কতদূর গড়াত বলা যায় না। ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে টেম্পল হঠাৎ পরলোকগমন করলেন। আবার সুইফ্‌ট ফিরে এলেন আয়র্ল্যাণ্ডে, পাদরির চাকরিই এখন ভরসা। তাই চুয়াল্লিশ পাউণ্ড ফীস দিয়ে নিলেন ডক্টর অব ডিভিনিটি ডিগ্রি। এখন থেকে আয়র্ল্যাণ্ডই হলো তাঁর দেশ; তার সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে ফেললেন নিজেকে। কিন্তু ইংলণ্ডকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁর লেখক ও রাজনৈতিক বন্ধুরা সব ইংলণ্ডে; এবং ইংলণ্ডের রাজনীতির ঢেউ লাগে আয়র্ল্যাণ্ডে। ইংলণ্ডে যদি সম্মানজনক কোনো জীবিকার পথ পেতেন তাহলে চলে যেতেন নিশ্চয়। কিন্তু সে সুযোগ পাননি। তবে বছরে অন্ততঃ একবার ইংলণ্ডে আসতেন। মাকে দেখতে, আর বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে। স্টেলা ডাবলিনে চলে এসেছে তাঁরই পরামর্শে। দেখা হবে কাছে থাকলে। হয়তো স্টেলার মনে আশা ছিল একদিন সুইফ্‌ট বিয়ের প্রস্তাব করবেন। কিন্তু

আর তেত্রিশে বিয়ে হওয়া কি এমন অসম্ভব? বিয়ের কথা সুইফ্‌টের মনে প্রথম থেকেই ছিল না। তাঁর মনে ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখবার আগ্রহ।

টেম্পল-এর মৃত্যুর পূর্বেই সুইফ্‌ট দু'টি পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে প্রকাশিত হয়নি। প্রথম সংস্করণে লেখকের নাম ছিল না। একটি বই 'দি টেল অব এ টাব'; অপরটি 'ব্যাটল অব দি বুকস'। 'টেল অব এ টাব' বিশ্ব-সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্রূপাত্মক রচনা। পিটার, মার্টিন ও জ্যাক—এই তিন ভাইয়ের কাহিনীর মধ্য দিয়ে সুইফ্‌ট রোমান ক্যাথলিক ও প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের দোষত্রুটিগুলির উপর কশাঘাত করেছেন এবং তাঁর নিজের চার্চ অব ইংলণ্ডের প্রশংসা করেছেন। শুধু ধর্মের কলহকে আঘাত করেই তিনি ক্ষান্ত হননি; সমকালীন জীবনের সকল ভণ্ডামিকে বিদ্রূপ করেছেন নির্মমভাবে। তখনকার দিনে চার্চের প্রভাব ছিল সর্বব্যাপী। সুতরাং এই স্যাটায়ারটি বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এক বছরে তিনটি সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে গেল।

এই সঙ্গে ছাপা হলো 'ব্যাট্‌ল অব দি বুকস'। লাইব্রেরির প্রাচীন ও নবীন গ্রন্থের মধ্যে লড়াই। প্রাচীনদের মধ্যে আছে হোমার, ভার্জিল, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের বই; নবীনদের মধ্যে মিলটন, হব্‌স ও দেকার্তের বই। গদ্যে মহাকাব্যের ঢঙে লেখা। যুদ্ধে কাউকে জয়ী করা হয়নি; তবে লেখকের সহানুভূতি স্পষ্টই প্রাচীনদের প্রতি, —কেননা তাঁদের আছে প্রকৃতির উপর শ্রদ্ধা।

এই দুটি বই প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সুইফ্‌ট ইংরেজী সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। বিখ্যাত কবি ড্রাইডেন তাঁর আত্মীয়। যখন তিনি ছাত্র তখন ড্রাইডেন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'তুমি কবি হতে পারবে না।' কবিতা তিনি লিখেছেন, হয়তো বড় কবি হিসাবে স্বীকৃতি পাননি। তাতে ক্ষতি কি? তাঁর মতো ক্ষুরধার গদ্যে এমন স্যাটায়ার কে লিখেছে? সাহিত্যে, রাজনীতিতে এবং

সমকালীন জীবনে এই সব স্যাটায়ারের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। কার্লাইল 'সার্টর রিসার্টাস' লেখার আইডিয়া পেয়েছেন 'টেল অব এ টাব' থেকে। ইংলণ্ডের রাজনীতিক নেতারা দেখলেন, এমন শক্তিশালী লেখককে তাঁদের কাজে লাগানো যেতে পারে।

সুইফ্‌ট নিজেও উপলব্ধি করলেন তাঁর কলমের ক্ষমতা। সমাজের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করবার সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র তাঁর কলম। পাম্‌ফলেটের পর পাম্‌ফলেট লিখে ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দেবেন, পর্যুদস্ত করবেন অত্যাচারীকে। ঐ শতকটা অবশ্য পাম্‌ফলেটেরই যুগ। অ্যাডিসন, স্টীল, পোপ প্রভৃতি কত লেখক পাম্‌ফলেট লিখতেন দল বা ব্যক্তিবিশেষকে সমর্থন করে। কত লেখক পামফলেট রচনাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সুইফ্‌ট টাকার জন্য পাম্‌ফলেট লেখেননি, লিখেছেন আদর্শের জন্য। একবার আর্ল অব অক্সফোর্ড তাঁর লেখায় খুশি হয়ে পঞ্চাশ পাউণ্ড হাতে গুঁজে দিয়েছিলেন। তৎক্ষণাৎ সুইফ্‌ট নোটগুলি ছুঁড়ে মারলেন আর্লের মুখে। যতদিন পর্যন্ত আর্ল বাড়িতে এসে ক্ষমা না চেয়েছেন ততদিন তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলেননি।

পামফ্‌লেট লিখে টাকা না নিলেও সুইফ্‌টের নিশ্চয় মনে মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল কোনো বড় পদ পাবার। অন্ততঃ বিশপ হবার। কিন্তু ডাবলিনের সেণ্ট প্যাট্রিক গির্জার ডীন পর্যন্ত হতে পেরেছিলেন, তার উপরে ওঠা সম্ভব হয়নি। 'টেল অব এ টাব' যেমন খ্যাতির দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে তেমনি রুদ্ধ করে দিয়েছে সাংসারিক উন্নতির সকল পথ। ধর্ম নিয়ে যে বিদ্রূপ করে তাকে অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ড উন্নতির পথে এগিয়ে দেবার কথা ভাবতে পারেনি।

তবু আশা পেয়েছিলেন হুইগ দলের কাছে। তাদের জন্য কাজ করে যখন দেখলেন কিছু হলো না তখন, ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে, যোগ দিলেন টোরিদের সঙ্গে। মন্ত্রিত্ব নিয়ে ওদের নিজেদের মধ্যে কলহ লেগেই ছিল। সুইফ্‌টের ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং ব্যক্তিত্ব সকলের নিকটই স্বীকৃতি পেয়েছিল। তাই তাঁর মধ্যস্থতায় ঝগড়া মিটত,

সাময়িকভাবে হলেও। এবং এই জন্য ১৭১০ থেকে ১৭১৩ পর্যন্ত তাঁকে প্রধানতঃ লণ্ডনে বাস করে টোরি মন্ত্রিসভা রক্ষা করতে হয়েছে। এই তিন বছর সুইফ্‌ট লণ্ডনবাসের সব কথা স্টেলাকে লিখেছেন। সেই চিঠিগুলি সংগ্রহ করে ছাপানো হয়েছে 'দি জার্নাল টু স্টেলা' নামে। এ বইটি সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবর্তের একটি অমূল্য দলিল। তাছাড়া এর মধ্যে সুইফ্‌টের চরিত্রের স্বাভাবিক মাধুর্য এবং রহস্যপ্রিয়তা যেমন ধরা পড়েছে তেমন আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

রানীর আশ্বাস, মন্ত্রীর ভরসা, বন্ধু-বান্ধবের সান্ত্বনা সবই যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো তখন সুইফ্‌ট ফিরে এলেন আয়র্ল্যাণ্ডে। টোরি দলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বলে আইরিশ জনসাধারণ প্রথম তাঁর প্রতি বিরূপতা দেখিয়েছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আয়র্ল্যাণ্ডের পক্ষ সমর্থন করে একের পর এক পাম্‌ফলেট ছড়াতে লাগলেন। তখন তাঁকে প্রকৃত বন্ধু হিসাবে চিনতে দেরী হলো না। প্রথমে তিনি লিখলেন ইংলণ্ডে তৈরি জিনিস বয়কট করতে; উদ্বুদ্ধ করলেন আয়র্ল্যাণ্ডে তৈরি জিনিস ব্যবহার করবার জন্য। ১৭২৪ সাল থেকে বেরুতে লাগল ইতিহাসবিখ্যাত 'দি ড্রেপিয়ার্স লেটার্স'। আয়র্ল্যাণ্ডে তামার মুদ্রার খুব অভাব ঘটায় রাজার কাছে প্রতিকারের জন্য আবেদন গেল। রাজা আয়র্ল্যাণ্ডের কম আবেদনেই সাড়া দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই আবেদন দ্রুত মঞ্জুর হয়ে গেল। উড নামে একজন লোহার ব্যাপারীকে এক লক্ষ আশি হাজার পাউণ্ডের তামার ছোট মুদ্রা তৈরি করবার কনট্রাক্‌ট দেওয়া হলো। উডের পূর্ববর্তী ইতিহাস সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। তাছাড়া গুজব ছড়িয়ে পড়ল, উড নাকি রাজা প্রথম জর্জের প্রণয়িনীকে দশ হাজার পাউণ্ড ঘুষ দিয়ে কনট্রাক্‌ট পেয়েছে। সব চেয়ে বড় কথা আইরিশ পার্লামেণ্টের সঙ্গে এ বিষয়ে কোনো আলোচনাই করা হয়নি। আইরিশ জাতিকে অপমান করা হয়েছে এমনি করে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়ে। সমগ্র জাতিকে খেপিয়ে তুললেন সুইফ্‌ট। চাষী থেকে লক্ষপতি সবাই একসূত্রে

গাঁথা হয়ে গেল। লেখকের নাম নেই, তাঁকে ধরবার জন্য সরকার পুরস্কার ঘোষণা করলেন; কিন্তু ফল হলো না। মুদ্রাকরকে ধরে জেলে রাখা হলো। জনতার ক্ষিপ্ততা দেখে সরকার চমকিত হলেন। কিছুদিন পরে ঘোষণা করা হলো, সরকার এই ব্যাপার নিয়ে আর অগ্রসর হবেন না। সুইফ্‌টের নাম যখন জানা গেল তখন তাঁকে বিশ্বজয়ী বীরের সম্মান দিল দেশের লোক। পথের দু'পাশের দেওয়ালে তাঁর ছবিসহ প্রাচীরপত্র, পার্কে মর্মরমূর্তি, সভায় গৃহকোণে তাঁকে নিয়েই আলোচনা। রাস্তায় তাঁকে দেখতে পেলেই ওঠে চারদিক থেকে জয়ধ্বনি। সুইফ্‌ট ভুললেন না। দু'দিন আগে এরাই বিরূপ ছিল। জনতার পূজায় বিশ্বাস নেই। আজ যাকে পূজার বেদীতে বসিয়েছে কাল তাকে ফেলে দেবে আস্তাকুঁড়ে।

কিন্তু তাই বলে সুইফ্‌ট থামেননি। আয়র্ল্যাণ্ডের দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য এবং শোষণের বিরুদ্ধে আবার তিনি লিখেছেন। তাঁর 'এ মডেস্ট প্রপোজাল' (১৭২৯) প্রথম শ্রেণীর স্যাটায়ারের একটি সুন্দর নিদর্শন; কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রথমেই উঠবে বর্বরতার অভিযোগ। আয়র্ল্যাণ্ডের দারিদ্র্য এমন তীব্র যে, সন্তানদের খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব। এই সমস্যার সমাধান করবার জন্য সুইফ্‌ট একটি প্রস্তাব দিয়েছেন। ভয়ঙ্কর সেই প্রস্তাব। দরিদ্র পিতামাতা তাদের সন্তান এক বছর পর্যন্ত একটু যত্ন করে পালন করবে। তারপর কচি নধর নরশিশুদের বিক্রি করে দেওয়া হবে ধনীদের কাছে; এদের মাংস হবে ধনীদের উপাদেয় খাদ্য। দরিদ্র মা-বাবা দীর্ঘকাল ছেলেমেয়েদের মানুষ করার দায় থেকে মুক্তি পাবে, বরং তাদের হাতে টাকা আসবে। শিশুদের বিদেশে বিক্রি করে দিলে আয়র্ল্যাণ্ডে রোম্যান ক্যাথলিকের সংখ্যা কমবে। তাছাড়া দরিদ্র যুবক-যুবতী বিয়ে করবার প্রেরণা পাবে যখন দেখবে ছেলে বিক্রির ব্যবসাটা বেশ লাভজনক। অনুত্তেজিত ইস্পাতের মতো শীতল ভাষায় রচিত হয়েছে এই স্যাটায়ার। ইস্পাতের মতোই তার ধার। নিদারুণ কোনো কিছুকে আঘাত করতে হলে অধিকতর নিদারুণ হাতিয়ার

চাই। সুইফ্‌টের রীতি এই।

আয়র্ল্যাণ্ডের জন্য তিনি অনেক করেছেন, প্রতিদানের অপেক্ষা না রেখেই। কিন্তু সুযোগ পেলে বৃহত্তর মানবসমাজের সার্থক সেবা করতে পারতেন। তাঁর মতো প্রতিভাবান, কর্মঠ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ইংরেজ অষ্টাদশ শতকে আর কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। মেকলে তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন: যে কোনো বৃহৎ রাজত্বের ভিত্তিভূমি টলিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখেন সুইফ্‌ট, লক্ষ লক্ষ লোককে তিনি হাসাতে পারেন, খেপিয়ে তুলতে পারেন, ইংরেজী ভাষা যতদিন থাকবে ততদিন তাঁর স্মৃতি থাকবে অক্ষয় হয়ে।

'টাইমস' পত্রিকা মন্তব্য করেছেন: হার্লি (আর্ল অব অক্সফোর্ড) আমলে প্রকৃতপক্ষে সুইফ্‌ট শাসন করতেন। সুইফ্‌টই ছিলেন একাধারে গভর্নমেণ্ট, রানী, লর্ডস এবং কমন্‌স্। অনেক কাজ করবার ছিল, সবই করতেন সুইফ্‌ট।

কিন্তু ভাগ্য বিরূপ চাকরি ও অর্থোপার্জনের দিক থেকে। এত করেও, যোগ্যতার এমন পরিচয় দিয়েও, তাঁর কিছুই হলো না। অথচ তাঁর চেয়ে যাঁদের দান সকল দিক থেকেই সামান্য তাঁরা পুরস্কৃত হলেন। অ্যাডিসন, স্টীল, কন্‌গ্রীভ—তাঁরই বন্ধু—তাঁদের বড় বড় চাকরি দেওয়া হলো।

মানুষ আমাকে চায় না, চায় আমার প্রতিভা, বুদ্ধি, কর্মক্ষমতা। সব মিলিয়ে যে আমি, তাকে প্রয়োজন নেই। মনে মনে ভাবেন সুইফ্‌ট। বিদ্বেষ জাগে মানুষের বিরুদ্ধে। এই বিদ্বেষের প্রয়োজন ছিল। মোটা মাইনের চাকরি নিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে স্তাবক বেষ্টিত জীবনযাপন করলে আমরা 'গালিভার্স ট্র্যাভেলস' পেতাম কিনা সন্দেহ। এ বই তাঁকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ পেলেও তা পেতেন না তিনি।

১৭২৬ সালের ৮ই আগস্ট সুইফ্‌ট 'গালিভার্স ট্র্যাভেলস'-এর পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের কাছে পাঠালেন। নিজের নাম গোপন রাখবেন তাই চিঠিতে সই করলেন 'রিচার্ড সিম্পসন'। প্রকাশককে লিখলেন,

তিনি লেমুয়েল গালিভারের কাকা। গালিভার তার ভ্রমণবৃত্তান্তের পাণ্ডুলিপি কয়েক বছর আগে প্রকাশের জন্য দিয়েছিল। প্রকাশকের কাছ থেকে মিঃ সিম্পসন পাণ্ডুলিপির জন্য দুশো পাউণ্ড চাইলেন। কিন্তু বই যদি বিক্রি না হয়, তাহলে এই অগ্রিম টাকা তিনি ফেরৎ দেবেন। সে বছরেরই শেষের দিকে 'গালিভার্স ট্র্যাভেলস' প্রকাশিত হলো। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে গেল এক সপ্তাহের মধ্যেই।

গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত চার খণ্ডে সম্পূর্ণ। লেমুয়েল গালিভার ডাক্তার। জাহাজে চাকরি করে। একবার জাহাজডুবির পর ভাসতে ভাসতে এসে উঠল লিলিপুটদের দেশে। এখানকার লোক দু ফিটের বেশী উঁচু নয়। দ্বিতীয়বার গালিভার এসে পড়ল ব্রবডিং-নাগ-এ ; এখানকার অধিবাসীদের আকৃতি দৈত্যের মতো। তৃতীয় খণ্ডে গালিভার দিয়েছে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার বিচিত্র বিবরণ। ল্যাগাডো দ্বীপের বৈজ্ঞানিকরা যে সব অর্থহীন গবেষণা করছে তাদের মধ্যে একটি হলো শশা থেকে সূর্যরশ্মি পৃথকীকরণের চেষ্টা। চতুর্থ খণ্ডে আছে এমন এক দেশের কথা যেখানে বুদ্ধিমান ঘোড়াদের প্রাধান্য। ইয়াহু নামক এক অধঃপতিত ঘৃণ্য মানবজাতি ঘোড়াদের সেবা করে।

সন, তারিখ, ম্যাপ ইত্যাদি ব্যবহার করে এমনভাবে কাহিনীটি রচনা করা হয়েছে যে সত্য ঘটনা হিসাবে ট্র্যাভেলসকে গ্রহণ করতে সেদিন পাঠকদের দ্বিধা হয়নি। কল্পনার অভিনবত্বে তারা প্রাণ খুলে হেসেছে। কিন্তু বুদ্ধিমান পাঠকের অন্তরালবর্তী স্যাটায়ার বুঝতে কষ্ট হয়নি। মানুষের লোভ, ঘৃণা, নীচতা, ক্ষমতালিপ্সা সব কিছুকে তিনি নির্মমভাবে আঘাত করেছেন। সমগ্র মানবজাতিকে আক্রমণ করেছেন তিনি। চতুর্থ খণ্ডে মানুষের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণ সর্বাপেক্ষা তীব্র। ইয়াহুদের (অধঃপতিত মানবজাতি) অধিকাংশই ভিক্ষা, দস্যুতা, চুরি জুয়াচুরি, মেয়েমানুষের দালালি, মিথ্যাচার, স্তাবকতা ইত্যাদি দ্বারা জীবিকার্জন করে। বুদ্ধিবৃত্তিতে যারা লিলিপুটের মতো

ক্ষুদ্র তারা সুইফ্‌টের মতো বুদ্ধির দৈত্যদের বন্দী করে রেখেছে।

গালিভার একমাত্র সুস্থ মস্তিষ্কের পথিক, যাকে উন্মত্ত লোকদের দেশে ভ্রমণ করতে হয়েছে। যারা সংসারী লোক তারা এই সুস্থ মাথার লোকদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করে, তাদের কথা কেউ শোনে না। যদি শুনত তাহলে পৃথিবীর দুর্দশা দূর হতে পারত। সুইফট্‌ পোপকে লিখেছিলেন ঃ আমি এই সুস্থ মাথার লোকদের এক করবার চেষ্টা করি প্রায়ই। তাদের সংখ্যা আর কতো? এক পুরুষে তিন-চারজন হবে। এঁরা মিলতে পারলে সহজেই পৃথিবীকে ঠিক পথে চালনা করতে পারবেন।

এমনি একজন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক ছিলেন ভলতেয়ার। গালিভার্স ট্র্যাভেলস-এর অনুকরণে তিনি লিখেছিলেন 'মাইক্রোমেগার্স' (১৭৫২)। ইংলণ্ডে নির্বাসনের মেয়াদ পার হবার পর দেশে ফিরে সমাজ থেকে অবিচার, ঘৃণা ও দুর্নীতি দূর করবার জন্য তিনি কাজ করেছেন, এই আদর্শ সামনে রেখে লিখেছেন অক্লান্তভাবে।

'গালির্ভার্স ট্র্যাভেলস' নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যেতে পারে। কিশোর পাঠকের কাছে কাহিনীটাই প্রধান আকর্ষণ; ঐতিহাসিক এর মধ্যে খুঁজবেন সমকালীন ঘটনার রেফারেন্স; দার্শনিক আলোচনা করবেন এর ভাবসম্পদ নিয়ে; সমালোচক দেখবেন স্যাটায়ার হিসাবে এর সার্থকতা। সুইফ্‌টের নিজের উদ্দেশ্য ছিল 'টু ভেক্‌স দি ওয়ার্লড, নট টু ডাইভার্ট ইট।' কি আশ্চর্য, মানব-বিদ্বেষের এই নির্মম দলিলটি এখন শিশুসাহিত্যের ক্লাসিক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ক্ষুদ্রবুদ্ধি ক্ষুদ্রমনা রাজনীতিক এবং ধর্মীয় নেতাদের আঘাত হানবার জন্য যে লিলিপুটদের সৃষ্টি করেছিলেন, আজ তাদের বিবরণ পড়ে কিশোর-কিশোরীরা হাসে, মজা পায়। মানবজাতি এক মহৎ প্রতিশোধ নিয়েছে সুইফ্‌টের উপর।

কিন্তু সুইফ্‌টের মানব-প্রীতিই তাঁকে মানব-বিদ্বেষী করেছিল। ক্ষুদ্র স্বার্থ, মনের সঙ্কীর্ণতা, দুর্বলের 'উপর উৎপীড়ন দেখে দেখে মানুষের উপর তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। আয়র্ল্যাণ্ডের নিপীড়িত

জনসাধারণের সপক্ষে সংগ্রাম করে মানব-প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন তিনি।

সুইফট্ বলেছেন: 'আই হেইট অ্যাণ্ড ডিটেস্ট ছাট অ্যানিম্যাল কলড ম্যান, অল্‌দো আই হার্টিলি লাভ জন পিটার, টমাস অ্যাণ্ড সো ফোর্থ।' মানুষকে যে তিনি ভালোবাসতেন তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। একবার এক ভিক্ষুক রমণীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করায় সুইফ্‌ট তাঁর খানসামাকে তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত করে দিয়েছিলেন। যারা দরিদ্র, দুঃখী, অত্যাচারিত তাদের প্রতি সুইফ্‌টের আন্তরিক সহানুভূতির এমন পরিচয় অনেক আছে।

কিন্তু এ সব দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নেই। বাহ্যিক কঠোরতার অন্তরালে প্রীতির নির্ঝর না থাকলে দুটি নারী তাঁকে এমন করে ভালোবাসতে পারত না। স্টেলা আর ভ্যানেসা পাণিপ্রার্থীদের বিমুখ করেছে; আশা নেই জেনেও সুইফ্‌টের সঙ্গে নিজেদের জীবন জড়িয়ে রেখেছে।

ইসথার ভ্যানহোমরিগ-এর জন্ম ডাবলিনে, সম্পন্ন পরিবারের মেয়ে। বাবার মৃত্যু হয়েছে। মা ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেছেন লণ্ডনে। বোধহয় ১৭০৭ কি '০৮ খ্রীস্টাব্দে সেখানে এই পরিবারের সঙ্গে সুইফ্‌টের প্রথম পরিচয় হয়। ইসথারের সঙ্গে তাঁর কিছুদিনের মধ্যেই ভাব হয়ে গেল। বয়সে স্টেলার চেয়ে ছোট, কিন্তু মুখচোরা নয়। সে চাইতে জানে, দাবী করতে পারে। সুইফ্‌ট তাকেও মাঝে মাঝে পড়াতেন কিন্তু ইসথার কখনো স্টেলার মতো তাঁর ছায়ায় পর্যবসিত হয়নি। সুইফ্‌ট তার নাম রাখলেন ভ্যানেসা। ভ্যানেসার ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য তাঁকে আকৃষ্ট করত। জীবনের নানা ব্যর্থতার মধ্যে ভ্যানেসার ভালোবাসা তাঁকে সান্ত্বনা দিত। ভেবে স্বস্তি পেতেন যে তাঁর মূল্য একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। ভ্যারিনার মতো ভ্যানেসাও সুইফ্‌টকে আবেগে উদ্বেল করে তুলত। স্টেলার বন্ধুত্ব শান্ত, মধুর এবং লোভনীয়। কিন্তু ভ্যানেসা যেমন করে মনকে নাড়া দেয় স্টেলা তা পারে না।

পরিণত বয়সেও ভ্যানেসা যে সুইফ্‌টের উপর কত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল তার প্রমাণ ‘ক্যাডেনাস অ্যাণ্ড ভ্যানেসা’। সুইফ্‌ট তাঁদের দুজনের ভালোবাসার কাহিনী কাব্যে প্রকাশ করেছেন এই গ্রন্থে। এই কাব্য তিনি রচনা করেছিলেন শুধু ভ্যানেসার জন্য। কিন্তু ভ্যানেসা মৃত্যুর পূর্বে ট্রাস্টিদের ছাপবার জন্য বলে যায়। এই ব্যক্তিগত রচনা প্রকাশ করতে দেবার উদ্দেশ্য কি ছিল জানা যায় না। হয়তো সুইফ্‌টের সঙ্গে নিজের নাম চিরদিনের জন্য যুক্ত করে রাখবার আকাঙ্ক্ষায়।

ভ্যানেসাও এসেছে আয়র্ল্যাণ্ডে। তার মা ও ভাইরা সবাই ক্ষয়রোগে মারা গেছে। এক বোন এখন মৃত্যুশয্যায়। ভ্যানেসা তাকে নিয়ে আছে। সুইফ্‌টের সঙ্গ ও সহায়তা বিশেষ দরকার। ভ্যানেসা কিছুদিন পর পরই চিঠি লিখে আহ্বান করে। সুইফ্‌ট বেশী যেতে পারেন না। পাদরির চাকরি করেন, দুর্নাম একবার রটনা হয়ে গেলে আর রক্ষা নেই। স্টেলা থাকে তাঁরই এক বন্ধুর বাড়িতে। সুইফ্‌ট একা কখনো স্টেলার সঙ্গে দেখা করেননি। সকল জীবনীকারই তার সাক্ষ্য দেন। কিন্তু ভ্যানেসার সঙ্গে যখন দেখা করতে যেতেন, তখন এই সাবধানতা কখনো অবলম্বন করেননি।

তাহলে বিয়ে করলেন না কেন ভ্যানেসাকে? সে তো রাজী ছিল। না, ভ্যারিনা প্রত্যাখ্যান করবার পর বিয়ের কথা আর ভাবতে পারেন না। তাছাড়া বয়সের পার্থক্য তাঁদের মধ্যে কুড়ি। সেটাকে একটা বড় বাধা মনে করতেন সুইফ্‌ট। সবচেয়ে বড় কথা স্টেলাকে উপেক্ষা করে ভ্যানেসাকে বিয়ে করবার কথা কল্পনাও করা যায় না। কতদিন থেকে নীরবে অপেক্ষা করে আছে স্টেলা।

দুজনেরই পাণিপ্রার্থী ছিল। সুইফ্‌ট দুজনকেই পরামর্শ দিয়েছিলেন বিয়ে করবার। তারা শোনেনি। বিয়ে করে সংসারী হবার চেয়ে সুইফ্‌টের প্রণয়িনী হয়ে থাকা অনেক গৌরবের। ভিন্ন প্রকৃতির দুই নারী সুইফ্‌টের জীবন ভরে রেখেছে। এদের

দুজনকে যদি মিলিত করা যেত তাহলে সুইফ্‌ট পেতেন তাঁর মানসী প্রিয়ার অখণ্ড রূপ।

সুইফ্‌টকে কেন্দ্র করে স্টেলা ও ভ্যানেসা কাছাকাছি বাস করলেও তারা পরস্পরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল দীর্ঘকাল। তারপরে অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হলেও তাদের মধ্যে কোনোদিন সাক্ষাৎ হয়নি। ভ্যানেসার প্রতি সুইফ্‌টের আকর্ষণের কথা শুনেই হয়তো স্টেলা ঈর্ষার উপরে একটি কবিতা লিখেছিল।

কেউ কেউ বলেন, শেষপর্যন্ত নাকি সুইফ্‌ট গোপনে স্টেলাকে বিয়ে করেছিলেন—যদিও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই খবর যখন ভ্যানেসার কানে গিয়ে পৌঁছল, তখন সে সত্যতা নির্ধারণের জন্য চিঠি লিখল স্টেলাকে। স্টেলা সরাসরি কোনো জবাব না দিয়ে ভ্যানেসার চিঠিটি পাঠিয়ে দিল সুইফ্‌টকে। সুইফ্‌ট তো সেই চিঠি দেখে অগ্নিশর্মা। তক্ষুণি ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। বোন মারা গেছে, নিজের শরীরও ভালো নয়। শুয়ে ছিল। সুইফ্‌টকে যে মূর্তিতে ঘরে ঢুকতে দেখল, তাতে তার বুক কেঁপে উঠল। সুইফ্‌ট একটি কথাও বললেন না। ভ্যানেসার চিঠিটি টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। ভ্যানেসার বুঝতে বাকি রইলো না এই শেষ হলো তাঁদের সম্পর্ক।

এর পর থেকে ভ্যানেসার দেহ ভেঙে পড়ল। পারিবারিক রোগ যক্ষ্মা তাকেও ধরেছে। সুইফ্‌টের সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ায় অবনতি দ্রুত হলো। ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন ভ্যানেসার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে সে তার উইলের এগজিকিউটরদের বিশেষ করে নির্দেশ দিয়ে গেল যে 'ক্যাডেনাস অ্যাণ্ড ভ্যানেসা' এবং সুইফ্‌টের সঙ্গে যত চিঠি বিনিময় হয়েছে, সেগুলি যেন তাড়াতাড়ি প্রকাশ করা হয়। সুইফ্‌টের এক বন্ধু সংবাদ পেয়ে চিঠিগুলি ছাপানো বন্ধ করতে পেরেছিল। কিন্তু 'ক্যাডেনাস অ্যাণ্ড ভ্যানেসা'-র প্রকাশ বন্ধ করা যায়নি। শুধু এইটুকু প্রতিশোধ নিয়েছিল ভ্যানেসা।

মৃত্যুর সময় সুইফ্‌ট কাছে ছিলেন না বলে মনে হয়। ভ্যানেসার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি দূরে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আবার মৃত্যুর পরদিনই দীর্ঘ ভ্রমণে যাত্রা করেছিলেন। হয়তো আশঙ্কা ছিল, ভ্যানেসার মৃত্যুর পর তাঁদের দুজনকে নিয়ে নানা কথা উঠবে। কিন্তু দূরে গেলেও অনুশোচনা থেকে মুক্তি পাননি। তাঁকে ভালোবেসেছিল সেটাই ভ্যানেসার একমাত্র অপরাধ। আর সেই অপরাধে তিনি তাকে শাস্তি দিয়েছেন। অথচ শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ভ্যানেসা তাঁর উপরেই নির্ভর করেছে, ঈশ্বর কি বাইবেলের উপরে নয়! পাদ্রি যখন তাকে শেষ প্রার্থনা শোনাতে এলো, হাতে বাইবেল তুলে নিতে বলল, তখন ভ্যানেসা দৃঢ়কণ্ঠে বলল, এ সব কিছুই আমার চাই না। মৃত্যুর পরে তার হাতের মুঠিতে পাওয়া গিয়েছিল 'টেল অব এ টাবে'র একটি পাতা।

এক বছর পরে সুইফ্‌ট রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। তখন স্টেলা এসে তাঁর সেবা করেছে। আর সেই ক'দিনের সান্নিধ্যে তাঁদের সম্পর্ক নিবিড়তর হয়েছে। তবু স্টেলার দেহ মন দুই-ই ভেঙে পড়েছে তখন। শরীর শীর্ণ, কিছুই হজম হয় না; শুধু দুধ খেয়ে থাকতে হয়। 'ক্যাডেনাস অ্যাণ্ড ভ্যানেসা' বেরিয়ে গেছে; রাস্তায় ফিরিওয়ালারা হাঁক দিয়ে দিয়ে বিক্রি করে। ওদের সেই প্রত্যেকটি হাঁক স্টেলার বুকে এসে আঘাত করে। হয়তো স্টেলাকে খুশি করবার জন্যই ওকে লেখা ব্যক্তিগত কবিতাগুলি সুইফ্‌ট এই সময় ছাপিয়ে বের করলেন।

স্টেলা তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। সুইফ্‌টের চিঠি থেকে দেখা যায় তিনি এ দৃশ্য সহ্য করতে পারেন না, তাই স্টেলার কাছে বড় যান না। কোনো কোনো জীবনীকার লিখেছেন স্টেলা নাকি সুইফ্‌টকে অনুরোধ জানিয়েছিল মৃত্যুর পূর্বে তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেবার জন্য। কিন্তু সুইফ্‌ট সম্মত হননি। কারণ কেউ জানে না।

রবিবারের সন্ধ্যায় বন্ধুবান্ধব আসে সুইফ্‌টের বাড়িতে, খাওয়া-দাওয়া হয়, আড্ডা চলে অনেক রাত্রি পর্যন্ত। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ, ২৮শে

জানুয়ারি, রবিবার। সন্ধ্যা ছ'টায় একজন লোক এসে সুইফ্‌টের হাতে একটি চিরকুট দিল। কিছুক্ষণ আগে স্টেলা মারা গেছে। অতিথিরা কেউ কিছুই জানতে পারল না। আড্ডা চলল নিয়মিত। রাত এগারোটায় সবাই চলে যাবার পর সুইফ্‌ট নীরবে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর উঠে লিখতে বসলেন স্টেলার স্মৃতি। এত ধৈর্য এত ক্ষমা ও প্রেম এক সঙ্গে কেউ দেখেনি অন্য কোন নারীর মধ্যে।

দু'দিন পরে স্টেলার সমাধি। তাঁরই গির্জায়। কিন্তু তিনি সমাধির সময় উপস্থিত ছিলেন না। শরীর অসুস্থ। রাত্রিতে গির্জা আলোকিত করা হলো, পরলোকের পথনির্দেশের জন্য। শোবার ঘর থেকে সে আলো দেখা যায়, তাই রাতটা সুইফ্‌ট ভিতরের একটা ঘরে কাটালেন—যেখানে আলো চোখে আঘাত করবে না।

সুইফ্‌টের গির্জার জমিতেই স্টেলাকে কবর দেওয়া হলো। অথচ সেই কবর চিহ্নিত করবার সামান্য কোনো স্মৃতিফলকের ব্যবস্থাও তিনি করেননি। স্টেলা তাঁকে যত চিঠি লিখেছিল, তার একটিও পাওয়া যায় না। নিশ্চয়ই তিনি সেগুলি নষ্ট করেছেন। অথচ ভ্যানেসার চিঠি রেখে দিয়েছিলেন যত্ন করে। স্টেলার প্রতি কেন এই উপেক্ষা? হয়তো উপেক্ষা নয়, স্টেলার স্মৃতি তাঁরই একার সম্পত্তি, আর কাউকে ভাগ বসাতে দেবেন না। তাই পরবর্তী কালের জন্য স্টেলার স্মৃতিচিহ্ন রেখে যাননি।

অনেক বছর আগের কথা। পথ চলতে চলতে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে সুইফ্‌ট বিশ্রাম করছিলেন। তাঁর চোখ পড়ল উপর দিকে। গাছের মাথাটা মরে গেছে, অথচ নীচের ডালগুলি বেশ সজীব। বন্ধুদের তা দেখিয়ে বললেন, আমিও ঠিক এইভাবে মরব। প্রথম মাথা যাবে, তারপর—

ছেলেবেলা থেকেই মাথার অসুখ। মাথা ঘোরে, বমি হয়, কান ভোঁ ভোঁ করে, কখনো কখনো অজ্ঞান হয়ে যান। এক দুরারোগ্য ব্যাধি। রোগ বাসা বাঁধে নাক থেকে কান পর্যন্ত নালির মধ্যে। বাঁ কানটি অকর্মণ্য হয়ে গেছে। অথচ বাইরে থেকে রোগ বোঝা যায়

না। লম্বা-চওড়া সুগঠিত দেহ, কোঁকড়া চুল, গম্ভীর মুখ, নীলাভ চোখ। উঁচু গলায় কথা বলেন। পথ চলেন ব্যক্তিত্বের দ্যুতি ছড়িয়ে। জন্মের পর মা-বাবার স্নেহ পাননি, শিক্ষা লাভ করেছেন আত্মীয়ের করুণায়। বড় কোনো চাকরিও জোটেনি। অথচ ইংলণ্ডের রাজা-রানী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আলোচনার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ করেছেন; তিনি প্রধান-মন্ত্রীর পদে কাউকে বসিয়েছেন, কাউকে নামিয়েছেন; আর সমকালীন সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মারাত্মক রোগ সত্ত্বেও অসাধারণ মনের জোর সম্বল করে সুইফ্‌ট জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

কিন্তু এখন বয়স বাড়ছে, মনের জোর কমছে, শরীর দুর্বল হয়ে পড়ছে। মাথার যন্ত্রণা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, মেজাজ প্রায়ই তিরিক্ষি হয়ে ওঠে। যতদিন স্টেলা ছিল ততদিন সে সান্ত্বনা দিয়ে উগ্র মেজাজ মোলায়েম করে এনেছে। এখন স্টেলা নেই, কেউ নেই। মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। শান্ত হবার পর আশঙ্কা হয়, পাগল হয়ে যাব নাকি?

আয়র্ল্যাণ্ডের জন্য তাঁর সর্বশেষ কাজ সোনার মূল্য হ্রাসের বিরুদ্ধে। লিখিত আবেদন করলেন, সভায় বক্তৃতা দিলেন, তবু সোনার দাম কমিয়ে আইন পাস হয়ে গেল। তখন শেষ যেটুকু তাঁর হাতে ছিল সেটুকু করলেন। গির্জায় কালো পতাকা উঠল, শোক-সূচক ঘণ্টা বাজতে লাগল গির্জা থেকে।

ধীরে ধীরে সুইফ্‌ট তাঁর স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলছেন। কিছুই মনে থাকে না, লোক চিনতে পারেন না। একদিন টেবিল থেকে একটা বই নিয়ে একটু পড়ে বললেন, বাঃ, খুব ভালো বই; লেখকের প্রতিভা আছে।

কে একজন বলল, এ-বই তো আপনারই লেখা 'দি টেল অব এ টাব'। মনো হলো না বিশ্বাস করলেন।

আয়নার দিকে কখনো কখনো এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। ওই যে রুগ্ন শীর্ণ চেহারার শুভ্রকেশ লোকটি তার জন্য বুঝি দুঃখ হয়। চোখ

জলে ভরে যায়। সুইফ্‌ট জীবনে নাকি হেসেছেন মাত্র দু'বার, কিন্তু কেঁদেছেন অনেকবার সামান্য কারণে। আজ নিজের দুর্দশা দেখে কাঁদছেন, কিন্তু বুঝতে পারছেন না কার জন্য।

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে কর্তৃপক্ষ তাঁকে দায়িত্ব গ্রহণের অযোগ্য এবং অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষণা করলেন। উন্মাদ, চার-পাঁচজন লোক ধরে রাখতে পারে না। সারা দিন রাত পায়চারি করে বেড়ান। কখনো হয়তো সিঁড়ি দিয়ে ক্রমাগত উঠছেন আর নামছেন, শ্রান্তি নেই। কিন্তু সব উন্মাদনা থেমে গেল ১৯শে অক্টোবর, ১৭৪৫ বেলা তিনটেয়। তাঁর শেষ কথা: 'আই অ্যাম এ ফুল।'

সুইফ্‌টের নির্দেশ ছিল তিনদিন অপেক্ষা করবার। এই তিনদিন সমাজের সকল স্তরের অগণিত নরনারী তাঁদের শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছে। উইল অনুসারে তৃতীয় দিন দুপুর রাত্রিতে চুপি চুপি তাঁকে সমাধি দেওয়া হলো। কবর দেবার সময় দেখা গেল সুইফ্‌টের মাথায় একটি চুলও অবশিষ্ট নেই। স্মারক হিসাবে দর্শনার্থী জনতা একটি একটি করে চুল নিয়ে গেছে।

নিজেই স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ করবার বাণী লিখে গিয়েছিলেন। সে বাণীতে ঈশ্বরের কথা নেই, পরলোকের কথা নেই। বলেছেন, এই কবরে এসে তাঁর শান্তি, এখানে ঘৃণা ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কেউ তাঁর হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করতে পারবে না। হে পথিক, স্বাধীনতার সপক্ষে সুইফ্‌ট যে সংগ্রাম করেছেন শক্তি থাকলে তার অনুকরণ কোরো। এ তো পাদ্রির এপিটাফ নয়। যেন কোনো বীর যোদ্ধার শেষ চ্যালেঞ্জ।

তাঁর উইল পড়ে সবাই আরো বিস্মিত হলো। সুইফ্‌ট তাঁর জীবনের সঞ্চয় এগারো হাজার পাউণ্ড দিয়ে গেছেন ডাবলিনে একটি উন্মাদাশ্রম নির্মাণের জন্য।

সুইফ্‌টের অন্যান্য জিনিসপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল একগুচ্ছ নারীর কেশ। কার? স্টেলার না ভ্যানেসার? সুইফ্‌টের জীবনীকাররা এ বিষয়ে কিছু বলেননি।

স্যামুয়েল জনসন

১৭০৯—'৮৪

১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের ছোট্ট মফস্বল শহর লিচফিল্ডে স্যামুয়েল জনসনের জন্ম হয়। তাঁর বাবা মাইকেল জনসনের ঐ শহরেই একটি বইয়ের দোকান ছিল। আশেপাশের গ্রামেও হাটের দিন বইয়ের দোকান খুলতেন। এ ছাড়া পার্চমেণ্ট তৈরী করেও বিক্রি করতেন কিছু কিছু। স্থানীয় দু-চারজন লেখকের বইয়ের প্রকাশক হিসাবেও তাঁকে নাম দিতে হতো। মাইকেল শহরের সম্মানিত নাগরিক ছিলেন। কিন্তু ব্যবসায়ে তাঁর মন ছিল না। সফল ব্যবসায়ীর একনিষ্ঠতার অভাব ছিল তাঁর। একগুঁয়েমি আর খেয়ালিপনা নিয়ে আর যাই হোক ব্যবসা চলে না।

মা সারার স্বভাব ছিল উল্টো। একটু উঁচু ঘরের মেয়ে। বাবার বাড়িতে সচ্ছলতা দেখেছেন। স্বামীও ব্যবসা করে যথেষ্ট টাকা উপার্জন করুন, এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু মাইকেল স্ত্রীর সঙ্গে এ সম্পর্কে কোনো আলোচনা করতে চাইতেন না। দু'জনের মধ্যে মনের মিল ছিল সামান্য। মধ্যবয়সী দরিদ্র ও হতাশাপীড়িত মা-বাবার অসুখী জীবনের কথা স্যামুয়েলের প্রায়ই মনে পড়ত। এবং এই নিরানন্দ সংসারের ছায়া তাঁর জীবনকে চিরদিনের জন্য একটু ম্লান করে তুলেছিল।

জন্মের পরেই স্যামুয়েলকে এক স্তন্যদাত্রী ধাত্রীর বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিছুকাল পরে দেখা গেল স্যামুয়েলের চোখ দুটি অন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। আসল রোগ চোখের নয়। স্তন্যদাত্রীর স্তন্য পান করে তিনি গণ্ডমালা রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। সেইজন্য চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়েছে। বাড়ি এনে অনেক চিকিৎসা করা হলো।

একটি চোখ প্রায় গেছে বলা যেতে পারে। গণ্ডমালাকে তখন বলা হতো রাজব্যাধি। লোকের বিশ্বাস ছিল রাজা বা রানী যদি রোগীকে স্পর্শ করেন তাহলে রোগ ভালো হয়ে যায়। চিকিৎসায় যখন কিছু হলো না তখন তাঁকে লণ্ডন নিয়ে আসা হলো রানী অ্যানের আরোগ্যস্পর্শের জন্য। স্যামুয়েলের বয়স তখন বছর আড়াই। রানী সযত্নে শিশুকে কোলে বসিয়ে গলায় মাতুলি ঝুলিয়ে দিলেন। রানীর স্পর্শ বাঁ চোখটিকে রক্ষা করতে পারেনি। ওই চোখটিকে হারাতে হলো চিরদিনের জন্য।

পাঠশালায় পড়া শেষ করে সাত বছর বয়সে জনসন ভর্তি হলেন লিচফিল্ড গ্রামার স্কুলে। গণ্ডমালার আক্রমণে মুখের চেহারা বিকৃত; বাঁ চোখ অন্ধ, আর এক চোখের দৃষ্টিও প্রখর নয়; লম্বা হাড়-ওঠা বিশ্রী চেহারা। প্রথম প্রথম ক্লাশের ছেলেরা পিছু লাগত। কিন্তু জনসনের দেহে ছিল প্রচণ্ড শক্তি, প্রচণ্ড তাঁর ব্যক্তিত্ব, আর পড়ায় সকলকে অতিক্রম করে যাবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ক্লাশে নেতার স্থান অধিকার করলেন। সহপাঠীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠবার অবশ্য সুযোগ হয়নি। কেন না, চোখের জন্য ক্লাশের বাইরে ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলায় যোগ দিতে পারতেন না।

স্কুল-জীবনের শেষ দু' বছর তাঁর কেটেছে পেডমোরে, মামার বাড়ির দেশে। এখানেই তিনি প্রথম মার্জিত শিক্ষিত সমাজে মেলামেশার সুযোগ পান। আঠারো বছরের তরুণী ওলিভিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রথম প্রথম প্রেমের কবিতা লিখেছিলেন পেডমোরে। ওলিভিয়ার কাছ থেকে সাড়া না পেয়েও তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়নি, কারণ এই আকর্ষণ ছিল নেহাৎ ক্ষণস্থায়ী।

স্কুলের পড়া শেষ করে দু' বছর বাড়ি বসে থাকতে হলো। টাকার অভাবে আর পড়ানো সম্ভব ছিল না। মা-বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলে পৈতৃক ব্যবসায়ে লেগে পড়ুক। কিন্তু ব্যবসা জনসনের ভালো লাগত না। দোকানের নতুন পুরানো বইগুলি পড়তে ভালো লাগত

আর ভালো লাগত বই বাঁধাতে। ছু' বছর যে বই হাতের কাছে পেয়েছেন বিচার না করে পড়েছেন। এর ফলে তাঁর জ্ঞানের ভিত্তি প্রশস্ত ও দৃঢ় হল।

১৭২৮ সালে মা'র হাতে কিছু টাকা এল। এই টাকা দিয়ে ছেলেকে অক্সফোর্ডে পাঠানো হলো কলেজে পড়তে। প্রথম দিনই তিনি টিউটরকে বিস্মিত করে দিলেন অখ্যাত ল্যাটিন কবির কবিতা উদ্ধৃত করে। কলেজে পড়তে এসে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে থাকতে হয়েছে। সাহিত্য ও জ্ঞানের পুঁজি দিয়ে অর্থাভাবকে ঢাকতে চাইতেন। দারিদ্র্যের অভিমানে কখনো কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে মুখিয়ে উঠতেন না। একবার অধ্যাপককে নালিশের সুরে বললেন, 'যে বক্তৃতার মূল্য এক পেনিও নয় তা শুনতে ক্লাশে যাইনি বলে আমার জরিমানা করেছেন ছু' পেনি।'

জুতো ছিঁড়ে আঙুল বেরিয়ে পড়েছে। তাই নিয়েই জনসন যাতায়াত করেন। দেখে অনামা কোনো লোকের করুণা হলো। একদিন সকালে জনসন দেখেন তাঁর দরজার সামনে এক জোড়া নতুন জুতো। সে জুতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আঙুল বের করা জুতো পরেই ঘুরেছেন যতদিন না নিজে কিনতে পেরেছেন।

দারিদ্র্যের জন্য শেষ পর্যন্ত পড়া ছেড়ে দিতে হলো। ডিগ্রি না নিয়েই বাড়ি ফিরে আসেন। বাড়ির অবস্থাও ভালো নয়। ব্যবসা বন্ধ হবার উপক্রম। মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও পড়বার সুযোগ না পেয়ে হতাশায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। এর উপর বাবার কাছ থেকে পেয়েছেন বিষাদ রোগ। মানসিক ভারসাম্য যেন ভেঙে পড়ছে। জনসনের সর্বদা আশঙ্কা তিনি বুঝি পাগল হয়ে যাবেন। তাঁর ধর্মপিতা ডাক্তার সুইনফেনকে নিজের অবস্থা জানিয়ে লিখলেন, আমাকে রক্ষা করো।

পাগল হবার ভয় তাঁকে সারা জীবন তাড়া করেছে। এর জন্য তাঁর মনে কখনো শান্তি ছিল না। মনের অসুখের সঙ্গে যোগ হয়েছিল দেহের রোগ। বিশ বছর বয়স থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একদিনও

তাঁর দেহ রোগমুক্ত ছিল কি না সন্দেহ। দেহের অসুখই হয়তো মানসিক রোগ সৃষ্টি করেছিল।

১৭৩১ সালে বাবার মৃত্যু হলো। মা ছোট ভাই ন্যাথানিয়েলকে নিয়ে বইয়ের ব্যবসা দেখাশোনা আরম্ভ করলেন। স্পষ্টই বোঝা গেল বড় ছেলের উপর আস্থা নেই। ছোট ভাইকে মা বেশী ভালোবাসেন এই অভিমান জনসনের অনেক দিন থেকেই ছিল। এবার তা স্পষ্ট হলো। নিজের পথ নিজেকেই দেখে নিতে হবে। মা'র কাছ থেকে শ' আড়াই টাকা পাওয়া গেল। এইমাত্র মূলধন।

কিন্তু কোন্ পথ? বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেই। যদিও তাঁর মতো গভীর জ্ঞান ঐ বয়সের কোনো তরুণের কাছ থেকে আশা করা যায় না। ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর দখল অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। গ্রীক ভাষায় তাঁর জ্ঞানও বেশ ভালোই ছিল। ইংরেজী সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে জনসন প্রচুর বই পড়েছেন এবং আত্মস্থ করেছেন তাদের বিষয়বস্তু। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল আশ্চর্য প্রখর। বড় বড় বই একবার পড়েই সব কথা মনে রাখতে পারতেন।

কিন্তু তবু ডিগ্রির অভাবে ভালো কাজ পাওয়া গেল না। একমাত্র ভরসা নীচের ক্লাশের স্কুল-মাস্টারী। কিছুদিন তাই করতে হলো। এ কাজ তাঁর নিজের ভালো লাগত না, শিক্ষক হিসাবে তিনি সফলও হননি। সফলতার প্রধান অন্তরায় ছিলো তাঁর কুৎসিত চেহারা। গণ্ডমালার চিহ্ন তাঁর মুখমণ্ডল্ বিকৃত করেছে। ঢ্যাঙা হাড়-বের-করা শরীর। সর্বোপরি কথা বলবার সময় অদ্ভুত মুখভঙ্গি করতেন, হাত-পা নাড়তেন। ছেলেরা এসব দেখে কখনো হাসত, কখনো ভয়ে দূরে সরে যেত। কিন্তু জনসন শরীরের এই বিচিত্র ভঙ্গী ইচ্ছা করে করতেন না; এটা ছিল তাঁর রোগ।

সামান্য বেতন, মাস্টারী করতে মোটেই ভালো লাগে না। তবু বাঁচবার তাগিদে করতে হয়। এই কাজও কিন্তু সব সময় থাকে না। একবার যখন কাজ নেই তখন স্কুলের বন্ধু এডমাণ্ড হেক্টরের বাড়ি

বেড়াতে এলেন বার্মিংহামে। এখানে তাঁর জীবনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। বার্মিংহামের পুস্তক-ব্যবসায়ী টমাস ওয়ারেনের সঙ্গে পরিচয় হবার ফলে সাহিত্য-জগতে প্রবেশের সুযোগ পেলেন জনসন। ওয়ারেনের চেষ্টায় জনসনের কয়েকটি রচনা বার্মিংহাম জার্নালে ছাপা হলো। এরপর ওয়ারেন নিজেই ছাপল প্রথম বই-'ভয়েজ টু অ্যাবিসিনিয়া'। এ বই ফরাসী থেকে ফাদার লবোর রচনার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। এর জন্য প্রকাশকের কাছ থেকে দক্ষিণা পেয়েছিলেন পঁয়ষট্টি টাকা।

এইটুকু সাফল্যকে মূলধন করে জনসন সাহিত্য-সম্পর্কিত জীবিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়ালেন, সুবিধে হলো না। এদিকে বয়স পঁচিশ পার হয়ে গেল। বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দুই-ই অন্ধকার।

এখানেই আলাপ হলো পোর্টার পরিবারের সঙ্গে। মিঃ পোর্টার সম্পন্ন ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রী এলিজাবেথ তিনটি সন্তান নিয়ে মোটামুটি সচ্ছলভাবেই দিন কাটাচ্ছিলেন। স্বামীর কিছু সম্পত্তি পেয়েছেন এলিজাবেথ। জনসন বেড়াতে আসতেন মাঝে মাঝে। আর কোনো অনাত্মীয় পরিবারই বিরূপ চেহারা এবং বিরক্তিকর অঙ্গভঙ্গি উপেক্ষা করে জনসনকে এমন সাদর অভ্যর্থনা করেনি। সুতরাং গৃহকর্ত্রীর প্রতি জনসনের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে উঠল। এলিজাবেথও এমন একজন পণ্ডিত ব্যক্তির সাহচর্য পেয়ে খুশি হলেন। তিনি অনেককে বলতেন যে, জনসনের মতো বিচক্ষণ ব্যক্তি জীবনে দেখেননি।

জনসনের হৃদয় বুভুক্ষু। স্নেহপ্রেমের স্পর্শ পাননি। কোনো নারী তাঁকে ভালবাসতে পারে এ কথা ছিল কল্পনার অতীত। সুতরাং এলিজাবেথের সহৃদয় ব্যবহারে তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হলেন। পঁচিশ বছরের তরুণ ছেচল্লিশ বছরের প্রৌঢ়া রমণীর প্রেমে পড়লেন। এলিজাবেথ জনসনের ত্রুটি সম্বন্ধে যে অবহিত ছিলেন না তা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর পৌরুষ। এই পৌরুষের উপর নির্ভর করে বাকী জীবনটা নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখলেন তিনি।

এলিজাবেথ জানতেন তাঁর রূপ নেই, যৌবনও অনেকদিন চলে গেছে। সুতরাং আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আপোষ করেই চলতে হবে। আর জনসনও আশ্রয় পেলেন নারীহৃদয়ের এবং কিছুটা আর্থিক নিশ্চিন্ততার। এলিজাবেথের কোনো সম্বল না থাকলে নিশ্চয় এ বিয়ে হতো না। অবশ্য জনসন বরাবরই বলেছেন ভালোবেসেই বিয়ে করেছিলেন তিনি। বিয়ের জন্য পরে কখনো তিনি অনুতাপ করেননি বা এলিজাবেথের বিরুদ্ধে তাঁর কাছ থেকে কোনো অভিযোগও শোনা যায়নি।

বিয়ের পরে স্ত্রীর আর্থিক সাহায্যে জনসন একটি বোর্ডিং স্কুল খোলেন। এ স্কুল অর্থকরী হয়নি, সুতরাং বন্ধ করতে হয়েছিল অল্প কিছুকালের মধ্যেই। তবে এই স্কুলে ছাত্র হিসাবে জনসনের পরিচয় হয়েছিল পরবর্তীকালের বিখ্যাত অভিনেতা ডেভিড গ্যারিকের সঙ্গে।

এই স্কুল চালাবার সময়ই জনসন আরম্ভ করলেন তাঁর ট্র্যাজেডি 'আইরিন'। কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের পর এক সুন্দরী খ্রীষ্টান বন্দিনীর প্রেমে পড়েন দ্বিতীয় মহম্মদ। এই পুরনো কাহিনীই ছিল তাঁর নাট্যকাব্যের বিষয়বস্তু। ১৭৩৭ সালে 'আইরিন' সমাপ্ত হয়—কিন্তু বারো বছর এ নাটক ছাপানো সম্ভব হয়নি। গ্যারিক যখন নাটকটি অভিনয় করবার ব্যবস্থা করলেন তখনই প্রকাশক পাওয়া গেল। অভিনয় চলেছিল মাত্র নয় রাত্রি। অভিনয়ের রয়েলটি হিসাবে জনসন পেলেন দু' হাজার ছ'শ টাকা আর প্রকাশক দিল তেরো শ' টাকা। লেখা থেকে এত টাকা এই প্রথম পেলেন জনসন। 'আইরিনে'র সাহিত্যগুণ খুবই কম।

এর আগে জনসনের আরও দুটি বই বেরিয়েছিল। একটি 'লণ্ডন'—তিন শ' লাইনের কবিতা। বেনামিতে ছাপা হয়েছে। আর একটি 'দি ভ্যানিটি অব হিউম্যান উইশেস'। শেষের কাব্যগ্রন্থটি ইংরেজী সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। বহু কবি ও সমালোচক বেরুবার পর থেকেই এই কাব্যের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। এ যুগের কঠোর বিচারক টি. এস. এলিয়টও 'ভ্যানিটি অব হিউম্যান

উইশেনে'র কাব্যগুণ অস্বীকার করতে পারেননি।

'আইরিনে'র পাণ্ডুলিপি পকেটে করে জনসন লণ্ডনে এলেন ভাগ্য পরীক্ষা করতে। এবার থেকে স্থায়ী বাস লণ্ডনে। স্ত্রী এলিজাবেথও এসেছেন। 'আইরিনে'র প্রকাশক পাওয়া গেল না। কিন্তু সেই সূত্রে আলাপ হলো 'জেণ্টলম্যানস ম্যাগাজিনে'র সম্পাদক এডওয়ার্ড কেভ-এর সঙ্গে। কেভ ধূর্ত লোক। ইংরেজী ছাড়া চারটে ভাষা জানেন জনসন। লিখতে পারেন যে-কেনো বিষয়ে, অগাধ পাণ্ডিত্য, আর সবচেয়ে বড় কথা কাজ দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। সুতরাং সম্পাদকীয় দপ্তরে তাঁকে নিযুক্ত করলেন। বেতন খুবই কম। কিন্তু এ নিয়ে জনসন কোনোদিন অভিযোগ করেননি! বরং প্রয়োজনের দিনে সহায়তা পাওয়ায় কেভ-এর প্রতি চিরদিনই কৃতজ্ঞ ছিলেন।

'জেণ্টলম্যানস্ ম্যাগাজিনে' জনসন নানা বিষয়ের প্রবন্ধ ও জীবনী লিখতেন। যে কোনো বিষয়ে লেখার ক্ষমতার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ঐ সময় পার্লামেণ্টের ডিবেট কাগজে ছাপানো নিষিদ্ধ ছিল। অথচ পাঠকদের গভীর আগ্রহ ছিল পার্লামেণ্টে কি আলোচনা হয় তা জানবার। কেভ এর সুযোগ গ্রহণ করলেন। পার্লামেণ্টের দারোয়ানদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তিনি অধিবেশন চলবার সময় একজন লোক পাঠাতেন। তার কাজ ছিল কে বক্তৃতা করল, কি বিষয়ে বলল এবং সিদ্ধান্ত কি হলো এই সব মোটামুটি লিখে আনা। তারপর জনসন পার্লামেণ্টের বিবরণীর মতো করে বক্তৃতা লিখে দিতেন। এই বিবরণী ছাপা হতো এই ধরনের হেডিং দিয়ে: 'ডিবেটস্ ইন দি সিনেট অব ম্যাগনা লিলিপুটিয়া।' পার্লামেণ্টের মেম্বারদের নামগুলিও একটু অদল-বদল করে দেওয়া হতো। কিন্তু পাঠকরা ঠিকই বুঝতে পারত। পিট এবং অন্যান্য সভ্যের বক্তৃতা পড়ে যাঁরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন তাঁরা জানতেও পারতেন না যে এসব বক্তৃতা আসলে জনসনের লেখা। জনসন পার্লামেণ্টের ডিবেট লিখেছেন ১৭৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। জেণ্টলম্যান্স্ ম্যাগাজিনে চাকরি

করেছেন তিনি পাঁচ বছর,—১৭৩৯ থেকে ১৭৪৩।

১৭৪৬ সালের জুন মাসে কয়েকজন প্রকাশক জনসনকে অনুরোধ করল ইংরেজী ভাষার একটি আধুনিক অভিধান সংকলন করে দেবার জন্য। জনসন চুক্তিবদ্ধ হলেন। তিন বছর পরে পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ করে দিতে হবে। পারিশ্রমিক মোট প্রায় একুশ হাজার টাকা। সহকারীদের বেতন এবং অন্যান্য খরচা এই টাকা থেকে দিতে হবে। এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, তিন বছরে একা এত বড় কাজ করতে পারবেন? ফরাসী আকাদেমির চল্লিশজন সভ্য চল্লিশ বছরে ফরাসী অভিধান সংকলন করেছেন।

জনসন হেসে বললেন সে তো ফরাসীদের কথা! ইংরেজের কর্মক্ষমতার হিসাব আলাদা।

অবশ্য তিন বছরে শেষ হয়নি। নয় বছরে হয়েছিল; তবে এমন বৃহৎ কাজ একা এই সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা বিস্ময়ের কথা।

অভিধান সংকলনের সময় কোনো বড়লোকের পৃষ্ঠপোষকতা পেলে আর্থিক সুবিধা হবে বলে বন্ধুরা পরামর্শ দিল। আর্ল অব চেস্টারফিল্ড বিদ্যোৎসাহী এবং উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত। জনসন অভিধান সংকলনের একটি পরিকল্পনা ওঁকে পাঠালেন, কয়েকবার বাড়ি গিয়ে দেখাও করলেন কিন্তু আর্ল অব চেস্টারফিল্ড বিশেষ আগ্রহ দেখালেন না। তাঁর উপেক্ষায় জনসন অপমানিত বোধ করলেন। পৃষ্ঠপোষকতার আশা ত্যাগ করে নিজেই কাজে ডুবে গেলেন।

কাজের জায়গা হলো সস্তা ভাড়ার চিলেকোঠার ঘর। ছয়জন সহকারী, চারদিকেই বই ছড়ানো। জনসন বলেন আর সহকারী লিখে নেয়। উদাহরণ দেবার জন্য প্রতিষ্ঠিত লেখকদের বইয়ের বিশেষ বিশেষ লাইনগুলি জনসন দাগ দিয়ে দেন, সহকারীরা নকল করে। ইতিপূর্বে কয়েকটি ইংরেজী অভিধান প্রকাশিত হয়েছিল। নাথান বেইলির অভিধান থেকে জনসন কিছু সহায়তা পেয়েছেন।

অন্যগুলি ছিল শুধুই শব্দতালিকা।

জনসনের অভিধানেই সর্বপ্রথম ইংরেজী শব্দের বানান এবং প্রয়োগবিধি একটি সুনির্দিষ্ট রূপ পায়। প্রয়োগ দেখাবার জন্য তিনি উদাহরণ দিয়েছেন। শব্দের সমার্থক শব্দ দিয়েই তিনি দায়িত্ব শেষ করেননি। অর্থ ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। এই ব্যাখ্যার মধ্যে জনসনের ব্যক্তিত্ব ধরা পড়েছে। দু'খণ্ডের বৃহৎ আকারের অভিধানটিতে, সংকলন-কর্তার চিন্তা-ভাবনা ভালোলাগা মন্দলাগা সব ধরা পড়েছে। একালের আদর্শ অভিধান অব্জেক্টিভ; কিন্তু জনসনের অভিধান সাবজেক্টিভ। জনসনের কতকগুলি শব্দের অর্থ কৌতূহলোদ্দীপক। পেট্রিয়টিজমের অর্থ তিনি দিয়েছেন 'শয়তানের শেষ আশ্রয়'। স্কটল্যাণ্ডের লোকদের তিনি পছন্দ করতেন না। তাই 'ওট' (Oat) শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—ইংলণ্ডে এই শস্য ঘোড়ার আর স্কটল্যাণ্ডে মানুষের খাদ্য। একটি শব্দের অর্থের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের উপক্রম হয়েছিল। সেটি হলো 'এক্সাইজ'। জনসন অর্থ লিখলেন পণ্যের উপরে ধার্য ঘৃণিত কর; তবে এ কর আদালতের বিচারকরা ধার্য করেন না। যারা আবগারি কর গ্রহণ করে তাদের ভাড়াটে লোকেরা কর ধার্য করে। ইংলণ্ডের আবগারি বিভাগ এই সংজ্ঞা পড়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

অভিধান বেরুবার কিছুদিন আগে আর্ল অব চেস্টারফিল্ড জনসনের প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করে দু'টি প্রবন্ধ লেখেন। জনসন প্রবন্ধ দু'টি পড়ে অপমানিত বোধ করেন। এত দিন এত বাধা-বিঘ্নের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করে কাজ সমাপ্ত করবার পর তিনি আরম্ভ করেছেন পিঠ চাপড়াতে। প্রতিবাদে জনসন আর্ল অব চেস্টার-ফিল্ডকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা ইংরেজী সাহিত্যে চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তাঁর এই অভিযোগটি তো একালের সাহিত্য-পুরস্কার সম্বন্ধেও সত্য:

Is not a patron, my lord, one who looks with unconcern on a man struggling for life in the water,

and, when he has reached ground, encumbers him with help?

অভিধান প্রকাশিত হলো ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। ফেব্রুয়ারি মাসে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিত এম. এ. উপাধিতে ভূষিত করেন। কুড়ি বছর পরে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেয়েছিলেন ডক্টর অব ল উপাধি।

জনসনের রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দি র‍্যাম্বলার' (১৭৫০-'৫২) ও 'দি আইড্‌লার' (১৭৫৮-'৬০)-এর নিবন্ধগুলি। শেক্সপীয়রের রচনাবলীর তিনি যে ভূমিকা লিখেছিলেন তার মূল্য আজও অক্ষুণ্ণ আছে। ইংরেজ কবিদের জীবনী ও কাব্য-সমালোচনা (১৭৭৯-'৮১) ইংরেজী সাহিত্যে ক্লাসিকসের মর্যাদা লাভ করেছে। জনসনের মা'র মৃত্যু হয় ১৭৫৯ সালে। শোনা যায় পারলৌকিক ক্রিয়ার ব্যয় বহনের জন্য দশ দিনের মধ্যে তিনি লিখেছিলেন 'রাসেলাস'। জনসন এই একটি কাহিনীমূলক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এখানে অবশ্য কাহিনীর চেয়ে দার্শনিক তত্ত্ব বড় হয়ে উঠেছে। আবিসিনিয়ার রাজকুমার রাসেলাস পর্বতঘেরা 'আনন্দ উপত্যকা'য় বাস করেন। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগ নেই। একদিন তিনি বোন নিকায়া এবং কবি-দার্শনিক ইমলাকের সঙ্গে 'আনন্দ উপত্যকা' থেকে বেরিয়ে এলেন জীবনের পথে। উদ্দেশ্য, সুখ কি তার সন্ধান করা। জীবনের সকল স্তরে এবং সকল মানুষের মধ্যেই দুঃখ আছে, নিরবচ্ছিন্ন সুখ কোথাও নেই, এই তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করে আবার তাঁরা ফিরে এলেন 'আনন্দ উপত্যকা'য়। কয়েক সপ্তাহ পরে প্রকাশিত ভলতেয়ারের 'কাঁদিদ'-এর সঙ্গে 'রাসেলাসে'র আশ্চর্য ভাবগত ঐক্য আছে। জনসন সবচেয়ে সরল ও সাবলীল ভাষা ব্যবহার করেছেন 'রাসেলাসে'। কয়েকটি য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদ 'রাসেলাসে'র জনপ্রিয়তার নিদর্শন।

এসব কৃতিত্ব সত্ত্বেও 'ডিক্সিওনারি অব দি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ'ই যে জনসনের খ্যাতির প্রধান কারণ তাতে সন্দেহ নেই। ইংরেজী

ভাষাকে অভিধানের মধ্যে যেভাবে তিনি নিয়মের শৃঙ্খলে বন্দী করেছেন তাতে তাঁর প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই জন্যই তিনি অতি সহজে সমকালীন সাহিত্যের ডিক্টেটর হতে পেরেছিলেন। এর সঙ্গে পীড়নের প্রশ্ন নেই, স্বেচ্ছা-স্বীকৃত নেতৃত্বের আসন পেয়েছিলেন লেখকদের কাছ থেকে। ডঃ জনসনের কথাই শেষ কথা। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, গভীর নীতিবোধ, অতুলনীয় পাণ্ডিত্য, সহজ বুদ্ধি এবং বিচারশক্তি স্বভাবতই তাঁকে নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এইসব গুণগুলিই অবিসংবাদী প্রতিষ্ঠার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। আন্তরিক মানবিকতার জন্য লোকে তাঁর প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হতো। নিজে দারিদ্র্য ভোগ করেছেন বলে দরিদ্রের প্রতি ছিল তাঁর গভীর মমতা। রাত্রিতে লণ্ডনের পথে পথে ঘুরে বেড়ানো ছিল তাঁর নেশা। এমন সময় গেছে যখন ঘর-ভাড়া দেবার সঙ্গতি ছিল না বলে পথে রাত কাটানো ছাড়া উপায় ছিল না। সে সময়কার লণ্ডনে ভিক্ষুকের অভাব ছিল না। পকেটে কিছু থাকলেই তিনি তাদের কিছু দিতেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও তখন পথে শুয়ে থাকত। জনসন তাদের হাতের মুঠোয় একটি পেনি গুঁজে দিয়ে চুপি চুপি চলে যেতেন। ভোরবেলা তারা কিছু কিনে খেতে পারবে। পতিতা নারী হয়তো প্রচণ্ড শীতে বিষণ্ণ মুখে পথে ঘোরাফেরা করছে। জনসন তাদের ডেকে দুঃখের কথা শুনতেন, পয়সা থাকলে দিতেন।

বন্ধুরা নিষেধ করতেন। বলতেন ওদের পয়সা দিয়ে কি হবে? তামাক কিংবা মদ কিনে খাবে।

জনসন বলতেন, খাক। জীবনের তেতো বড়ি সকলকেই গিলতে হয়। যারা বড়লোক তারা নানা উপকরণ দিয়ে তেতোকে ঢেকে রাখে। দু'-একটা পয়সা দিয়ে গরীবের জীবন থেকে তেতো স্বাদটা এক মুহূর্তের জন্যও যদি দূর করতে পারি, মন্দ কি?

যখনই সম্ভব হয়েছে রাস্তা থেকে দুঃস্থ নর-নারীকে নিজের বাড়ি নিয়ে এসেছেন। জীবনের শেষ ক'বছর তাঁর পরিবারভুক্ত ছিল

কয়েকজন নিঃস্ব নর-নারী। আর কেউ ছিল না।

জনসনের নৈতিক আদর্শ ছিল খুবই উঁচু। কিন্তু নীতিবোধ তাঁকে সংকীর্ণচেতা করেনি। চারিত্রিক ত্রুটিকেই তিনি বিচারের একমাত্র মাপকাঠি বলে মনে করতেন না। টপহাম ব্যক্লার্ক ছিলেন জনসনের ভক্ত, তিনিও তাঁকে স্নেহ করতেন। টপহামের যে অনেক চারিত্রিক দোষ ছিল সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন জনসন। তিনি সহৃদয়তার সঙ্গে বলতেন, তোমার দেহ পাপে পূর্ণ, কিন্তু হৃদয়ে গুণ ছাড়া কিছু নেই।

একটি চোখ তো জন্মের পরেই হারিয়েছেন, বয়স বাড়বার পর একটি কানও গেছে। ভীতিজনক চেহারা; পোশাক এলোমেলো, ময়লা। চলাফেরা, ভাবভঙ্গি, কথাবার্তা সবই অস্বাভাবিক ক'দিন হয়তো কিছুই খেলেন না, আবার যখন আরম্ভ করলেন খেতে তখন আর মাত্রা থাকত না। সারারাত বসে খেয়েছেন এমনও হয়েছে। খাবার সময় কিছু খাদ্য বা পানীয় মুখে যেত, আর বাকিটা বাইরে পড়ত। আর্ল অব চেস্টারফিল্ড জনসনের এই বদ অভ্যাসের দৃষ্টান্ত দিয়ে ছেলেকে সাবধান করেছিলেন।

লণ্ডনের রাজপথে সে সময়ে ফুটপাথ ছিল না। পথচারীদের চলবার জন্য রাস্তার একটা অংশ খুঁটি দিয়ে আলাদা করা থাকত। জনসন পথ চলবার সময় প্রত্যেকটি খুঁটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলতেন। এইটে ছিল তাঁর বাতিক। লোকে বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকত। কিন্তু বিদ্রূপ করতে সাহস পেত না। ভয় করত তাঁর বিরাট চেহারাকে। দেহে শক্তি ছিল প্রচণ্ড। একবার দুপুর রাত্রিতে নির্জন পথে চারজন গুণ্ডা একসঙ্গে তাঁকে আক্রমণ করল। তিনি একা চারজনকে ঠেকিয়ে রাখলেন যতক্ষণ না পুলিস এসে পড়ল। এক পুস্তক-বিক্রেতাকে নিজের অভিধানের মোটা একখণ্ড দিয়ে কয়েক ঘা মেরে দিয়েছিলেন। ছাত্র ও ভক্ত গ্যারিক স্টেজের উপর তাঁর জন্য একটি চেয়ার রেখেছিলেন। চেয়ারটা খালি দেখে বসে পড়লেন অন্য এক ভদ্রলোক। জনসন এসে বললেন উঠে যেতে, ভদ্রলোক উঠবেন

না। জনসন তখন চেয়ারসুদ্ধ ভদ্রলোককে তুলে স্টেজ থেকে নিচে ফেলে দিলেন। একদিন ওয়েটার চামচের বদলে নোংরা হাত দিয়ে জনসনের চায়ের কাপে চিনি দেওয়ায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে জানলা দিয়ে কাপ ছুঁড়ে ফেললেন আর ওয়েটারকেও ঠিক তেমনি করে ফেলতে যাচ্ছিলেন, কয়েকজন এসে তাঁকে শান্ত করায় সে যাত্রা ওয়েটার বেচারা বেঁচে গেল।

অভিধান বেরুবার তিন বছর আগে এলিজাবেথের মৃত্যু হলো। স্বামীর জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য তিনি দেখে যেতে পারেননি। জনসন একেবারে ভেঙে পড়লেন। সংসারে এবার তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ। নিঃসঙ্গতা মস্তিষ্কবিকৃতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে এই আশঙ্কায় জীবনে শান্তি রইলো না। জনসনের বয়স তখন মাত্র তেতাল্লিশ। মধ্যবয়সেই তাঁর পারিবারিক জীবন শেষ হয়ে গেল। হয়তো এই জন্যই তাঁর সকল রচনার মধ্যেই একটি বিষাদের সুর লক্ষ্য করা যায়। ড্রাইডেনের 'ঔরঙ্গজেব' থেকে এই লাইন ক'টি প্রায়ই তিনি আবৃত্তি করতেন:

When I consider life,
'tis all a cheat ;
Yet, fool'd with hope,
men favour the deceit ;
Trust on, and think
tomorrow will repay :
Tomorrow's falser than
the former day···

নিঃসঙ্গতা দূর করতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্লাবে আড্ডা দিয়ে। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী স্যার জস্থুয়া রেনল্ডসের সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন 'লিটারেরি ক্লাব'। সে যুগের বিখ্যাত লেখকেরা জনসনকে মধ্যমণি করে ক্লাবে মিলিত হতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বার্ক, গোল্ডস্মিথ, গ্যারিক, অ্যাডাম স্মিথ, বসওয়েল, বিশপ পার্সি, গিবন, শেরিডান

প্রভৃতি। দেহের বিরূপতা এবং আচার-ব্যবহারের ত্রুটি সত্ত্বেও উদারতা, গভীর মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে ক্লাবের বন্ধুদের হৃদয় জয় করেছিলেন জনসন। তাঁর রসিকতা, দীপ্ত প্রত্যুত্তর এবং উজ্জ্বল বাক্‌চাতুর্য সঙ্গীদের মুগ্ধ করে রাখত। অভিধান বেরুবার পরে এক ভদ্রমহিলা তাঁকে বললেন, আপনি অভিধান থেকে অশালীন শব্দগুলি বাদ দেওয়ায় খুব আনন্দলাভ করেছি।

জনসন উত্তর দিলেন, 'ও, আপনি বুঝি বই হাতে পেয়েই সেই শব্দগুলির খোঁজ করছিলেন।'

ভদ্রমহিলার মুখ রক্তিম হয়ে উঠল।

অভিধান বেরুবার পরও জনসনের অর্থাভাব দূর হয়নি। প্রকাশকরা চুক্তি অনুযায়ী যে টাকা দিয়েছিল বই শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। ১৭৫৫ সালে অভিধান বের হয়; তার পরের বছরই তিনি ঔপন্যাসিক রিচার্ডসনকে জরুরী চিঠি দিলেন: পাঁচ পাউণ্ড আঠারো শিলিং ঋণের দায়ে গ্রেফ্‌তার হয়েছি। রক্ষা করো।

রিচার্ডসন টাকা পাঠিয়ে তাঁকে মুক্ত করেছিলেন।

নিয়মিত কাজ করলে এমন দারিদ্র্য তাঁকে ভোগ করতে হতো না। যেমন খাবার বেলায়, তেমনি কাজের বেলায় সংযম ছিল না তাঁর; হয়তো কিছুদিন অবিশ্রাম কাজ করলেন, আবার একেবারে হাত-পা গুটিয়ে কচ্ছপের মতো বসে রইলেন। তখন আর তাঁকে দিয়ে কিছুই করানো যাবে না। অল্প-আয়াসে প্রচুর অর্থ উপার্জনের জন্য ভারতে পাড়ি দেবার কথাও মনে এসেছিল জনসনের।

১৭৬২ সালে সম্রাট তৃতীয় জর্জ জনসনের শুভানুধ্যায়ীদের প্রস্তাব অনুসারে তাঁকে বার্ষিক তিন শ' পাউণ্ডের পেনশন মঞ্জুর করলেন। পেনশন গ্রহণ করবেন কি না সেই নিয়ে সমস্যায় পড়লেন জনসন। কারণ তিনি নিজেই অভিধানে পেনশন শব্দের যে অর্থ দিয়েছেন তা মেনে নিলে আত্মসম্মানবোধ বজায় রেখে পেনশন নেওয়া চলে না। তাঁর সংজ্ঞা ছিল এই:

"প্রতিদান না দিয়ে যে ভাতা পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে পেনশনের অর্থ হলো দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্য গভর্নমেণ্টের ভাড়াটে কর্মীকে যে বেতন দেওয়া হয়।"

জনসন যখন আশ্বাস পেলেন যে, অতীতের সাহিত্য-সেবার জন্যই তাঁকে পেনশন দেওয়া হচ্ছে, এর মধ্যে সরকারের উদ্দেশ্যমূলক অভিসন্ধি নেই, তখনই তিনি পেনশন গ্রহণ করলেন। সে যুগের আর্থিক মান অনুসারে পেনশনের টাকায় তাঁর দিন স্বচ্ছন্দে কেটে যেতে পারত। কিন্তু তাঁর অভাব কোনোদিন ঘোচেনি। কারণ, পেনশন পাবার পর থেকে জনসনের দানের পরিমাণও আনুপাতিক হারে বেড়ে গিয়েছিল।

১৭৬৫ সালে—অভিধান বেরুবার দশ বছর পরে, থ্রেইল পরিবারের সঙ্গে জনসনের বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। অবস্থাপন্ন পরিবার, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অতিথিবৎসল। ডঃ জনসনের মতো খ্যাতনামা ব্যক্তিকে বন্ধু হিসাবে পেয়ে তাঁরা সম্মানিত। শ্রীমতী থ্রেইলের তখন বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। জনসনের বিষাদরোগ, পাগল হয়ে যাবার আশঙ্কা এবং নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে শ্রীমতী থ্রেইল দূর করতে চেষ্টা করতেন। আর ভালোবাসতেন জনসনকে নানারকম ভালো খাবার পেট ভরে খাওয়াতে। ভোজন-বিলাসী জনসনের কাছে প্রচুর সুখাদ্যের আকর্ষণ ছিল প্রবল। ধীরে ধীরে জনসন পরিবারেরই একজন হয়ে উঠলেন। থ্রেইলরা তাঁকে বেড়াতে নিয়ে যেত লণ্ডনের বিভিন্ন স্থানে, ইংলণ্ডে এবং ইংলণ্ডের বাইরেও। এই বাড়িতে তাঁর শেষজীবনের নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

কিন্তু দীর্ঘ ষোলো বছর পরে এই আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হতে হলো। মিঃ থ্রেইল পরলোকগমন করলেন ১৭৮১ সালের বসন্তকালে। কিছুকাল পর থেকেই গুঞ্জন শোনা গেল শ্রীমতী থ্রেইল ইতালিয়ান গায়ক পিয়োজ্জিকে বিয়ে করবেন। কথাটা জনসনের কানেও উঠল। তাই ডিসেম্বর মাসে তিনি শ্রীমতী থ্রেইলের কাছে আবেদন জানালেন:

আমাকে ত্যাগ করো না, উপেক্ষা করো না। আমার চেয়ে বেশী কেউ তোমাকে ভালোবাসবে না, সম্মান দেবে না···।

শ্রীমতী থ্রেইল তিয়াত্তর বছরের অক্ষম বৃদ্ধের এই আবেদনে সাড়া দিতে পারলেন না। বিদেশী গায়ক তাঁকে দেবে নতুন জীবন; জনসন তো মৃত্যুপথযাত্রী—নবজীবনের উন্মাদনা ত্যাগ করে সেবিকা হয়ে থাকতে হবে তাঁর সঙ্গে। শ্রীমতী থ্রেইল বেছে নিলেন জীবনের পথ, পিয়োজ্জিকে গ্রহণ করলেন।

জনসন হয়তো বিয়ের কথা ভাবেননি। তাঁর মনে হয়েছিল আগের মতো শ্রীমতী থ্রেইলের সামনে বসে গল্প করতে পারলে, তাঁর হাতের রান্না খেতে পারলে এবং রোগে ও দুঃখে একটু সহানুভূতির স্পর্শ পেলে জীবনের বাকি দিন ক'টা অব্যক্ত মাধুর্যে কেটে যাবে। বিদেশীকে বিয়ে করে নিজের সন্তানদের মঙ্গল উপেক্ষা করাতেও তিনি শ্রীমতী থ্রেইলের উপর চটেছিলেন। জীবনে তাঁকে ক্ষমা করতে পারেননি।

মৃত্যুর সপ্তাহ তিনেক আগে জনসনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি শ্রীমতী থ্রেইলের খবর পান কি না।

না, জনসন বেশ জোর দিয়ে বললেন। আমিও কোনো চিঠি লিখি না। মন থেকে দূর করে দিয়েছি ওর কথা। পুরনো চিঠি হাতে পড়লেই পুড়িয়ে ফেলি। আমি ওর কথা মুখে আনি না, শুনতেও চাই না তার কথা। শ্রীমতী থ্রেইলকে মন থেকে সম্পূর্ণ দূর করে দিয়েছি।

এত দৃঢ় ঘোষণা সত্ত্বেও স্পষ্টই বোঝা যায় যে, জনসন তাঁকে ভুলতে পারেননি।

১৭৮৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই জনসনের দেহ ভেঙে পড়ে। বাত, হাঁপানী, শোথ ইত্যাদি নানা রোগে জর্জরিত হয়ে পড়েন। তাঁর আশ্রিতদের মধ্যে অন্ধ আনা উইলিয়ামস এবং রবার্ট লেভেটের মৃত্যু হয়েছে। পুরনো সঙ্গীদের মধ্যে আছে নিগ্রো ভৃত্য ফ্র্যাঙ্ক। হাঁপানীর যন্ত্রণায় সারারাত চেয়ারে বসে কাটাতে হয়। নিঃসঙ্গতার

ভার তখন দুঃসহ বোধ হয়। ঐ বছর ১৩ই ডিসেম্বর তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃত্যু কিন্তু বেশ শান্তরূপেই এসেছিল।

জেমস বসওয়েলের নাম উল্লেখ না করলে জনসনের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বসওয়েল তাঁর লেখা জনসনের জীবনী সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, অতীতে এরকম জীবনী লেখা হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। আজ তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

টমাস ক্যাম্‌বেল

১৭৭৭—১৮৪৪

পলাশীর যুদ্ধের পর পঞ্চাশ বছরও পার হয়নি। ভারতের ব্রিটিশ-অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে তখনও অনুভূত হয়নি পরাধীনতার জ্বালা। সেই সময় একজন ইংরেজ কবি ভারতকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, ভয় নেই, ঈশ্বরের নির্দেশে দশম অবতার কল্কি এসে পরাধীনতার বন্ধন থেকে তোমাদের মুক্তি দেবে।

এই কবির নাম তাঁর স্বদেশবাসীদের কাছেই প্রায় হারিয়ে গেছে। আমাদের দেশে বিগত যুগের স্কুলের ছাত্ররা তাঁর দু-একটি কবিতা পড়েছে পাঠ্যপুস্তকে। এর বাইরে তাঁর অস্তিত্ব ছিল না।

ইনি টমাস ক্যাম্‌বেল। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই গ্লাসগো শহরে এঁর জন্ম। রবার্ট ব্রুসের সঙ্গে এঁরই এক পূর্বপুরুষ স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতার আন্দোলনে নেতৃত্ব করেছেন। পিতা আলেকজাণ্ডার ক্যাম্‌বেল সচ্ছল ব্যবসায়ী। তিনি চিরকুমার থাকবেন বলেই যখন সকলের ধারণা তখন, পঞ্চাশ বছর বয়সে, হঠাৎ বিয়ে করলেন। টমাসরা এগারোজন ভাইবোন। বৃদ্ধ বয়সে, এদের মানুষ করবার দায়িত্ব পড়ায় আলেক্‌জাণ্ডার বেশ কাবু হয়ে পড়লেন। তার উপর ব্যবসা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলো। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় গণ্ডগোল শুরু হওয়ায় চল্লিশ বছরের পারিবারিক ব্যবসা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। সে দেশেই ছিল তাঁদের ব্যবসা।

সুতরাং ক্যাম্‌বেলের ছেলেবেলা এবং প্রায় মধ্যজীবন পর্যন্ত আর্থিক দুর্গতির মধ্য দিয়ে কেটেছে। স্কুলে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শীর্ণ চেহারা, ছেঁড়া পোশাক ও ছেঁড়া জুতো দারিদ্র্যের সাক্ষ্য দিত। হয়তো সেইজন্য ছাত্র হিসাবে তিনি কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি।

ক্লাশের পড়ায় অবশ্য এমনিতেই তাঁর মন ছিল না। যা-কিছু পড়তেন, বাইরের বই। কিন্তু ইচ্ছে করলে সাত দিনের পড়া একদিনে শিখে ফেলতে পারতেন।

চৌদ্দ বছর বয়সে স্কুলের পড়া শেষ করে ক্যাম্‌বেল ভর্তি হলেন গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ে। অর্থের অভাবে আইন বা ডাক্তারি পড়া সম্ভব হলো না। কেরানী বা শিক্ষক হবার জন্য যে শিক্ষা দরকার তারই প্রস্তুতি চলল। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইংরেজী কবিতা লিখে পুরস্কার পেয়েছেন। হোমার, ভার্জিল, হোরেস প্রমুখ ক্লাসিক্যাল লেখকদের কবিতা আবৃত্তি ও অনুবাদ করে সকলের প্রশংসা পেয়েছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা ছাত্রজীবনেই তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। তিনি সহপাঠীদের সঙ্গে তর্ক করতেন, রেইন অব টেররও ভালো, রাজতন্ত্রের অত্যাচারের চেয়ে। কিন্তু তাই বলে তাঁর হৃদয় সহানুভূতিশূন্য ছিল না। ফ্রান্সের রানীর দুর্ভাগ্যের উপরে তিনি কবিতা লিখেছিলেন।

রাজনৈতিক কারণে যারা অত্যাচারিত তাদের প্রতি ক্যাম্‌বেলের আকর্ষণ কিশোর বয়স থেকেই। একটি ঘটনার প্রভাব হয়তো পড়েছিল তাঁর জীবনে। তখন ক্লাস ছুটি; ক্যাম্‌বেলের বয়স ষোলো। মা কবে তিন শিলিং দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ভয়ে ভয়ে চাইলেন। মা পাঁচ শিলিং দিলেন ছেলের করুণ মুখ দেখে। ক্যাম্‌বেল তো খুব খুশি। মা-বাবার অনুমতি নিয়ে এডিনবার্গ যাত্রা করলেন। বিয়াল্লিশ মাইল পথ, যাওয়া-আসার গাড়ি ভাড়া নেই। পায়ে হেঁটেই চললেন। এডিনবার্গ তখন মুঈর, জেরাল্ড ও পামারের বিচারকে কেন্দ্র করে বিক্ষুব্ধ। তারই আকর্ষণে চলেছেন এডিনবার্গে। রাজদ্রোহের অপরাধে এঁদের বিচার হবে। ক্যাম্‌বেল আদালতে উপস্থিত থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নির্ভীক দীপ্ত উত্তর শুনলেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁর মনে চিরদিনের জন্য গাঁথা হয়ে গেল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে বেরুবার পর সমস্যা দেখা দিল

জীবিকার্জনের পথ নির্বাচন নিয়ে। প্রথমে ট্যুশানি পেলেন। কিছুদিন করবার পর ভালো লাগল না। নিজের লেখা কবিতার পাণ্ডুলিপি নিয়ে এডিনবার্গের প্রকাশকদের দপ্তরে ঘোরাফেরা করেন। কেউ নিতে চায় না। তবে এক প্রকাশক তাঁকে একটি কাজ দিল। একটি বইয়ের সংক্ষিপ্তসার করে দেবার কাজ; পারিশ্রমিক কুড়ি পাউণ্ড। এই সূত্রে প্রকাশক মাণ্ডেলের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলো।

এর পরই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ The Pleasures of Hope-এর পাণ্ডুলিপি মাণ্ডেল ছাপতে রাজী হলো। কিন্তু তার জন্য লেখক নগদ কিছু পাবেন না। শুধু দু'শ কপি বই পাবেন আর তার বদলে লিখে দিতে হবে কপিরাইটের স্বত্ব। তাতেই রাজী। না হয়ে উপায় কি? নতুন লেখককে কেউ আমল দিতে চায় না।

'দি প্লেজার্স অব হোপ' প্রকাশিত হলো ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে। কবির বয়স তখন বাইশ। বেরুবার পরে বইটি যেরূপ সমাদর লাভ করল তা লেখক বা প্রকাশক কেউ কল্পনাও করতে পারেননি। পনেরো দিনের মধ্যে চারবার ছাপতে হয়েছিল। এর পর কবির জীবিতকালে বহু সংস্করণ হয়েছে। লেখক কপিরাইটের স্বত্ব ত্যাগ করলেও প্রকাশক স্বেচ্ছায় তাঁকে প্রতি সংস্করণের জন্য পঁচিশ পাউণ্ড করে দিত। একবার লেখককে একটি বিশেষ সংস্করণ ছাপবার অনুমতিও দিয়েছিল। কিন্তু কয়েক বছর পরে প্রকাশকের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় পঁচিশ পাউণ্ড করে দেওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই ২১০০ লাইনের কাব্যগ্রন্থের জন্য কবি পেয়েছিলেন মোট নয়শ' পাউণ্ড। তখনকার দিনের পক্ষে এই প্রাপ্তি লোভনীয় ছিল।

'প্লেজার্স অব হোপ'-এর সাফল্য ক্যাম্‌বেলের জীবনের পথ নির্দিষ্ট করে দিল। আমেরিকায় ভাইয়ের কাছে জীবিকার জন্য যাবার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু এখন স্থির করতে দেরী হলো না লেখাই হবে তাঁর জীবনের পেশা।

সংকল্প স্থির করে বেরুলেন য়ুরোপ ভ্রমণে। প্রথম গেলেন হামবুর্গ। তারপর একে একে হোহেনলিণ্ডেন, ড্রেসডেন, প্রাগ, মিউনিক, ভিয়েনা প্রভৃতি শহরে ঘুরলেন। অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধের ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ করে শিউরে উঠলেন তিনি। যুদ্ধ প্রসারের আশংকায় তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন দেশে। এই ভ্রমণের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে ইংরেজী সাহিত্যের অন্ততঃ দুটি প্রথম শ্রেণীর কবিতা লেখা হয়েছিল।

দেশে ফিরে লণ্ডনে বসবাস আরম্ভ করলেন ক্যাম্‌বেল। লেখাকে যখন পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন তখন এ ছাড়া উপায় ছিল না। প্রথম দিকে লর্ড মিণ্টো তাঁকে লেখকমহলে পরিচিত করিয়ে দিতে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মাটিলডা সিনক্লেয়ারকে বিয়ে করলেন, যদিও তাঁর আর্থিক অবস্থা তখনও খুবই খারাপ। বাবার মৃত্যু হয়েছে দু'বছর আগে। তিনি যে সামান্য পেনশন পেতেন একটা সওদাগরী আপিস থেকে, তা বন্ধ হয়ে গেল। অথচ মা এবং তিন বোনকে দেখতে হবে। এই দায়িত্ব সত্ত্বেও বিয়ে করে স্বীকার করতে হলো নতুন দায়িত্ব। মাটিলডাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না।

অর্থ উপার্জনের জন্য ক্যাম্‌বেল নানা রকম বাজে লেখার কাজ করতেন। তিনি দুঃখ করে এক চিঠিতে লিখেছেন যে, অর্থকরী লেখার জন্য সব সময় ব্যয় করতে হয়; সুতরাং অর্থচিন্তা "put all poetry, and even imaginative prose, out of the question."

যাই হোক, কয়েক বছর পরে তাঁর বন্ধু প্রধানমন্ত্রী ফক্সের চেষ্টায় টমাসকে সরকারী পেনশন মঞ্জুর করা হলো। পরিমাণ বছরে দু'শ পাউণ্ড। কিন্তু নানা পারিবারিক ঘটনার জন্য তিনি পেনশন পেয়েও শান্তি পাননি। মা মারা যান ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে। দুই ছেলে হয়েছিল। বড়টি পাগল, তাকে উন্মাদ আশ্রমে রাখতে হয়েছিল। মা-বাবার মৃত্যুর পরও জীবিত ছিল। দ্বিতীয় ছেলে অল্প বয়সে মারা যায়। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে হারালেন স্ত্রীকে। এত শোকে দুঃখে তাঁর পক্ষে

সাহিত্যসাধনায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

বিপ্লবের পর ফ্রান্সের অবস্থা দেখবার জন্য গিয়েছিলেন সে দেশে। সেখানে গিয়ে শুনলেন আলজিয়ার্সের কথা। ঠিক করেছিলেন ফ্রান্স থেকে যাবেন গ্রীসে; কিন্তু আলজিয়ার্সের বর্ণনা শুনে গ্রীস বাদ দিয়ে আলজিয়ার্সে যাওয়া স্থির করলেন। আলজিয়ার্স থেকে যেসব চিঠি লিখেছিলেন সেগুলি পরে সংকলন করে ছাপা হয়েছে 'লেটার্স ফ্রম দি সাউথ' নাম দিয়ে। সেখানকার লোকদের প্রতি তাঁর কৌতূহল এবং সহানুভূতি চিঠিগুলিতে সুপরিস্ফুট।

ক্যাম্‌বেল নানা ধরনের লেখার কাজ ছাড়া 'নিউ মান্থলি ম্যাগাজিন' সম্পাদনা করেছেন কয়েক বছর। এই কাজের জন্য তিনি পারিশ্রমিক পেতেন বছরে পাঁচশ' পাউণ্ড। বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই এই কাগজ বিদগ্ধ পাঠকমহলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এই কাগজেই তিনি সর্বপ্রথম লণ্ডনে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখেন। এবং এর পর থেকে এই বিষয়ে ক্রমাগত লিখেছেন এবং শিক্ষাবিদ্ ও সমাজসেবীদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৩৬) প্রতিষ্ঠার মূলে ক্যাম্‌বেলের যথেষ্ট দান রয়েছে।

ক্যাম্‌বেলের আর একটি প্রিয় বিষয় ছিল পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা। সেই ছোট দেশটির কতবার পার্টিশান হয়েছে সাম্রাজ্যলোভীদের চক্রান্তে। ক্যাম্‌বেল চেয়েছেন, পার্টিশন রদ হোক, আবার স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে দেশটি প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। এই উদ্দেশ্যে লেখা ছাড়া লণ্ডনে একটি পোলিশ অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করেছিলেন তিনি ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে।

সরকারী পেনশন পাবার পর থেকে ক্যাম্‌বেল নানা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সম্মান পেতে লাগলেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে রয়েল ইন্‌স্টিট্যুশনে কবিতার উপর কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত হলেন। ১৮২৬ সালে গ্ল্যাস্‌গো ইউনিভার্সিটি তাঁকে নির্বাচিত করে লর্ড রেক্টর হিসাবে। পর পর তিন বছর তিনি এই সম্মান লাভ করেন। স্যার ওয়াল্টার স্কটের নামও এই প্রসঙ্গে

উঠেছিল, কিন্তু নির্বাচিত হলেন ক্যাম্‌বেল।

আয়র্ল্যাণ্ডের প্রতি ক্যাম্‌বেলের ছিল আন্তরিক সহানুভূতি। আইরিশরা তাই তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তাদের দেশে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য। কিন্তু তাঁর যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই ক্যাম্‌বেলের শরীর ভেঙে পড়ে। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন তাঁর মৃত্যু হয় বুলোঞাতে। ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে দেহ সমাধিস্থ করা হয় ৩রা জুলাই। সমাধিক্ষেত্রে অন্যান্য-দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধান মন্ত্রী স্যার রবার্ট পীল, ডিসরেলি, মেকলে ও থ্যাকারে। আর ছিলেন একদল গণ্যমান্য পোলিশ নাগরিক। পোল্যাণ্ডের বীর বিপ্লবী কেসিউস্‌কের সমাধি থেকে আনা এক মুঠো ধুলো তাঁরা ছড়িয়ে দিলেন ক্যাম্‌বেলের কবরে।

খুব অল্পপরিমাণ মৌলিক রচনা ক্যাম্‌বেল লিখতে পেরেছিলেন। সেই তুলনায় সমসাময়িক সাহিত্যজগতে তাঁর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল অনেক বেশি। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা মাত্র চার। এদের মধ্যে 'দি প্লেজার্স অব হোপ' এবং 'গারট্রুড অব উইওমিঙ' সুপরিচিত। ক্যাম্‌বেলের পাণ্ডিত্য ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সম্পাদিত 'স্পেসিমেন্‌স্‌ অব দি ব্রিটিশ পোয়েট্‌স্‌' (১৮১৯) নামক বৃহৎ গ্রন্থে। নির্বাচিত কাব্যাংশ ছাড়া সম্পাদক যোগ করেছেন কবিদের জীবনী এবং তাঁদের রচনার সমালোচনা। ক্যাম্‌বেলের মতামত নিয়ে বেশ বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। বিশেষ করে পোপের সমালোচনা সম্পর্কে। বায়রন ক্যাম্‌বেলকে সমর্থন করেছিলেন।

এ ছাড়া তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো ট্র্যাজিক চরিত্রের বিখ্যাত অভিনেত্রী মিসেস সিডনস্‌-এর জীবনী (১৮৩৪)। মৃত্যুর পূর্বে সিডনস্‌ নাকি ক্যাম্‌বেলকে জীবনী লিখবার জন্য অনুরোধ করে গিয়েছিলেন।

ইংরেজী সাহিত্যে ক্যাম্‌বেলের নাম কয়েকটি কবিতার জন্য এখনও বেঁচে আছে। এদের মধ্যে **Gertrude of Wyoming, Hohenlinden, Lord Ullin's Daughter, The Battle of**

the Baltic, Ye Mariners of England, Ode to Winter, Freedom and Love প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে।

ক্যাম্‌বেলের কাব্যে ক্লাসিকাল রীতির প্রভাব সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। তিনি সাধারণ পাঠকের কবি, দার্শনিক তত্ত্ব দিয়ে কবিতার শ্বাসরুদ্ধ করবার অপচেষ্টা করেননি। তাঁর শব্দ ও চিত্রকল্পের সম্পদ ছিল সীমাবদ্ধ, কিন্তু তা দিয়েই তিনি পাঠকদের মন আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'Tis distance lends enchantment to the view; To bear is to conquer our fate প্রভৃতি ক্যাম্‌বেলের বহু উক্তি ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে, যদিও আজ রচয়িতার নাম কারো মনে নেই। ব্যালাড রচনায় ক্যাম্‌বেল অধিকতর কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। সমসাময়িক পাঠকদের মধ্যে জনপ্রিয়তার এটাই হয়তো প্রধান কারণ। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা মানুষের জন্য তাঁর গভীর সহানুভূতি এবং জীবনকে দেখবার স্বচ্ছ দৃষ্টি।

প্রথম শ্রেণীর কবি হবার জন্য যে-সব গুণ প্রয়োজন তার অনেক-গুলিই ক্যাম্‌বেলের ছিল। তাদের অনুশীলন করে নিজের রচনার উৎকর্ষ সাধনের উদ্যোগ ছিল না বলেই তিনি কবি হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি। রুগ্ন, শীর্ণ, ক্ষুদ্রকায় মানুষ ক্যাম্‌বেল; মেজাজ খিট্‌খিটে; একটুতেই চটে ওঠেন। একাগ্রতা নেই, সাধনা নেই, নেই দৃঢ়সংকল্প ও আত্মবিশ্বাস। সর্বদা অগোছালো; কাগজপত্র এলোমেলো। হয়তো নিমন্ত্রণ আছে এক বাড়িতে; তিনি গিয়ে উঠলেন ভিন্ন রাস্তার কোনো বাড়িতে। এক জায়গায় কমা বসবে কি বসবে না তার বিচার করতেই হয়তো দু'সপ্তাহ কেটে যেত, আর তার ফলে প্রেসের কাজ যেত বন্ধ হয়ে। তাঁর সম্পাদনায় কোনো কাগজ নিয়মিত বের করা অসম্ভব ছিল।

এই সব চারিত্রিক ত্রুটির জন্য ক্যামবেলের পক্ষে প্রথম শ্রেণীর কবি হওয়া সম্ভব হয়নি। তবু যে তিনি জীবিতকালে প্রচুর সম্মান লাভ করেছিলেন এবং তাঁর বন্ধুভাগ্য যে অনেকের পক্ষে ঈর্ষার কারণ

হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

ক্যাম্‌বেলের সৌভাগ্য যে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি খ্যাতি লাভ করেন। বলা যায় সেই খ্যাতির মূলধন ভাঙিয়েই তাঁর বাকি জীবন কেটেছে। এত খ্যাতি অর্জনের মতো সত্যিকার কোনো গুণ কি "দি প্লেজার্স অব হোপ"-এর ছিল? হয়তো ছিল না। কবিতার গুণ না থাকলেও সময়ের গুণ ছিল। তখন ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকান বিপ্লবের ঢেউ চারদিকে, পোল্যাণ্ডের পার্টিশন, নিগ্রো ক্রীতদাসদের উপর অত্যাচারের বিবরণ এবং ভারতে ইংরেজ শাসনের ক্রমবিকাশের আলোচনা ঘরে ঘরে বিতর্কের বিষয়। এই পরিবেশে অত্যাচারিতের প্রতি সহানুভূতি এবং একদিন যে স্বাধীনতা-কামীদের জয় হবে এই আশা পরিবেশন করলেন ক্যাম্‌বেল। পাঠকরা সেদিন এমনি একটি কাব্যগ্রন্থের জন্য যেন অজানিতেই অপেক্ষা করছিল। তাই কবি সাফল্যের শিরোপা পেলেন অবিলম্বে। অনুকূল বাতাবরণ না হলে এটা সম্ভব হতো না।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ক্যাম্‌বেল ব্যক্তির ও রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করে লিখেছেন। অত্যাচারিতের প্রতি সহানুভূতি এবং অত্যাচারীর প্রতি ঘৃণা তাঁর সমগ্র কাব্যসাহিত্যের প্রধান সুর। 'গারট্রুডে' তিনি বলেছেন যে, তাঁর কাছে "tree of life"-এর অর্থই হচ্ছে "fair Freedom's tree." 'দি প্লেজারস্‌ অব হোপ'-এ কবি সামরিক শক্তির দম্ভে পররাজ্য অধিকার করবার ভয়াবহ পরিণাম বর্ণনা করেছেন। যে-সব সাম্রাজ্যলিপ্সু রাষ্ট্র পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা হরণ করে তাকে খণ্ডিত করেছে তাদের ধিক্কার দিয়েছেন কঠোর ভাষায়। দাস-ব্যবসায়কে আক্রমণ করেছেন অমানুষিক প্রথা হিসাবে। 'লাইনস্‌ অন পোল্যাণ্ড'-এ তিনি ইংলণ্ডের কাপুরুষতার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন। পোল্যাণ্ডের উপর এমন বর্বর অত্যাচার চলছে তবু ইংলণ্ড প্রতিকারের জন্য সক্রিয়ভাবে কিছু করছে না:

With useless indignation sigh and frown,
But have not hearts to throw the gauntlet down.

জারের সাম্রাজ্যলিপ্সাকে কবি ধিক্কার দিয়েছেন :

To all that's hallowed, righteous, pure, and great,
Woe! Woe! When they are reached by Russia's
withering hate.

ক্যাম্‌বেলের কতগুলি ছোট ছোট কবিতায়, যেমন Lines on a Scene in Bavaria, Ode to the Germans, Song of the Greeks প্রভৃতিতেও স্বাধীনতার বন্দনা পাওয়া যায়। আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতার দাবী দমনের সমর্থন যারা করেছিল তাদের শোচনীয় পরিণতির কাল্পনিক ছবি কবি দিয়েছেন The Death Boat of Heligoland-এ।

স্বাধীনতার জন্য উন্মাদনা কাব্য হিসাবে সাধারণ রচনাকেও প্রাণবন্ত করেছে। পৃথিবীর যে কোনো দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছে ক্যাম্‌বেল তার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। তাই তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

Whilst Britons hold dominion of the sea,
Whilst they deserve the glory of their fame,
One Word shall nerve the weak and prompt
the free
'Tis Campbell's name!

মুসলমান রাজত্বের পর ভারতে য়ুরোপীয় রাজশক্তির প্রভুত্ব বিস্তারের বিরোধিতা করে ক্যাম্‌বেল লিখেছেন 'দি প্লেজার্স অব হোপ'-এ। তিনি শুধু প্রতিবাদ জানাননি; ভারতবাসীকে আশা দিয়েছেন আবার সে স্বাধীনতা ফিরে পাবে। 'দি প্লেজার্স অব হোপ' প্রকাশিত হয় ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। তার পরেও ভারত সম্বন্ধে ক্যাম্‌বেলের আগ্রহ অক্ষুণ্ণ ছিল। পার্লামেণ্টে এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসে ভারত সম্বন্ধে যত আলোচনা হতো সব তিনি অনুধাবন করতেন। বিশেষ করে তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল স্যার এলিজা ইম্পের ইম্পিচ্‌মেণ্ট। তিনি ১৮০২ সালের ২৭শে ডিসেম্বর লর্ড মিণ্টোকে

এক চিঠিতে লিখেছেন যে ভারতে গত পঞ্চাশ বছর যাবৎ ইতিহাসের দ্রুত পটপরিবর্তন ঘটছে। সেই কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাবলীর সংকলন করবার ইচ্ছা তাঁর। তিনি লর্ড মিণ্টোকে অনুরোধ করছেন: "You may easily suppose, my lord, that to obtain original information upon that part of the internal history of the country which relates to Sir Elijah Impey's impeachment, would be a great favour."

ক্যাম্‌বেল যখন 'নিউ মান্থলি ম্যাগাজিনে'র সম্পাদক, তখন ভারতে সংবাদপত্রের উপর পীড়নের সমালোচনা করে দি কলোনিয়েল প্রেস" নামে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে সাধারণভাবে এই মন্তব্য করা হয়েছে:

"The system of government in some of our colonies seems so oppressive, and so contrary to the spirit exhibited at home—the exercise of brief authority by the underlings, who are omnipotent there, is frequently so wanton and subversive of everything like sense or reason, that it cannot pass much longer without animadversion in Parliament."

আউগুস্ট শ্লেগেল-এর সঙ্গে ক্যাম্‌বেলের বন্ধুত্ব ছিল। শ্লেগেল একবার লণ্ডনে এসেছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরদের কাছে আবেদন জানাতে। কয়েকটি মূল্যবান সংস্কৃত গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেছেন। য়ুরোপে তখন সংস্কৃত বই ছাপানো খুবই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। তাই কোম্পানীর কাছে অর্থসাহায্য চাইতে এসেছিলেন। সাহায্যের পরিবর্তে ডিরেক্টর বোর্ড আশ্বাস দিলেন তাঁরা বারো কপি বই কিনতে পারেন। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি কোম্পানীর এই উপেক্ষা সম্বন্ধে শ্লেগেল ক্যাম্‌বেলের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। উপস্থিত একজন বললেন, সংস্কৃতি সম্বন্ধে ওঁদের মনোভাব এরকমই।

ওয়ারেন হেস্টিংস্ ভারত থেকে কোম্পানীর ডিরেক্টরদের দু'শ 'সোনার খাটিয়া পাঠিয়েছিলেন। কোম্পানীর ডিরেক্টররা এদের শিল্প হিসাবে না দেখে দেখলেন সোনা হিসাবে শুধু। খাটগুলিকে তৎক্ষণাৎ গলিয়ে সোনার বাট করে ফেলবার আদেশ দিলেন বোর্ড। টাকা ছাড়া কিছু জানেন না তাঁরা। ক্যাম্‌বেল সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, এসব তো প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা। এখন তেমন অবস্থা হয়তো নেই।

'দি প্লেজার্স অব হোপ'-এ ক্যাম্‌বেল পৃথিবীর নিপীড়িত জনসাধারণকে আশার কথা শুনিয়েছেন। পৃথিবীর মানুষদের ত্যাগ করে যখন সব দেবতারা চলে গেলেন তখন একমাত্র রইলেন আশা। দুঃখে সান্ত্বনা দেবেন আশা, বিপদে দেবেন ভরসা! এই আশার কথা বলে ক্যাম্‌বেল পোল্যাণ্ড, আফ্রিকা ও ভারতের জনসাধারণকে আশ্বাস দিয়েছেন। একদিন পরাধীনতার অভিশাপ দূর হবে, অত্যাচারী শাস্তি ভোগ করবে,—এবং সম্মুখে আছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ—এই আশ্বাসই দেবে বর্তমান দুর্যোগ অতিক্রম করবার শক্তি।

ক্যাম্‌বেল 'দি প্লেজার্স অব হোপ'-এ ভারত সম্বন্ধে লিখেছেন আশি লাইনের মতো। প্রথমেই আরম্ভ করেছেন সতীদাহের সঙ্গে স্বাধীনতা হারাবার তুলনা করে:

The widowed Indian, when her lord expires,
Mounts the dead pile, and braves the funeral fires!
So falls the heart at Thraldom's bitter sigh!
So Virtue dies the spouse of the Liberty!

ভারত প্রথমে ছিল মুসলিম শক্তির অধীনে:

How long your tribes have trembled, and obeyed!
How long was Timur's iron sceptre swayed!
Whose marshalled hosts, the lions of the plain,
From Scythia's northern mountains to the main,
Raged o'er your plundered shrines and altars bare,
With blazing torch and gory scymitar,

Stunned with the cries of death each gentle gale,
And bathed in blood the verdure of the vale!

এত অত্যাচার সত্ত্বেও ব্রহ্মার সন্তান ভারতবাসীদের ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি ঃ

Yet could no pangs the immortal spirit tame,
When Brama's children perished for his name;
The martyr smiled beneath avenging power,
And braved the tyrant in his torturing hour!

এর পরে ভারতে শুরু হলো য়ুরোপীয়ানদের অভিযান। মুসলমান আমলের অত্যাচারের রক্তচিহ্ন মুছে শান্তি আনতে পেরেছে কি তারা? না, তা পারেনি। স্বাধীনতার পূজারী ব্রিটেনই ভারত আক্রমণের পুরোভাগে রয়েছে।

Did Peace descend, to triumph and to save,
When free-born Britons crossed the Indian wave?
Ah, no! to more than Rome's Ambition true,
The Nurse of Freedom gave it not to you!
She the bold route of Europe's guilt began,
And in the march of nations, led the van!

ক্যাম্‌বেল অভিযোগ করেছেন, ব্রিটেনই নেতৃত্ব করেছে উন্মুক্ত করতে "route of Europe's guilt."

এর পর আরম্ভ হলো ভারতের সম্পদ লুণ্ঠন। য়ুরোপের কোষাগার ভরে উঠতে লাগল, আর এদিকে মর্মভেদী হাহাকারে ভরিয়ে তুলল ভারতের আকাশ বাতাস।

Could lock, with impious hands, their teeming store,
While famished nations died along the shore;
Could mock the groans of fellow-men, and bear
The curse of Kingdoms peopled with despair;

Could stamp disgrace on man's polluted name,
And barter, with their gold, eternal shame!

কিন্তু এ অত্যাচার তো চিরকাল চলতে পারে না! ব্রাহ্মণদের প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছেন ভগবান। পৃথিবীতে নয় বার তাঁর আবির্ভাব হয়েছে অবতাররূপে, অত্যাচারীকে দমনের জন্য। আবার তিনি আসবেন দশম অবতার হয়ে, ভারতকে রক্ষা করতে। আকাশ থেকে দৈববাণী হলো :

"To pour redress on India's injured realm,
The oppressor to dethrone, the proud to whelm;
To chase destruction from her plundered shore
With arts and arms that triumphed once before,
The tenth Avater comes! at Heaven's command
Shall Seriswattee wave her hallowed hand!
And Camdeo bright, and Ganesa sublime,
Shall bless with joy their own propitious clime!
Come, Heavenly Powers! primeval Peace restore!
Love! Mercy! Wisdom! rule for evermore!"

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, বায়রন এবং আরও অনেক ইংরেজ কবি যাঁরা নিজেদের স্বাধীনতার পূজারী হিসাবে প্রচার করতেন তাঁরা কেউ ভারত সম্বন্ধে এমন করে লেখেননি। একশ সাতাত্তর বছর আগে আমরাও স্বাধীনতার কথা এমন করে ভাবিনি, কিন্তু একজন তরুণ ব্রিটিশ কবি আমাদের হয়ে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে লিখেছেন। এর জন্য আমাদের তাঁর নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী এখনো অবশ্য পুরোপুরি সফল হয়নি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছি। ক্যাম্‌বেল এর সঙ্গে আশা করেছিলেন পীস্‌, লাভ, মার্সি ও উইজডম। কল্কি হয়তো এগুলো দেবেন না। গণদেবতার সাধনা করতে হবে এদের জন্য।

হাইনরিখ ক্লাইস্ট

১৭৭৭—১৮১১

জার্মান সাহিত্যের একচ্ছত্র অধিপতি তখন গ্যেটে। তাঁর পরেই শিলারের স্থান। গ্যেটের চেয়ে আটাশ বছরের ছোট এক সাহিত্য-যশঃপ্রার্থী যুবক এ দুজনকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন, ঈর্ষাও করতেন ঠিক তেমনি। ঈর্ষার কারণ, এঁদের খ্যাতির সামান্য একটু অংশও তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। মনে হতো সাহিত্যের সমগ্র ক্ষেত্র এঁরা দুজন অধিকার করে রেখেছেন, সেখানে আর কারো স্থান নেই! তার ওপর গ্যেটের উপেক্ষা ও বিরূপ সমালোচনা নিদারুণ আঘাতের কারণ হয়েছে। প্রথম নাটক পেন্‌থেসিলিয়া তো গ্যেটের হাতেই তুলে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি স্বীকৃতি দেননি। গ্যেটের মোটেই ভালো লাগেনি তরুণ লেখকের রচনায় মানসিক বিকারের লক্ষণ—হৈ-চৈ। স্টুর্ম উন্ত ড্র্যাঙ-এর মধ্য দিয়ে তিনি নিজে এসেছেন। এখন যৌবন অতিক্রান্ত, তাই সেই ঝড়ের মধ্যে লেখকের জীবন ও রচনার আবর্তন তাঁর কাছে বিরক্তিকর মনে হয়েছে। অথচ গ্যেটের কাছ থেকে একটু সহানুভূতি পেলে ক্লাইস্টের জীবন অন্যরকম হতে পারত।

হাইনরিখ ফ্যন ক্লাইস্টের জন্ম হয় ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর ফ্রাঙ্কফুর্টে। তাঁর পূর্বপুরুষরা সকলেই ছিলেন সম্ভ্রান্ত রাজকর্মচারী। বাবা সেনাবাহিনীর মেজর। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার তিনি বিয়ে করেন পঞ্চদশী এক কিশোরীকে। তাঁর নিজের বয়স কিন্তু তখন চল্লিশের ওপর। প্রথম স্ত্রীর দুই মেয়ে; দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান তিনটি। এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হাইনরিখ।

পড়াশুনার জন্য হাইনরিখকে বার্লিন পাঠানো হলো। একজন

শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থেকে বিদ্যাচর্চা করতে হয়। শিক্ষক ছাত্রের উপর খুশি নন। বড় একগুঁয়ে আর খামখেয়ালী। বই খুলে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভালো লাগে পড়ার চেয়ে। এদিকে বয়স যখন এগারো তখন বাবার মৃত্যু হলো; মার মৃত্যু হলো পাঁচ বছর পরে। অনাথ ভাই-বোনদের আশ্রয় দিলেন মাসীমা।

পরিবারের রীতি অনুসারে পনেরো বছর বয়সে ক্লাইস্ট সেনা-বাহিনীতে যোগ দিলেন ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে। পতাকাবাহী দলের অফিসার, অফিসারদের নিম্নতম পদ। তখন দেশের বড় বিপদ, নেপোলিয়ানের বিজয় অভিযান চলছে য়ুরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে। প্রাশিয়ার রাজা অপমানজনক শর্তে নেপোলিয়ানের সঙ্গে সন্ধি করায় যুদ্ধ-বিগ্রহের হাত থেকে কিছুদিনের জন্য শান্তি পাওয়া গেল। ক্লাইস্টের তখন অনন্ত অবসর, দু-একটা রুটিন মাফিক কাজ ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। এই অবসর সময়ে সাহিত্য ও দর্শনের বই পড়ে এবং সঙ্গীতের চর্চা করে কাটে। বিশেষ করে রুশোর রচনাবলী চিন্তার নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করে দিল। নিয়মে আবদ্ধ সেনা-আবাসের অলস জীবনযাত্রা সহ্য হয় না। সাত বছরে একবার পদোন্নতি হয়েছে। ধীরে ধীরে আরও উন্নতি হবে নিশ্চয়। কিন্তু পদোন্নতির মূল্য কিছুই নয় তাঁর কাছে। জীবনের সাতটা বছর একেবারে বৃথা কেটেছে। আর অপচয় করা চলে না।

রাজার কাছে আবেদন জানালেন, আমাকে এই চাকরি থেকে মুক্তি দিন। চাকরি আর করব না, এবার থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করব শুধু। অসামরিক চাকরিও চাই না।

এমন অদ্ভুত আবেদন আর কেউ রাজার কাছে করেনি। সবাই পদোন্নতির জন্য প্রার্থনা করে, নানা সুযোগ সুবিধা চায়। কোনো অভিজাত পরিবারের তরুণ সরকারী চাকরির সম্মান স্বেচ্ছায় ত্যাগ করবে, এটা ছিল সেকালে ধারণার অতীত।

চাকরি ছেড়ে বাড়ি চলে এলেন। পড়াশুনা করবেন ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাবা কিছু টাকা উইল করে রেখে গেছেন। তাই

একমাত্র ভরসা। আত্মীয়স্বজন সবাই তাঁর উপর বিরূপ। পরিবারের বড় ছেলে। চাকরি না করলে ছোট ছোট ভাই-বোনদের মানুষ করবে কে? সরকারী চাকরি ছাড়ায় বংশমর্যাদাও ক্ষুণ্ন হলো।

ফাউস্টের মতো সবকিছু জানবার অদম্য পিপাসা তাঁকে পেয়ে বসেছে। রুশোর শিষ্য, সুতরাং ভাবতেন জ্ঞানের সাধনা এবং জ্ঞানার্জনই শেষ লক্ষ্য। অর্জিত জ্ঞানকে কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হিসাবে ব্যবহার করবার প্রশ্ন ওঠে না। বন্ধু-বান্ধবরা বুঝত না এ সব কথা। তাদের আশঙ্কা হতো কি জানি, মাথা খারাপ হয় কি-না! অবশ্য এর জন্য তাদের দোষ দেওয়াও যায় না। দিনচর্যার নিত্য-নতুন পরিকল্পনা হতো আবার প্রতিদিনই তা বাতিল হয়ে যেত। হয় এ পথ, নয় ও পথ। জীবনের সঙ্গে ক্লাইস্টের রফা করে চলবার মতো মানসিকতা ছিল না। এই সময় তাঁকে একমাত্র সমর্থন জানাত সৎ বোন উলরাইক। জীবন-সংগ্রামের নানা অধ্যায়ে এই বোনকে তিনি সঙ্গী পেয়েছেন, তার কাছ থেকে পেয়েছেন সহানুভূতি এবং আর্থিক সাহায্য। উলরাইকের সঙ্গে ছিল ঘনিষ্ঠতা,—তাঁর নিকটতম বন্ধু। উলরাইক ছিল চিরকুমারী। দুজনের মধ্যে যত চিঠিপত্রের বিনিময় হয়েছিল তার প্রায় সবই উলরাইক পুড়িয়ে ফেলেছিল ক্লাইস্টের মৃত্যুর পরে।

চাকরি নেই, আর্থিক সঙ্গতি নেই, তবু ক্লাইস্ট নিজের বিয়ে ঠিক করে ফেললেন। পাত্রী সেনাবিভাগের এক অফিসারের মেয়ে ভিলহেলমাইন। সাধারণ মেয়ে। রুচিবাই একটু বেশি। ক্লাইস্টের স্বপ্ন, তাঁর নানা বিষয়ে জ্ঞান-চর্চা, সর্বোপরি সাহিত্যের নেশা হয়তো কিছুটা আকৃষ্ট করেছিল ভিলহেলমাইনকে। কিন্তু দ্বিধা করবার কারণও কম ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা, ক্লাইস্টের কোনো নির্দিষ্ট আয়ের পথ নেই, যার উপর নির্ভর করে নতুন সংসার পাতা যায়। তাছাড়া ক্লাইস্টের ছিল মাস্টারী করবার প্রবণতা,—যা সকলের পক্ষেই বিরক্তিকর। ভিলহেলমাইনকে ছাত্রীর মতো জার্মান ভাষা ও সাহিত্য, দর্শন, গণিত, ইত্যাদি সকল বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য

তিনি রীতিমতো ক্লাশ নিতেন। তার ওপর ছিল ক্লাইস্টের তোৎলামি। কথা বলতে বলতে হঠাৎ আটকে যায়, অনেক চেষ্টাতেও কথা বের হয় না। আর অক্ষমতার অপমানে ক্লাইস্ট ক্ষুব্ধ বিমর্ষ হয়ে উঠতেন। কোনো মেয়েই ভাবী স্বামীর কল্পনার সঙ্গে এমন লোককে মেলাতে পারে না।

ভিলহেলমাইনও স্বাভাবিক কারণেই প্রথমে ক্লাইস্টের প্রস্তাবে রাজী হয়নি। ফিরিয়ে দিয়েছে কয়েকবার। শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিয়েছিল। হয়তো অনুকম্পায়। কিংবা ভবিষ্যতে খ্যাতিমান লেখকের স্ত্রী হবার আশায়।

ক্লাইস্ট ভিলহেলমাইনের সম্মতি পেয়েই ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে বেরিয়ে পড়লেন। অন্য এক শহর থেকে চিঠি লিখলেন, আমি এখানে চিকিৎসার জন্য এসেছি। চিকিৎসা সফল হলে আমাদের দাম্পত্য জীবন খুব সুখের হবে।

ক্লাইস্টের কোনো কোনো জীবনীকারের অভিমত, বিবাহের পথে অন্তরায় দূর করবার জন্যই এই চিকিৎসার দরকার হয়েছিল। চিকিৎসা যে সফল হয়েছে, সে কথা ক্লাইস্ট নিজেই জানিয়েছেন এক চিঠিতে। কিন্তু দূরে গিয়ে হঠাৎ কেন যে তাঁর মনের পরিবর্তন ঘটল তার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিছুদিন আগেও যাকে বিয়ে করবার জন্য উৎসুক ছিলেন ক্লাইস্ট তাকে লিখলেন: "আমি ভাবছি তোমাকে মুক্তি দেওয়াই কি আমার উচিত নয়? ...আমাকে আর চিঠি দিও না। আমার একমাত্র কামনা মৃত্যু।"

ভিলহেলমাইনকে প্রায়ই তিনি বলতেন, জার্মান ভাষার একটি শব্দ মেয়েরা বুঝতে পারে না। সেটি উচ্চাশা। একদিকে উচ্চাশা অন্যদিকে কামনা—এই দুই পরস্পরবিরোধী মানসিকতা ক্লাইস্টের জীবনের ভারসাম্য বিচলিত করেছিল। উচ্চাশা বলতে ক্লাইস্ট বুঝতেন লেখক হিসাবে খ্যাতি,—গ্যেটে-শিলারের সঙ্গে তাঁর নাম স্থান পাবে এই আশা। একদিন যে তা সম্ভব হবে, সে সম্বন্ধে ক্লাইস্টের ছিল দৃঢ় প্রত্যয়।

ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া বন্ধ করে ভিলহেলমাইনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে চার বছর ক্লাইস্ট ঘুরে বেড়ালেন য়ুরোপের নানা জায়গায়। প্যারিসে কাটল বেশ কিছুদিন। ফরাসী ভাষায় দক্ষতা ছিল। সুতরাং ফ্রান্সের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে স্থাপিত হলো নিবিড় পরিচয়। বিশেষ করে ফরাসী নাটকের সঙ্গে। নিজের কয়েকটি অসম্পূর্ণ নাটকের পাণ্ডুলিপিও নিয়ে গিয়েছিলেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে আশা ছিল রবার্ট গিসকার নাটকটির ওপর। বিষয়বস্তু ও পরিকল্পনা—দুই-ই ছিল মহৎ। কিন্তু লেখা কিছুতেই অগ্রসর হয় না, যেটুকু বা হয় তাতে মনে তৃপ্তি নেই। ব্যর্থতার ক্ষোভে পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলবার কথাও তাঁর মনে হলো।

এই সময় আলাপ হলো সমকালীন প্রভাবশালী কবি ও সমালোচক ক্রিস্টোফ মার্টিন ভিলাণ্টের সঙ্গে। তিনি গিস্‌কারের পরিকল্পনা শুনলেন; আর শুনলেন ক্লাইস্টের মুখে নাট্যাংশের আবৃত্তি। মুগ্ধ হলেন তিনি। বললেন, ইস্‌কাইলাস, সফোক্লিস ও শেক্সপীয়রের মিলিত প্রতিভাও এরকম নাটকের পরিকল্পনা করতে পারত কিনা সন্দেহ। শিলার ও গ্যেটে জার্মান সাহিত্যের যে অভাব পূর্ণ করতে পারেননি, ক্লাইস্ট তা করবেন।

ক্লাইস্ট কিন্তু এই নাটক সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। নেপোলিয়ানের বিশ্ববিজয়ের স্বপ্নই যে এই নাটক রচনার প্রেরণা দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। রবার্ট গিস্‌কার অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর, কিন্তু সে নিঃসঙ্গ। সমগ্র পৃথিবীর বিরুদ্ধে সে মাথা উঁচু করে আছে, সুযোগ মাত্র তাকে টেনে নামিয়ে আনা হবে সেই উচ্চাসন থেকে। অথচ সংসারের চাকা তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে। বীরের ভাগ্যই এই। যাদের সে পালন করবে, তারাই করবে বিরুদ্ধাচরণ।

ক্লাইস্টের প্রথম নাটক Die Familie Schroffenstein প্রকাশ করেন তাঁরই এক বন্ধু ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে। বইয়ে লেখকের

নাম ছিল না। এ নাটক কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি।

পাঁচ বছর পরে বের হলো পেন্‌থেসিলিয়া। ক্লাইস্টের নাম কিছুটা প্রচারলাভ করে। অ্যামাজনদের রানী পেন্‌থেসিলিয়া। রানী তার প্রেমিককে যুদ্ধে পরাজিত করবে,—এই ছিল রীতি। কিন্তু তার প্রেমিক অ্যাকিলিস যখন রানীকে পরাজিত করল, তখন অপমানের সীমা রইলো না। রাত্রির উন্মত্ত কামকেলির সুযোগে পেন্‌থেসিলিয়া অ্যাকিলিসের বুকে তীর বসিয়ে তার রক্ত পান করল প্রতিশোধ হিসাবে। এই পৈশাচিকতার পরে সে প্রাণ হারালো।

ঐ বছরই বের হয় 'আরমিনিয়াস বধ' নাটক। দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত এই নাটক নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে জার্মানদের সংঘবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে রচিত। আক্রমণকারী রোমানদের বিরুদ্ধে আরমিনিয়াস জার্মানদের নেতৃত্ব করেছিল। আরমিনিয়াস একেবারে উন্মত্ত,—স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সে সম্মান, স্ত্রী, সন্তান—সব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।

ক্লাইস্টের শ্রেষ্ঠ নাটক 'প্রিন্স অব হামবুর্গ' ঐতিহাসিক কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত। ওপরওয়ালার আদেশ অমান্য করেও দেশের স্বার্থে অভিযান চালিয়ে রাজকুমার হামবুর্গ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়। কিন্তু পরে নিজের গভর্নমেণ্টের বিচারে তার প্রাণদণ্ড হয়,—কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করবার অপরাধে।

'ভাঙা কুঁজো' (১৮০৩) এক ছোট শহরের দুশ্চরিত্র শাসকের কীর্তিকলাপ অবলম্বনে রচিত প্রহসন। বাস্তব জীবনের ছবি এই নাটকেই সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। 'কেটি অব হেইলব্রন' (১৮১০) এক মধ্যযুগীয় প্রেমের কাহিনী।

নাটক ছাড়া ক্লাইস্ট লিখেছেন কতকগুলি সুন্দর গল্প। প্রত্যেকটি গল্পের বিষয়বস্তু বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। প্রতিটি কাহিনীর একটি বাণী আছে, শিল্পরস ক্ষুণ্ণ না করেও তা জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে। লোকার্নোর ভিক্ষুণী, দি মার্কুইস অব ও'—, দি ফাউণ্ডলিং, সেণ্ট সিসিলিয়া প্রভৃতি গল্পগুলি পাঠকের মন অধিকার করে রাখে।

প্রথম রচিত গল্প 'চিলির ভূমিকম্প' শিল্প-নৈপুণ্যের আদর্শ হিসাবে সমালোচকদের অভিনন্দন পেয়েছে। ন্যায় বিচারের জন্য মানুষের চিরন্তন দাবিকে মূর্ত করে তুলেছে 'মাইকেল কোলহাস'।

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে এক বন্ধুর সহযোগিতায় 'ফীবাস' নাম দিয়ে একটি সাহিত্যপত্র সম্পাদনা শুরু করেন ক্লাইস্ট। এই উপলক্ষে গ্যেটে, টিয়েক এবং অন্যান্য অনেক লেখকের সঙ্গে তাঁকে দেখা-সাক্ষাৎ করতে হয়েছিল। সাহিত্যজগতে বেশ একটু পরিচিতি লাভ করলেন। কিন্তু পত্রিকা চলেনি বেশিদিন।

ক্লাইস্টের সাহিত্যসৃষ্টির সময় সাত-আট বছরের বেশি নয়। আর এই সময়ও তিনি সম্পূর্ণরূপে সাহিত্যচর্চায় কাটাতে পারেননি। অল্প সময়ের মধ্যে লিখে খ্যাতি অর্জনের অদম্য আকাঙ্ক্ষায় পরিশ্রম করেছেন অসাধারণ। তার ফলে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। এর ওপর নিদারুণ দারিদ্র্য। শুধু বাঁচবার তাগিদেই সরকারী অর্থ দপ্তরে চাকরি নিতে হলো। নেপোলিয়ানের আক্রমণে জার্মানী তখন বিপর্যস্ত। বছরখানেক চাকরি করে অনির্দিষ্টকালের ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ফ্রান্সের সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়াবার সময় ক্লাইস্ট বন্দী হলেন ফরাসী পুলিসের হাতে, জার্মানীর হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করবার অভিযোগে। মুক্তি পেয়ে ফিরে এলেন বার্লিন।

কিন্তু ফ্রান্সের কারাগারই বোধ হয় ছিল ভালো। বার্লিনে বাঁচবার কোনো পথ নেই। দারিদ্র্যের কারাগার থেকে মুক্তির পথ কোথায়?

ভিলহেলমাইনের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব ভেঙে গেছে অনেকদিন আগেই। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে পরিচয় হলো হেনরিয়েটের সঙ্গে। আশ্চর্য বান্ধবী, আর কোনো দিকে মিল নেই; মিল শুধু মৃত্যুকামনায়। ক্লাইস্ট যেমন মাঝে মাঝে মৃত্যুর আহ্বান পেয়ে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, হেনরিয়েটও তেমনি মৃত্যুর জন্য যেন পা বাড়িয়েই আছে। ২১শে নভেম্বর, ১৮১১ মৃত্যুর আহ্বান শুনতে পেলেন দুজনে একসঙ্গে। এবার সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হলো না।

এই আত্মহত্যা কি ক্লাইস্টের অবক্ষয়ধর্মিতার প্রমাণ, না সত্যি কারণ ছিল? ক্লাইস্টের জীবনের শেষ ক'বছরের ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে' ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতরূপে তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। মৃত্যুর মধ্যেই তাঁর মুক্তি।

আজ ক্লাইস্ট জার্মান নাট্যকারদের মধ্যে উচ্চাসন লাভ করেছেন। কেউ কেউ তাঁকে শিলারের চেয়ে বড় নাট্যকার হিসাবে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত। কিন্তু বেঁচে থাকতে কোনো ভালো রঙ্গমঞ্চে তাঁর নাটকের অভিনয় হয়নি। অখ্যাত জায়গায় দু-একটি নাটকের অভিনয় হয়েছে, কিন্তু কেউ তা নিয়ে আলোচনা করেনি। গ্যেটে ভাইমারের রঙ্গমঞ্চে 'ভাঙা কুঁজো' অভিনয় করিয়েছিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ নাটক নয়; এত সংক্ষেপ করা হয়েছিল যে, মূল নাটক তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমন সুন্দর প্রহসনটিকে এভাবে হত্যা করবার জন্য ক্লাইস্ট এতই উত্তেজিত হয়েছিলেন যে, গ্যেটেকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করবার কথা মনে হয়েছিল তাঁর।

ক্লাইস্টের স্বদেশপ্রীতিমূলক রচনাগুলি জার্মানীর রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জনপ্রিয়তা লাভ করা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এগুলিও সমাদর লাভ করেনি। গ্যেটের বিরূপতার জন্যই হয়তো সমকালীন লেখকরা ক্লাইস্টের প্রতি দৃষ্টি দেয়নি। ক্লাইস্ট সম্বন্ধে গ্যেটের একটি মন্তব্য: "With the best will in the world towards this poet, I have always been moved to horror and disgust by something in his works, as though here were a body well-planned by nature, tainted with an incurable disease."

গ্যেটে যে রোগের কথা বলেছেন তা হলো পেনথেসিলিয়ার বীভৎস রস। কিন্তু এটা যে ক্লাইস্টের রচনার সামান্য অংশমাত্র, আরও মহৎ সৃষ্টি যে রয়েছে, তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। সমকালীন জার্মান সাহিত্যের একচ্ছত্র নেতা গ্যেটে। তিনি স্বীকৃতি না দেওয়ায় অন্য সবাই ক্লাইস্টকে উপেক্ষা করেছেন।

ক্লাইস্টের কোনো গোষ্ঠী ছিল না। যে অল্প কয়েকজন বন্ধু ছিল, তাঁরা করুণার চোখে দেখতেন, তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। পরিচিত লোকদের নিকট ক্লাইস্ট এতই সাধারণ ছিলেন যে, তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখে রাখা তারা প্রয়োজন বোধ করেনি। এই জন্যই ক্লাইস্টের জীবনের ঘটনা বিশেষ কিছু জানা যায় না। বন্ধু-বান্ধব এবং সমকালীন লেখকদের ক্রমাগত উপেক্ষাই ক্লাইস্টের মৃত্যু এগিয়ে এনেছে, তাঁর সৃষ্টির উৎস ব্যাহত করেছে। প্রকাশকের কাছে পাণ্ডুলিপি নিয়ে গেছেন, বারবার ফিরে আসতে হয়েছে। থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ নাটক সবটা না পড়েই ফিরিয়ে দিয়েছে।

একটি সান্ধ্য পত্রিকা বের করবার পর অল্পদিনের মধ্যেই সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। ক্লাইস্টের আশা হলো, এবার বুঝি দুঃখ-দুর্দশা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আছে ছায়ার মতো তাঁর পেছনে। সরকারী সেন্সরের কোপ পড়ল তাঁর কাগজের উপরে। সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম করে কতদিন টিঁকে থাকতে পারে দরিদ্র সম্পাদক। কাগজ উঠে গেল। যা-কিছু সম্বল সব নিয়োগ করে-ছিলেন। সুতরাং কাগজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়লেন ক্লাইস্ট। পথের ভিখিরি প্রায়। খাবার পয়সা নেই পকেটে। দিনের পর দিন ঘরের মধ্যে বসে থাকতে হয়। শুধু বাঁচবার জন্যই আবার চাকরি করা দরকার।

একমাত্র সেনাবিভাগে চাকরি পাওয়া যেতে পারে পারিবারিক-সূত্রে। কিন্তু সেই চাকরির জন্য আবেদন করতে হলেও টাকার প্রয়োজন। তখনকার রীতি অনুসারে অফিসারের সাজ-পোশাক নিজেকে কিনতে হতো। সেই টাকা কোথায়? গেলেন উলরাইকের কাছে। অনেকবার সাহায্য করেছে। এই শেষবারের মতো তার সহায়তা চান। আশ্চর্য, সেই মমতাময়ী উলরাইকও বদলে গেছে। অপরিচিত লোকদের সামনেই অপমান করে বিদায় করে দিল। বংশের কুলাঙ্গার, অপদার্থ, আরও কত কী! এমন অপমানের চেয়ে মৃত্যু দশগুণ বেশি শ্রেয়—পরে এক চিঠিতে ক্লাইস্ট লিখেছিলেন।

দুর্ভাগ্যের তাড়নায় ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চললেন ক্লাইস্ট। আর সব পথ বন্ধ, শুধু মৃত্যুর সিংহদ্বার খোলা। লেখক হিসাবে তিনি ফুরিয়ে যাননি। আরও কত লেখার এবং কত বেশি ভালো লেখার পরিকল্পনা ছিল! কিন্তু তার জন্য তো বাঁচা প্রয়োজন!

এই সময় নতুন করে দেখা হলো হেনরিয়েটের সঙ্গে। যখন সরকারী অর্থ দপ্তরে চাকরি করতেন তখন আলাপ হয়েছিল। এক অ্যাকাউণ্ট্যাণ্টের স্ত্রী। এখন দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে ভুগছে। অপেক্ষা করছে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর। মৃত্যু দুজনের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব রচনা করল। জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করতে চাননি তাঁরা; প্রেম পরস্পরকে আকৃষ্ট করেনি। শুধু একসঙ্গে মৃত্যুর কামনায় তাঁরা মিলিত হয়েছিলেন। ক্লাইস্ট এর আগেও অনেককে স্বেচ্ছা-মৃত্যুর অংশীদার হতে আহ্বান করেছেন। উলরাইকও তাদের একজন। কেউ সাড়া দেয়নি, কেউ সঙ্গী হতে চায়নি। হেনরিয়েট সাগ্রহে এগিয়ে এলো তাঁর হাত ধরে মৃত্যুর ভয়ঙ্কর পথে। ক্লাইস্ট কুলাঙ্গার, অপদার্থ, জীবনে অকৃতকার্য। তাঁকে অবলম্বন করে কেউ বাঁচতে চায়নি; অন্য কেউ তাঁকে অবলম্বন দেয়নি যাতে তিনি বাঁচতে পারেন, প্রতিভার বিকাশ ঘটতে পারে। মৃত্যুর পূর্বে জয় করবার আনন্দ লাভ করে গেলেন। মৃত্যুর আহ্বান জানিয়ে হেনরিয়েটকে তিনি জয় করেছেন।

বার্লিন শহর থেকে কিছু দূরে লেকের তীরে ছোট একটি হোটেলে গিয়ে দুজনে উঠলেন। ২০শে নভেম্বর, ১৮১১। সারাদিন দুজনে নৌকো করে লেকে বেড়ালেন। সারারাত তাঁদের ঘরে আলো জ্বলল। দুজনেই বেশ হাসি-খুশি। পরদিন খুব সকালে কফি খেয়ে চললেন লেকের দিকে। একটু পরেই হোটেলের লোক শুনতে পেল গুলীর শব্দ। ছুটে গিয়ে দেখল, হেনরিয়েট পড়ে আছে চিৎ হয়ে— খোলা বুক রক্তে ভেজা। আর তার পায়ের কাছে ক্লাইস্ট, তালুতে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে গুলী ছুঁড়েছেন।

কাগজে খবর বেরুলো। ক্লাইস্টের মতো লোকের যে এমনি

পরিণতি হবে তা তো সবাইয়ের জানা কথা! আত্মীয়-স্বজনের মুখ লজ্জায় কালো হয়ে গেল। কেউ কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করতে গেলে পরিবারের লোক বিদায় করে দিত, ক্লাইস্টের নাম মুখেও আনবে না। চিঠিপত্র, অপ্রকাশিত রচনা, ইত্যাদি যা-কিছু তাদের কাছে ছিল, সব পুড়িয়ে ফেলল।

মৃত্যুর পরেও দুর্ভাগ্য ক্লাইস্টকে ত্যাগ করেনি। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'প্রিন্স হামবুর্গ' মৃত্যুর দশ বছর পরে ছাপা হয়েছিল। কোনো সমালোচক তাঁর সম্বন্ধে লেখেননি দীর্ঘকাল। নাটক অভিনয় হয়নি বললেও চলে। সংক্ষিপ্ত খণ্ডিত নাটক যা-ও মঞ্চস্থ হয়েছে তাতে লেখকের নাম প্রচারিত হয়নি। মৃত্যুর প্রায় এক শতাব্দী পরে ক্লাইস্টের রচনাবলীর চার খণ্ডে প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বর্তমান শতকের সমালোচকরা ক্লাইস্টকে উপেক্ষার সমাধি থেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছেন। টমাস মান তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

"He was one of the greatest, boldest, and most ambitious poet Germany has produced; a playwright and story-teller of the very first order; a man unique in every respect, whose achievement and career seemed to violate all known codes of patterns."

ক্লাইস্টের কথা আজ আমাদের বিশেষ করে মনে পড়ে 'মাইকেল কোলহাস'-এর জন্য। বড় গল্প। শিল্পকর্ম হিসাবে গল্পটির তো মূল্য আছেই। কিন্তু শুধু সে জন্য নয়। সুবিচারের দাবিতে কোলহাসের যে সংগ্রাম ও আত্মবলি তা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে পাঠকের হৃদয় বিশেষ করে স্পর্শ করে। যতদিন মানবসমাজ থাকবে, ততদিন সুবিচারের জন্য এমনি সংগ্রাম চলবে।

ক্লাইস্টের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে কাফকার উপর। কাফকা নিজে তা স্বীকার করেছেন। কোলহাসের প্রভাব থেকে কাফকা কখনো মুক্ত হতে পারেননি। প্রায়ই বন্ধুদের পড়ে শোনাতেন

কোলহাসের কাহিনী। মঞ্চে বসে অনেক শ্রোতার সামনেও তিনি এই গল্পটি পড়েছেন প্রাহা শহরে।

জার্মান উপকথার পুরনো কাহিনীকে ক্লাইস্ট শাশ্বত শিল্পরূপ দিয়েছেন। মাইকেল কোলহাস ঘোড়ার ব্যবসায়ী। অত্যন্ত সৎ, তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং ন্যায়ের পথে চলবার জন্য ক্ষতি স্বীকার করতে দ্বিধা নেই।

একবার ঘোড়া নিয়ে চলেছে শহরের বাজারে বিক্রি করতে। দেখল, ট্রোঙ্কা দুর্গের কাছে শুল্ক আদায়ের একটা নতুন ঘাঁটি বসেছে। এর আগে কতবার গেছে এ পথে, কেউ টোল আদায় করেনি। যাই হোক, মনে মনে একটু বিরক্ত হলেও যে টাকা দাবি করল তাই দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিল। না হলে শহরের বাজারে পৌঁছতে দেরি হবে। ফলে লোকসান হবে। কিন্তু টাকা দিয়ে ঘোড়া নিয়ে এগোবার উদ্যোগ করতেই দুর্গের ম্যানেজার এসে পথ আগলে দাঁড়াল। বলল, পাস দেখি?

পাস? আকাশ থেকে পড়ল কোলহাস। পাস যে প্রয়োজন তা তো জানে না! কোনোদিন দরকার হয়নি। ম্যানেজার বলল, নতুন অর্ডিন্যান্স হয়েছে।

কোলহাস অনুরোধ জানাল, এবার আমাকে যেতে দিন; শহর থেকে পাস করিয়ে আনব।

না, কিছুতেই ছাড়বে না! অগত্যা সে দুর্গের অধিপতি ভেনটজেলের সঙ্গে দেখা করতে গেল। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে কর্তা। সে তার আবেদন জানাল। একপাল ঘোড়া নিকটেই আছে জেনে বন্ধুরা উৎসাহিত হয়ে উঠল। সবাই এল ঘোড়া দেখতে। কার কোন্ ঘোড়া পছন্দ, ঘোড়ায় চড়ে শিকারে গেলে কেমন হয়, ইত্যাদি কথা নিয়ে কর্তার বন্ধুরা আলোচনা শুরু করল। কোলহাস দেখল বড়ই বিপদ। যদি জোর করে সব ঘোড়া রেখে দেয় তাহলেই বা সে একা কী করবে? সুতরাং আপোষে ঠিক করল, সে দুটো ঘোড়া জামিন হিসাবে রেখে যাবে দুর্গে। পরে পাস

দেখিয়ে ঘোড়া ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। চমৎকার কালো ঘোড়া; তরুণ, তেজস্বী। ঘোড়া দেখাশুনার জন্য একজন সহিস রেখে গেল। নাম হেরর্স।

শহরে পৌঁছে খবর নিয়ে জানল পাসের কথা একেবারেই মিথ্যা; ওটা শুধু টাকা আদায়ের ছল। পাসের যে দরকার নেই,-সে সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের একটা চিঠিও নিয়ে রাখল। ঘোড়া বিক্রি করে টাকা-পয়সা আদায় করে ফিরতে বেশ কিছুদিন দেরি হয়ে গেল।

ট্রোঙ্কা দুর্গে এসে চিঠি দেখিয়ে ঘোড়া ফেরত চাইল। ম্যানেজার কিছু না বলে শুধু আস্তাবল দেখিয়ে দিল; ওখান থেকে ঘোড়া নিয়ে যাবার ইঙ্গিত করল। কোলহাস তো চিনতেই পারল না তার সেই সুন্দর তেজী ঘোড়া দুটিকে। তাদের কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে। পাঁজরের প্রত্যেকটি হাড় গোনা যায়। তার দু চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। এর চেয়ে ঘোড়া দুটো মরে গেলেও ভালো হতো। সহিসও নেই; দুর্গের বাচ্চা চাকরটা জানাল তাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে ম্যানেজার। থাকলে জানা যেত ঘোড়ার এ দশা কেমন করে হলো।

কোলহাস দাবি করল, যেমন অবস্থায় আমার ঘোড়া রেখে গিয়েছিলাম ঠিক তেমন অবস্থায় ঘোড়া ফিরে চাই।

দুর্গের অধিপতি বিদ্রূপ করে হেসে উঠল। হুকুম করল, যদি লোকটা ঘোড়া না নিতে চায়, তবে ওকে মেরে তাড়িয়ে দাও, যেমন করে পাজি সহিসটাকে মেরে বিদায় করেছি।

কোলহাস একা, নিরুপায়। যেমন ঘোড়া রেখে গিয়েছিলাম ঠিক তেমনটি আমি ফিরে চাই—আবার বলল সে। আমি জানি সুবিচার কি করে পেতে হয়।

বিদ্রূপের হাসি শুনতে শুনতে দুর্গ থেকে সে বেরিয়ে এল। কোলহাসের বিচারবোধ অত্যন্ত সচেতন। তার মনে হলো হয়তো সহিস সত্যি কিছু অন্যায় করেছে; হয়তো তার দোষেই ঘোড়ার এই দশা। সুতরাং আগে সহিসের কাছ থেকে সব জেনে নিয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করবে।

বাড়ি পৌঁছে স্ত্রীর কাছ থেকে জানতে পারল সহিস মারের চোটে আধমরা হয়ে এসেছিল। এখনো শয্যাশায়ী। অনেক কষ্টে তাকে বাঁচানো গেছে। তার বিশ্বস্ত পরিচারক হেরর্স কখনো মিথ্যা বলবে না। তবু বিচারকের মতো প্রশ্ন করে করে কোলহাস সব জেনে নিল। ঘোড়া দুটিকে দিয়ে দুর্গের ম্যানেজার মাল টানিয়েছে। তাই ওদের এই হাল! হেরর্স প্রতিবাদ করায় তাকে মেরে এবং জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে।

কোলহাস নিঃসংশয় হলো দুর্গাধিপতির অপরাধ সম্বন্ধে। এর প্রতিকার চাই। উকিল ডেকে তার সকল অভিযোগ উল্লেখ করে আবেদন তৈরী করল। তারপর ড্রেসডেনের আদালতে মামলা দায়ের হয়ে গেল ট্রোঙ্কা দুর্গের অধিপতির বিরুদ্ধে। কিন্তু মাসের পর মাস পার হয়ে যাচ্ছে, বছর পূর্ণ হয়ে এল—আদালত থেকে মামলা সম্বন্ধে কোন চিঠি আসে না। স্মারকপত্র পাঠিয়েও উত্তর নেই। তারপর উকিল বন্ধুকে লিখল খবর জানাতে। সে জানাল, ট্রোঙ্কার দুজন আত্মীয় আছে, যারা রাজদরবারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, রাজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে। তাদের চেষ্টায় আদালতের মামলা চাপা পড়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে আর কিছুই হবে না। কোলহাস দুর্গ থেকে ঘোড়া দুটি ফিরিয়ে আনতে পারে। কোলহাসের এতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। যদি না হয় তাহলে উকিল এ ব্যাপারে তাকে কোনো সাহায্য করতে পারবে না।

কোলহাস চিঠি পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই কি নিরপেক্ষ বিচার? তাদের অঞ্চলের গভর্নরকে ব্যাপারটা জানাল। সব শুনে তিনি ব্র্যাণ্ডেনবুর্গের ইলেক্টরকে চিঠি দিলেন যাতে কোলহাস সুবিচার পায়। ইলেক্টর অভিযোগ আদালতে না পাঠিয়ে যে অফিসারকে তদন্ত করতে দিলেন, সে ট্রোঙ্কার আত্মীয়। সুতরাং আবার পরামর্শ এল ঘোড়া ফিরিয়ে নিয়ে যাও, ব্যাপারটার এখানেই শেষ হোক। কোলহাস হয়তো মেনে নিত এই পরামর্শ যদি ট্রোঙ্কা নিজে এসে ঘোড়া ফিরিয়ে দিয়ে যেত তার বাড়ি। তা তো নয়ই; বরং খবর

পেয়েছে এখনো ঘোড়া দুটোকে মাঠে চাষের কাজে খাটানো হচ্ছে।

কোলহাস এই পরামর্শ নতুন করে পাবার পর গ্রামের মোড়লকে বাড়িতে ডেকে পাঠাল। তার স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তির বিবরণ দিয়ে জানতে চাইল, বিক্রি করলে এদের দাম কত হবে। দামদস্তুর সব ঠিক করে মোড়ল চলে গেল। লিসবেথ সবই শুনছিল। স্বামীকে একা পেয়ে কেঁদে বলল, তুমি কি পাগল হয়েছ ? সব বিক্রি করে দিলে আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে কোথায় দাঁড়াব ?

আদর করে স্ত্রীকে কাছে ডেকে কোলহাস বলল, এ দেশ ছেড়ে চলে যাবো। যে দেশের সরকার আমার নায্য অধিকার রক্ষা করবে না, যেখানকার লোক অকারণে লাথি মারলেও প্রতিকার নেই, সেখানে বাস না করে অন্য দেশে কুকুর হয়ে থাকাও ভালো। নিশ্চয়ই তুমি আমাকে সমর্থন করবে।

লিসবেথ চোখ মুছে বলল, তোমার আরজি আমাকে দাও। আবার চেষ্টা করব। আমি রাজার কাছে যাব। মেয়ে বলে আমার কথা রাজা হয়তো শুনবেন।

স্ত্রীর প্রস্তাব কোলহাস খুশি হয়েই গ্রহণ করল। শুধু বলে দিল, তুমি নিজে রাজার হাতে আরজি দিতে পারলে কাজ হবে।

লিসবেথ একটু বেশী এগিয়ে এসেছিল। দেহরক্ষীর বল্লমের হাতলের গুঁতো লাগল বুকে। জোরেই লেগেছিল। আর কথা বলতে পারেনি লিসবেথ। মুখ দিয়ে উঠে এসেছিল কয়েক ঝলক রক্ত। হাতের মুঠো থেকে আরজিটা নিয়ে গেল একজন সভাসদ। বাড়ি ফিরে কয়েকদিন মাত্র বেঁচে ছিল। কিন্তু কোনো কথা বলতে পারেনি। কোলহাস যোগ্য মর্যাদার সঙ্গে স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত করল। সব কাজ হয়ে গেছে, কোলহাস কনিষ্ঠ পুত্রকে কোলে করে সমাধির কাছে দাঁড়িয়ে তার প্রিয়তমা পত্নীর আকস্মিক মৃত্যুর কথা ভাবছিল, এমন সময় রাজদরবার থেকে লোক এল চিঠি নিয়ে। লিসবেথ যে আবেদন দিয়ে এসেছিল তার উত্তর এসেছে। কোলহাসকে আদেশ করা হয়েছে, সে যেন ট্রোঙ্কা দুর্গ থেকে তার

ঘোড়া নিয়ে আসে। আর এই ব্যাপার নিয়ে সে যদি আবার আইন-আদালত করতে যায় তাহলে তাকে জেলে যেতে হবে।

রাজার বিচারের রায় পকেটে পুরে সে বাড়ি ফিরে এল। প্রিয়তমা পত্নীর শূন্য শয্যায় কিছুক্ষণ নীরবে শুয়ে রইল মুখ গুঁজে। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। মনস্থির করেছে। প্রতিশোধ নিতে হবে। ট্রোঙ্কা দুর্গের কর্তার কাছে সে আদেশপত্র পাঠাল। তিন দিনের মধ্যে ঘোড়া দুটি নিয়ে কর্তাকে আসতে হবে কোলহাসের বাড়ি, নিজের হাতে খাইয়ে পরিচর্যা করে ঘোড়া দুটিকে আগের মতো নাদুস-নুদুস করে দিতে হবে।

তারপর ছেলেদের পাঠিয়ে দিল দূরে এক আত্মীয়ের বাড়ি। বিক্রি করে দিল নিজের সব সম্পত্তি। সাতজন বিশ্বস্ত সহচরকে রেখে দিল। তারা প্রত্যেকে পেল একটি করে ঘোড়া আর কিছু অস্ত্রশস্ত্র। তৃতীয় দিন রাত্রিতে সাতজন সহচরকে নিয়ে কোলহাস প্রবেশ করল ট্রোঙ্কা দুর্গে। কর্তা তখন ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে কোলহাসের আদেশপত্র নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছিল। হঠাৎ কোলহাসকে সশস্ত্র সঙ্গী সহ ঘরের মধ্যে দেখতে পেয়ে ঘাবড়ে গেল। পাশের একটা দরজা দিয়ে কোথায় যে অদৃশ্য হলো, কোলহাস তন্নতন্ন করে খুঁজেও আর পেল না। দুর্গে আগুন ধরিয়ে দিল; ম্যানেজার আর গোমস্তা প্রাণ হারাল। কিন্তু আসল শত্রু গেল পালিয়ে।

কোলহাস সর্বত্র ইস্তাহার প্রচার করতে লাগল। ট্রোঙ্কার জমিদারের বিরুদ্ধে ন্যায়যুদ্ধ ঘোষণা করেছে সে; সবাই যেন সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে।

ট্রোঙ্কা যেদিকে গেছে শুনতে পায় কোলহাস সেদিকে ধাওয়া করে। দলে আরও অনেক নতুন লোক যোগ দিয়েছে। রাত্রির অন্ধকারে শহরে ঢুকে আগুন লাগিয়ে দেয়, বাড়ির পর বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সর্বত্র আতঙ্ক। কবে কোথায় কোলহাসের দল এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। নাগরিকরা ভয়ে উন্মত্ত। পুলিস, সৈন্য কিছু করতে পারে না। কোলহাসের পোস্টার পড়ে। ট্রোঙ্কার জমিদারকে তোমরা

আমার হাতে তুলে দাও, আমি আর কিছু চাই না, কারো ক্ষতি করব না। মুখে মুখে প্রচার হতে থাকে কোলহাসের প্রতি অবিচারের কথা। জনসাধারণের সহানুভূতি তার দিকে। ট্রোঙ্কার জমিদার তার আত্মীয় রাজ-কর্মচারীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সুবিচারের পথ রুদ্ধ করেছে। কারো বুঝতে বাকী নেই। তাই তারা চায় ট্রোঙ্কার শাস্তি হোক, কোলহাস শান্ত হবে, দেশে শান্তি ফিরে আসবে। জনসাধারণ কোলহাসের পক্ষে বুঝতে পেরে কর্তৃপক্ষও কিছুটা ঘাবড়ে গেছে।

কোলহাসের দলে অনেক লোক যোগ দিয়েছে, শক্তি বেড়েছে; একটা দুর্গ দখল করে প্রতিষ্ঠা করেছে প্রভিসানাল ওয়ার্লড গভর্নমেণ্ট। ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করবে এই নতুন বিশ্ব-সরকার।

গ্যেটের বিশ্ব-সাহিত্যের ভাবনা এসেছে অন্ততঃ দুই দশক পরে। লীগ অব নেশনসের ওয়ার্লড গভর্নমেণ্টের পরিকল্পনার সূত্রপাত এক শতাব্দী পার হবার পূর্বে হয়নি। কোলহাস চেয়েছিল, ন্যায়ের দাবিতে পৃথিবীর অত্যাচারিত জনসাধারণ এক হবে, সংগ্রাম ঘোষণা করবে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে।

একদিন বিখ্যাত খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী মার্টিন লুথারের ইস্তাহার চোখে পড়ল কোলহাসের। একটি অবিচারের প্রতিকারের জন্য শত শত অবিচার হচ্ছে, নিরপরাধীরা শাস্তি পাচ্ছে। কোলহাস যে-সব অবিচার করছে ঈশ্বর কি এর জন্য তাকে শাস্তি দেবেন না?

কোলহাসের অন্তর স্পর্শ করল লুথারের এই প্রশ্ন। সে ধার্মিক, বিচার নিজের জন্য চায়, চায় অন্য সকলের জন্যও। একদিন রাত্রিতে ছদ্মবেশে উপস্থিত হলো লুথারের বাড়ি। তাঁর উপদেশ কী?

লুথার পরিচয় পেয়ে রাগে জ্বলে উঠলেনঃ বেরিয়ে যাও ঘর থেকে। তোমার নিশ্বাসে মহামারী, তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে সর্বনাশ!

—প্রভু, আমি পৃথিবীর সামনে প্রমাণ করতে চাই যে, আমার প্রিয়তমা পত্নী ন্যায়বিচারের দাবিতে প্রাণ দিয়েছে, কোনো ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য নয়।

লুথার একটু নরম হলেন। বললেন, জমিদারকে ক্ষমা করে ঘোড়া ফিরিয়ে আনলেই কি ভালো হয় না?

কোলহাস তাতে রাজী নয়। বিচারের দাবিতে তাকে এত বড় মূল্য দিতে হয়েছে, এর পরে ক্ষমার প্রশ্ন ওঠে না। সবাইকে ক্ষমা করা সম্ভব, কিন্তু জমিদারকে নয়। ঈশ্বর নিজেও কি তাঁর শত্রুদের ক্ষমা করেন?

লুথার বিরক্ত হলেও গভর্নমেণ্টকে চিঠি লিখে দিলেন যেন কোলহাসের অভিযোগের আবার বিচার হয়। এবং বিচার না হওয়া পর্যন্ত তাকে যেন কোন শাস্তি দেওয়া না হয়, মুক্ত নাগরিকের মর্যাদা পাবে সে। লুথারের এই সুপারিশ মেনে নিল সরকার। নতুন করে বিচার হলো। সেই বিচারে কোলহাসকে দেওয়া হলো প্রাণদণ্ড।

নির্দিষ্ট দিনে বধ্যভূমিতে গিয়ে কোলহাস দেখতে পেল তার সেই কালো ঘোড়া দুটি ঘাস খাচ্ছে; আগের মতো নাদুসনুদুস হয়েছে। আনন্দে দু চোখ জলে ভরে গেল। জানতে পারল ট্রোঙ্কা দুর্গের অধিপতির কারাদণ্ড হয়েছে তার প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য। এতদিনে কোলহাসের দাবি পূর্ণ হলো, অন্যায়ের বিচার হলো। এবার সে হাসিমুখে জল্লাদের সামনে মাথা পেতে দিল।

কিন্তু কোলহাসের সন্তুষ্টি সত্ত্বেও পাঠকের মন বিষাদে পূর্ণ হয়ে যায়। মনে প্রশ্ন থেকে যায়, আইন ভঙ্গ না করলে কি কোলহাস বিচার পেত? বিচার আপনি আসেনি। কোলহাস প্রিয়তমা পত্নীকে বিসর্জন দিয়েছে, কত প্রিয় সহচর প্রাণ হারিয়েছে, গ্রাম নগর পুড়েছে। আর সর্বোপরি, নিজের জীবন দিয়ে বিচার পেতে হয়েছে। আইন ভেঙে আইনের বিচার পাওয়া গেল।

আর যা-ই হোক, এটা সুবিচার নয়!

হাইনরিখ হাইনে

১৭৯৯—১৮৫৬

বয়সের প্রশ্ন উঠলে হাইনরিখ হাইনে প্রায়ই রহস্যময় হাসি হেসে উত্তর দিতেন, আমি উনিশ শতকের প্রথম মানুষ। প্রকৃতপক্ষে তাঁর জন্মের তারিখ ১৩ই ডিসেম্বর, ১৭৯৭। কিন্তু হাইনে দীর্ঘকাল তা জানতেন না। মা সযত্নে ছেলের কাছ থেকে আসল তারিখটি গোপন রেখেছিলেন।

হাইনের বাবা সামসন কয়েক বছর ডিউক অব কাম্‌বারল্যাণ্ডের চাকরি করবার পর ডুসেলডরফ-এ এসে কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করেন। সেই সূত্রে তাঁর পরিচয় হলো শহরের অভিজাত পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে। বেটি গেলডার্নের সঙ্গে পরিচয় ক্রমশঃ অন্তরঙ্গতায় পরিণত হলো। বেটি সম্পন্ন পরিবারের বুদ্ধিমতী তেজস্বিনী তরুণী। সরল এবং আর্থিক ব্যাপারে উদাসীন সামসন তাঁকে আকৃষ্ট করল। বেটি যখন সামসনকে বিয়ের প্রস্তাব করলেন, তখন পরিবার থেকে প্রবল বাধা উঠল। সামসনের আয় সামান্য, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। তাছাড়া সামসন ইহুদী হলেও ডুসেলডরফে অপরিচিত আগন্তুক, তাঁর বংশের ইতিহাস কারো জানা নেই। সুতরাং শুধু পরিবার থেকেই যে বেটি বাধা পেলেন তাই নয়, শহরের ইহুদী সম্প্রদায়ও এই বিবাহ-প্রস্তাবের বিরোধিতা করল। কিন্তু বেটির সঙ্কল্প অটল। তিনি সরকারের নিকট আবেদন জানালেন বিয়ের অনুমতি প্রার্থনা করে। আবেদন মঞ্জুর হবার পূর্বেই বেটির কোলে এল তাঁর প্রথম সন্তান, হাইনে। তাঁর জন্মের প্রায় এক মাস পরে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বিয়ের এক বছর পরে অর্থাৎ, ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হাইনের জন্ম হয়েছে বলে সবাইকে বলা হতো। হাইনে আর একটু বাড়িয়ে বলতেন ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম।

কিন্তু পিতৃকুল ও মাতৃকুলের কেউ হাইনের জন্মের ইতিহাসকে ভুলতে পারেনি। জন্ম বিয়ের পূর্বে হয়েছে, সুতরাং দুরপনেয় কলঙ্কের স্পর্শ লেগেছে তাঁর জীবনে। তাই আত্মীয়-স্বজন কেউ তাঁকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারেনি। শোচনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে যখন তাঁর দিন কেটেছে, তখনও ক্রোড়পতি আত্মীয়ের নিকট থেকে ভিক্ষার অধিক সাহায্য পাননি। কিন্তু এই কারণেই হয়তো মা তাঁকে সকল সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন এই ছেলে একদিন দেশজোড়া খ্যাতি লাভ করবে। আর হাইনেও প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন মাকে। নিজে মৃত্যুশয্যায় থেকেও কেবল মা'র কথা ভেবেছেন; যতদিন সম্ভব ছিল ততদিন নিজের হাতে তাঁকে চিঠি লিখেছেন। অন্য কেউ লিখে দিলে মা হয়তো ছেলের অমঙ্গল আশঙ্কা করে ব্যাকুল হবেন।

ছেলেবেলা থেকেই হাইনে অদ্ভুত সব স্বপ্নে মশগুল হয়ে থাকতেন। একবার তিনতলার খোলা জানলার সংকীর্ণ চৌকাঠের উপর বসে বসে দূরের আকাশ ও নীচে রাস্তার জনপ্রবাহ দেখতে দেখতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ পথিকদের চোখ পড়ায় তারা শিউরে উঠল। তিনতলা থেকে কঠিন রাস্তার উপর পড়লে কি হবে? মা কাঁপতে কাঁপতে এসে খপ করে দু হাতে ছেলেকে বুকে টেনে নিলেন। হাইনে মা'র উপর রাগ করলেন। স্বপ্নরাজ্যে বসে এমন সুন্দর কবিতাগুলি লিখছিলাম, তুমি ঘুম ভাঙিয়ে সব নষ্ট করে দিলে তো?

মা'র এক পূর্বপুরুষ আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের কতকগুলি দেশে ভ্রমণ করেছিলেন। মামাবাড়ি এলেই তাঁর ভ্রমণ সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত কাহিনী শোনা যেত। একদিন পুরনো কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গেল তাঁর দিনলিপি। হাইনে তা না বুঝলেও দিনলিপিটি নিয়েই থাকতেন। প্রাচ্যের প্রতি তাঁর মনে রোমান্টিক আকর্ষণ তখন থেকেই আরম্ভ হয়।

স্বপ্ন ও কল্পনা ছাড়া হাইনের বিচরণক্ষেত্র ছিল সংকীর্ণ। একদিন বাবার কাছ থেকে জানলেন তাঁরা ইহুদী। যেন মস্ত বড়

আবিষ্কার। স্কুলে বন্ধুদের নিকট বেশ গর্বভরে জানালেন তাঁর পরিচয়। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কেন্দ্র করে শুরু হয়ে গেল দক্ষযজ্ঞ। ঠাট্টা, তামাসা, পশু-পক্ষীর ডাক, দৈহিক লাঞ্ছনার আর বাকী রইলো না। কে একজন এক দোয়াত কালি ঢেলে দিয়ে গেল জামা-কাপড়ের উপরে। শিক্ষক বিচার করে দোষী সাব্যস্ত করলেন হাইনেকেই। রীতিমতো শাস্তি দেওয়া হলো। বালকের পিঠের আয়তনের তুলনায় বেত্রাঘাতের সংখ্যা অনেক বেশী হয়েছিল।

ইহুদী বলে অকারণে শাস্তি হবে কেন? বালকের মনে সেদিন যে প্রশ্ন জেগেছিল, সারাজীবন হাইনে তার উত্তর খুঁজে বেড়িয়েছেন। শুধু ইহুদিদের উপরে লাঞ্ছনার কথাই নয়, সকল মানুষের সর্ববিধ অপমানের বিরুদ্ধেই তিনি পরবর্তীকালে কলম ধরেছেন।

হাইনের জন্ম থেকে চোদ্দ-পনেরো বছর পর্যন্ত ডুসেলডরফ ছিল ফরাসী শাসনের অধীন। তাই স্কুলের শিক্ষায় ফরাসীর প্রভাব স্বাভাবিকরূপেই পড়েছিল। ফরাসী ও জার্মান সংস্কৃতির সমাবেশ হাইনের চরিত্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। অবশ্য এদের সমন্বয় ঘটানো তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। দুই সংস্কৃতির টানাপোড়েন তাঁকে সইতে হয়েছে আজীবন।

স্কুলে জেস্থইট পাদ্রিরা পড়াতেন। মুখস্থ করবার উপরে জোর দেওয়া হতো। পড়ায় না পারলে কিংবা সামান্য রীতিভঙ্গ করলেও পিঠে চাবুক পড়ত। নীরস পাঠ্যপুস্তকের প্রতি এবং নিরানন্দ ক্লাসের উপর হাইনের কোনো আকর্ষণ ছিল না। সুতরাং প্রায়ই চাবুক পড়ত তাঁর পিঠে।

পাঠ্যপুস্তকের বাইরেকার জগৎ তাঁকে আকৃষ্ট করত। সে জগতে গ্রীক পুরাণের দেব-দেবী, জার্মান উপকথা ও আইসল্যাণ্ডের সাগার পাত্রপাত্রীদের ভিড়। নেপোলিয়নের প্রতি আকর্ষণও কম নয়। পুরাণের কোন দেবতা যেন রূপ পরিগ্রহ করে পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। ইহুদী জাতির উপর যে অত্যাচার চলে আসছিল নেপোলিয়ন তার কিছু প্রতিকার করেছিলেন। প্রত্যেক ইহুদী এ

জন্য তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। হাইনে তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন কবিতায়। নেপোলিয়ন তখন অনেকেরই আদর্শ। তাঁর আদর্শ মনে করেই হাইনের মা স্থির করলেন, ছেলে সেনাবিভাগে যোগ দিয়ে যশের শিখরে উঠবে। কিন্তু অকস্মাৎ নেপোলিয়নের পতনের পর সেই স্বপ্ন ভেঙে গেল।

এর চেয়েও বড় দুর্ভাগ্য, রাজনীতিক্ষেত্রে অপ্রতিহত ক্ষমতা অবসান হবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবসায় জগতে বিপর্যয় দেখা দিল। একটু সরল এবং আমোদপ্রিয় সামসন এ বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। তাঁর ব্যবসা ফেল পড়ল। হাইনের তখন স্কুলের পড়া শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করবার সময়। ব্যবসা বন্ধ হবার পর পড়াও বন্ধ হয়ে গেল। বিপদ এল আর এক দিক থেকেও। মৃগী রোগের আক্রমণে বাবা একেবারে অকর্মণ্য হয়ে পড়লেন। তিনি অবশ্য বেশীদিন বাঁচেননি; কিন্তু তাঁর রোগযন্ত্রণা হাইনের মনে চিরদিনের জন্য গভীর ছাপ রেখে গেল।

শুভানুধ্যায়ীরা হাইনের জীবনের পথ স্থির করে দিলেন। ব্যবসায়ে নামতে হবে তাঁকে। ব্যবসা সম্পর্কে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে হাইনে হাম্‌বুর্গে যাত্রা করলেন। সেখানে আছেন তাঁদের আত্মীয় কোটিপতি সলোমন হাইনে। তাঁর কাছ থেকে শিখে নিতে হবে অর্থোপার্জনের সকল কূটকৌশল। হারিয়ে গেল পুরাণ, সাগা ও কবিতার কল্পলোক।

সলোমন কাকার দপ্তরে এক বছর কাজ শিখে হাইনে নিজের কোম্পানী খুলে বসলেন। কিন্তু আর এক বছরের মধ্যেই তাঁর কোম্পানী বন্ধ করতে হলো। সলোমন নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারলেন ভাইপোকে দিয়ে কখনো ব্যবসা হবে না। তিনি হাইনেকে আইন পড়বার জন্য পাঠালেন বন বিশ্ববিদ্যালয়ে।

একুশ বছর বয়সে হাইনে আইন পড়তে এলেন। কিন্তু আইনের বই সরিয়ে রেখে সর্বদা সাহিত্য, শিল্প ও দর্শনের বই নিয়ে দিন কাটাতেন। ভারত-বিদ্যার অধ্যাপক শ্লেগেলের সাহচর্যে এসে

আকৃষ্ট হলেন ভারতীয় সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থের প্রতি। ভারতের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ বন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় থেকেই আরম্ভ হয়।

এখানকার পরিবেশ হাইনের যতই ভালো লাগুক শুভানুধ্যায়ীরা দেখলেন আইন পড়া অগ্রসর হচ্ছে না। সুতরাং বন বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে যেতে হলো গোটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে শিক্ষা-ব্যবস্থা কঠোর; আইনের ছাত্র সাহিত্য নিয়ে ডুবে থাকবে তার সুযোগ নেই। শৃঙ্খলা রক্ষার নামে অবিচার করতেও কর্তৃপক্ষ কুণ্ঠিত হতেন না। কোনো রকম নেশা ছিল না বলে সতীর্থরা হাইনেকে ঠাট্টা করত। অথচ চরিত্রহীনতার অভিযোগে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় দেওয়া হলো।

এবার এলেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে দার্শনিক হেগেল এবং প্রাচ্য-বিদ্যাবিশারদ বপ্-এর সান্নিধ্যলাভের সুযোগ হলো। এ ছাড়া রাজধানীর বৃহত্তর বিচিত্র পরিবেশের বিচিত্র জীবন ও সংস্কৃতি-ধারার সঙ্গে পরিচিত হবারও সুযোগ পেলেন হাইনে। লেখার প্রেরণা পেলেন, আর রচনা প্রকাশের সুযোগও এল। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনের এক প্রকাশক বের করল তাঁর প্রথম কবিতার বই। সার্থকতার চেয়ে প্রতিশ্রুতি বেশী স্পষ্ট সেই কবিতা-সংগ্রহে। কাব্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে চলল প্রবন্ধ রচনা। সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়ে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেই সব লেখা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বাহিরের লেখক হিসাবে যশঃপ্রার্থী তরুণেরা ঈর্ষায় জ্বলে উঠল। হাইনে বার্লিনে নবাগত, তার উপরে তিনি ইহুদী। সুতরাং সাহিত্যিকের সম্মান পাবার যোগ্যতা তাঁর নেই। হাইনের নামে কুৎসা রটিয়ে, কাগজে নিন্দাবাদ ছাপিয়ে, কিল-ঘুষি দিয়ে এবং সর্বদা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে তরুণ সাহিত্যিক গুণ্ডারা তাঁর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল। তাঁর সে সময়কার মনের অবস্থা বন্ধুকে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যাবে: "By day I am pursued by perpetual suspicion and I keep on

hearing my name everywhere, followed by mocking laughter." শুধু কয়েকজন বন্ধুর সহৃদয় ব্যবহারের জন্যই হাইনে ছাত্রজীবনের এই গ্লানিকর যন্ত্রণা সইতে পেরেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার ব্যয় সলোমন আংশিক বহন করেছিলেন। বাকী অংশ সংগ্রহ করবার জন্য বেটি হাইনে বিক্রি করেছিলেন তাঁর অলংকার। আর্থিক অনটনের যাতনার সঙ্গে যোগ হয়েছিল অহেতুক অপমানের জ্বালা। ইহুদী বলে অপমানিত হয়েছেন, আর লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন ঈর্ষাকাতর তরুণ লেখকদের হাতে। কিন্তু এ সবের চেয়ে গভীরভাবে আঘাত করেছিল ব্যর্থ প্রেমের বেদনা। সলোমনের মেয়ে অ্যামেলিকে ভালোবেসেছিলেন হাইনে। তাঁর বিশ্বাস ছিল অ্যামেলিও তাঁকে নিশ্চয় ভালোবাসে। হাইনে কত স্বপ্ন দেখতেন অ্যামেলিকে কেন্দ্র করে। অ্যামেলি এমন কোনো কথা বলেনি বা ব্যবহার করেনি যা তাঁর স্বপ্নের রঙীন ছবি মুছে দিতে পারে। সুতরাং অন্যান্য ক্ষেত্রে যা-ই হোক, অ্যামেলিকে ঘিরে ছিল নিরবচ্ছিন্ন আশার পরিবেশ। অ্যামেলি বিচক্ষণ ব্যবসায়ীর উপযুক্ত কন্যার মতোই কাজ করল। পতিত্বে বরণ করল এক ধনী অভিজাত পরিবারের প্রার্থীকে। হাইনের বর্তমান অন্ধকার, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। তিনি বন্ধু হতে পারেন, জীবনের সঙ্গী হবার যোগ্যতা তাঁর নেই।

অ্যামেলির কাছ থেকে আঘাত পেয়ে হাইনের মনের গড়ন বদলে গেল। তিনি হয়ে উঠলেন সিনিক ও অবিশ্বাসী। একমাত্র ধনী বলেই যারা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তাদের প্রতি বিদ্বেষ জাগল। তাঁর সকল রচনায় ব্যর্থ প্রেমের বেদনা নানা রূপ নিয়ে ফিরে ফিরে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল।

হাইনের সকল মুখরতা ছিল কলমে। এমনিতে তিনি লাজুক। অনাত্মীয়া মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারতেন না। ছেলেবেলা থেকে নানা কারণে যে সব আঘাত পেয়েছেন তার ফলে হীনমন্যতায় ভুগছেন। অ্যামেলির পর আর কাউকে ভালোবাসার কথাও তখনো মনে আসেনি। তিনি প্রতি রাত্রিতে নতুন নতুন সঙ্গিনী খুঁজে

নিতেন প্রায়ান্ধকার রাস্তার কোণ থেকে। কোনো কোনো দিন জুয়া খেলে সর্বস্ব হারিয়ে আসতেন। প্রকৃতি প্রতিশোধ নিতে দেরী করল না। নানা রোগে জর্জরিত হয়ে পড়লেন হাইনে। এর মধ্যে মাথার তীব্র যন্ত্রণাটাই প্রধান।

দুটি নাটক বেরিয়েছে, কিন্তু সমাদর লাভ করল না। নাটক দুটির সঙ্গে ছিল একটি গীতিকাব্য। সেটি অনেক সমালোচকের প্রশংসমান দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। Lyrical Intermezzo (1823) গ্রীক কামদেবতা ও সাইকির মধ্যে ভালোবাসার জন্ম, বিশ্বাসঘাতকতা ও উভয়ের জীবনের ট্র্যাজেডির কাহিনী। অনেক আশা করে হাইনে গ্যেটের অভিমত প্রার্থনা করে এক কপি বই পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু গ্যেটে তার প্রাপ্তি পর্যন্ত স্বীকার করেননি।

ইহুদিদের যে সব নাগরিক অধিকার ছিল ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ান সরকার তা বাতিল করে দেন। এর ফলে হাইনে আইন পরীক্ষায় পাস করলেও ওকালতি করতে পারবেন না। একমাত্র খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেই এই অধিকার পাওয়া যেতে পারে। হাইনের মনে প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো তিনি বাপ-ঠাকুর্দার ধর্ম ত্যাগ করবার চেয়ে বরং দেশ ত্যাগ করে চলে যাবেন। কিন্তু কাকা উপদেশ দিলেন খ্রীষ্টান হতে ; কথা না শুনলে তাঁর টাকা বন্ধ হয়ে যাবে। আর্থিক পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাবার জন্য হাইনে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবে সিদ্ধান্ত করলেন খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করবার। এই সিদ্ধান্তের আরও একটা কারণ ছিল যা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে জানা যায়নি। অ্যামেলির ছোট বোন টেরেসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন হাইনে। তাঁর মনে হয়েছিল টেরেসও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট। তাই ভেবেছিলেন যে আর্থিক নিরাপত্তা টেরেসকে পাবার পথ সুগম করবে। বিবেকের বিরুদ্ধে হৃদয়ের দাবি জয়ী হলো। কিন্তু খ্রীষ্টান হবার কয়েক বছর পরে টেরেস বিয়ে করল এক ধনী যুবককে। প্রথমবারের মতো এবারকার আঘাতটা গভীর হলো না। আশা-

ভঙ্গটাই নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে তাঁর জীবনে।

হাইনে আইন ব্যবসায়কে কখনো আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেননি। শিক্ষকতা করেছিলেন কিছুকাল, কিন্তু তাঁর মতবাদের জন্য সে চাকরি রইল না বেশীদিন। তাঁর মনের মতো কাজ সংবাদপত্রের জন্য লেখা। মনের আবেগ এবং মতবাদ প্রকাশের সুযোগ পেয়ে তাঁর খুব ভালো লাগল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী জার্মান রাষ্ট্রের বিচারে তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদ বিপজ্জনক মনে হলো। সাধারণ পাঠকদের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল নানা কারণে। অশ্লীলতার অভিযোগ উঠল তাঁর ছোট উপন্যাস The Paths of Lucca-র বিরুদ্ধে। চারদিক থেকে এমন আন্দোলন উঠল যে, কিছুদিনের জন্য এই পরিবেশ থেকে দূরে থাকবার উদ্দেশ্যে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড গেলেন। সে দেশ তাঁর ভালো লাগেনি। ভালো লাগেনি ধোঁয়া আর ইংরেজ চরিত্রের সংকীর্ণতার জন্য। না হলে হয়তো ইংলণ্ডেই থেকে যেতেন।

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হলো 'বুক অব সঙ্গস্'। ছাব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত হাইনে যত গীতিকবিতা লিখেছেন, তার সংকলন। এখনও এই কাব্যগ্রন্থটি বিশ্ব-সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। কবিতাগুলি এমন সুন্দর করে সাজানো যে, এদের মধ্য থেকে কবির হৃদয়ের ক্রমবিবর্তনের ধারাটি উপন্যাসের কাহিনীর মতো বিবর্তিত হয়েছে। কবির জীবনের সঙ্গে, তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতির সঙ্গে, প্রতিটি কবিতা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কিন্তু কবির জীবনের পটভূমিকা না জানলেও ক্ষতি নেই। প্রত্যেকটি কবিতা পৃথকভাবে উপভোগ করতে পারা যায়। অবশ্য কবিতা হিসাবে নয়, গান হিসাবেই এরা জনপ্রিয়। জার্মানীতে আজও লোকের মুখে মুখে হাইনের গান শোনা যায়। অনেকেই হয়তো কবির নাম ভুলে গেছে; তাদের ধারণা, এগুলি লোক-গীতি। এই ধারণার কারণ আছে। হাইনের ভাষা লোক-গীতির মতোই একান্ত সরল। এমন সরল ভাষার আধারে হৃদয়ের

গভীরতম ও বিচিত্র অনুভূতি সঞ্চারের দৃষ্টান্ত বিরল। জার্মানীর বিখ্যাত সুরস্রষ্টারা সুরযোজনা করে দুর্লভ জনপ্রিয়তার শিখরে স্থান দিয়েছেন গানগুলিকে।

ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, ইতালী প্রভৃতি দেশ ভ্রমণের বৃত্তান্ত ভ্রমণ-চিত্র বা Reisebilder (১৮২৬-৩১) নামে ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়ে পাঠক-মহলে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করল। এই আলোড়ন প্রধানতঃ হাইনের রাজনৈতিক ও সামাজিক মতামত কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠল। জার্মানীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে একে একে তাঁর বই নিষিদ্ধ হতে লাগল রাজনৈতিক কারণে অথবা অশ্লীলতার অভিযোগে। হাইনের বিরুদ্ধে সমালোচনা যত তীব্র হতে লাগল ততই তিনি ডুবে যেতে আরম্ভ করলেন লাম্পট্যের অতল গহ্বরে। কুৎসিত রোগে শরীর জীর্ণ হলো। ত্রিশ বছর বয়সে ফুসফুস থেকে রক্ত পড়ল কয়েকবার। আর কদিন আয়ু আছে সে সম্বন্ধে চিকিৎসকরা সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

নিন্দাবাদের সঙ্গে সঙ্গে হাইনে লেখক হিসাবে খ্যাতিও অর্জন করেছেন। তাই 'জেনারেল পলিটিক্যাল অ্যানাল্স্' কাগজের কর্তৃপক্ষ তাঁকে নিযুক্ত করলেন সহযোগী সম্পাদকের পদে। হাইনে এই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করলেন ফরাসী বিপ্লবের মৌলিক আদর্শ প্রচার করবার জন্য। প্রাশিয়ান সরকার হাইনের এই নতুন অভিযানে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। সরকারীভাবে যখন হাইনেকে অবাঞ্ছিত বলে ঘোষণা করা হলো তখন কারারুদ্ধ হবার আশঙ্কায় তিনি পালিয়ে গেলেন প্যারিস। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে হাইনে দেশত্যাগ করলেন।

শুধু ভয় নয়, দেশত্যাগের পশ্চাতে হতাশাও ছিল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের আদর্শকে কার্যকর করবার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল 'ইয়ং. জার্মান' দল। হাইনে এই দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে যুক্ত ছিলেন এবং নিজের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করেও এদের আদর্শ সমর্থন করে বিভিন্ন পত্রিকায় ক্রমাগত প্রবন্ধ লিখেছেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে

তিনি হতাশ হয়ে লিখলেন: কোন ভূত আমার ঘাড়ে চেপেছিল যার তাড়নায় বই লিখেছি, পত্রিকা সম্পাদনা করেছি এবং সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি। সবই করেছি নির্বোধ জার্মান জাতিকে তার হাজার বছরের ঘুম থেকে জাগাবার জন্য। কিন্তু কতটুকু পেরেছি আমি? সে মুহূর্তের জন্য চোখ খুলল, হাই তুলল, আবার সে তার গর্তের মধ্যে আরো গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ল। আমার বিশ্রাম প্রয়োজন; কোথায় পাব বিশ্রাম? জার্মানীতে আর থাকা যাবে না।

কিন্তু এটা অভিমানের কথা। জার্মানীকে ভালবাসতেন প্রাণ দিয়ে। ফ্রান্স তাঁর স্বপ্নের দেশ, কিন্তু জার্মানী আছে রক্তের মধ্যে। প্যারিস গণতন্ত্রের পীঠভূমি, এ কালের জেরুজালেম। অল্পদিনের মধ্যেই বন্ধুত্ব হলো ভিনি, লা মার্তিন, গোতিয়ের, তুমা, জর্জ সাঁদ প্রভৃতির সঙ্গে। ফরাসী নাগরিকত্ব গ্রহণ করবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলো। কিন্তু হাইনে এ প্রস্তাবে সম্মত হতে পারলেন না। তুমা বলেছেন: জার্মানী হাইনেকে যদি না চায় তবে ফ্রান্স তাঁকে মাথায় করে রাখবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় জার্মানীকে তিনি এত বেশী ভালবাসেন যা পাবার যোগ্যতা তার নেই।

যে সব বিশিষ্ট বিদেশী নাগরিক প্যারিসে স্থায়িভাবে বসবাস করতেন তাঁদের ফরাসী সরকার অল্প পরিমাণ বৃত্তি দিতেন। হাইনে সেই বৃত্তি পেলেন। প্যারিসে থাকবার এইটে হলো তাঁর প্রধান ও নিশ্চিত অবলম্বন। সাময়িক পত্রিকায় লিখেও কিছু উপার্জন হতো। প্যারিস থেকে লেখা পাঠাতেন বিভিন্ন জার্মান পত্রিকায়। কয়েক মাস পর থেকে ফরাসী পত্রিকায়ও তাঁর লেখার অনুবাদ বেরুতে লাগল। মনে মনে কতবার সংকল্প করেছেন, এখন থেকে কবিতা লিখবেন। কিন্তু সে সংকল্প সফল হয়নি। প্রবন্ধ লিখে টাকা উপার্জন করবার তাগিদ ছাড়া ছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রশ্ন সম্পর্কে নিজের মতামত প্রকাশের প্রেরণা। ফ্রান্সে এসেও জার্মানীর আভ্যন্তরীণ সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন থাকা সম্ভব ছিল না। প্যারিসে জার্মান

আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা কম নয়। তারা প্রায়ই হাইনের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আসত। আর জার্মানীর গুপ্তচররাও ঘুরত তাঁর পিছে পিছে। তাই জার্মানীকে কেন্দ্র করে তর্ক, মতবিরোধ ও উত্তেজনার পরিবেশ হাইনের অনুভূতিপ্রবণ মন বিচলিত করে তুলত। এই মানসিক অবস্থায় প্রবন্ধ লিখে বিতর্কের উত্তেজনা অনুভব করা চলে, কবিতার কল্পলোকে প্রবেশ করা যায় না। অথচ যে জার্মানীর জন্য তাঁর হৃদয় উন্মুখ হয়ে থাকত তার সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক ছিল না। 'প্রবাসে' কবিতায় হাইনে লিখছেন :

A lovely fatherland was once my own ;
The oaks, I deem,
Grew taller there, and sweet the violets blew.
It is a dream,
Kisses were German, German too the word
(And they did seem
Tuneful beyond belief) : "I love you true."
It was dream.

প্যারিসে আসবার পর কিছুদিন হাইনের শরীর বেশ ভালোই ছিল। পরিচিত অনেকেই তাঁর সুন্দর দেহসৌষ্ঠবের কথা উল্লেখ করেছে। কিন্তু তাঁর সুন্দর চেহারা এবং কবিখ্যাতি কোনো মেয়েকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। অভিজাত পরিবারের কয়েকজন মহিলার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে; কিন্তু বন্ধুত্বের গণ্ডী অতিক্রম করে গভীর অন্তরঙ্গতার জন্য কেউ ব্যাকুল হয়নি। হয়তো হাইনের লাজুক স্বভাব এবং হীনমন্যতাই এর জন্য দায়ী।

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এক জুতোর দোকানে ঢুকে উনিশ বছরের বিক্রয়িত্রী তরুণীকে দেখে মুহূর্তের মধ্যে মুগ্ধ হলেন হাইনে। সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী এবং জীবনের প্রতিমূর্তি এই মেয়েটি। মা'র অবৈধ সন্তান; মাসীমার দোকানে সামান্য বেতনের চাকরি নিয়ে

আশ্রয় পেয়েছে। সামান্য অক্ষরজ্ঞান আছে মাত্র। বই পড়ে আনন্দ পাবার ক্ষমতা নেই। জানে না অভিজাত সমাজের রীতিনীতি। হাইনের এই মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে আত্মপ্রত্যয় জাগল। সব দিক থেকেই ইউজেনি মিরাতে তাঁর চেয়ে ছোট।

কয়েকদিন মেলামেশার পর হাইনে উপলব্ধি করলেন তিনি বন্দী হয়েছেন মিরাতের হাতে। এই গভীর সর্বনাশা আকর্ষণের বন্ধন থেকে তাঁর মুক্তি নেই। হৃদয় আত্মসমর্পণ করলেও বিচারবোধ তখনও হার মানেনি। প্যারিসে থাকলে তাঁর মুক্তি নেই। তাই পালিয়ে গেলেন প্যারিসের বাইরে, মিরাতের কাছ থেকে দূরে। কয়েক মাস মফঃস্বলে থেকে মনে হলো আর ভয় নেই, আকর্ষণ শিথিল হয়েছে। কিন্তু প্যারিসে ফিরে এসেই সব যুক্তি ভেসে গেল; মিরাতকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না তিনি। মিথ্যা এই এড়িয়ে পালানোর চেষ্টা।

প্রায় হাজার তিনেক টাকা মাসীর হাতে দিয়ে মিরাতকে পাওয়া গেল। আদর করে নাম রাখলেন, মাতিলদে। ঘরকন্নার কাজে সে ছিল একান্ত আনাড়ী। ভালো করে রাঁধতে পারত না। কিন্তু সাজপোশাকের প্রতি ছিল প্রবল আকর্ষণ। হাইনের আর্থিক অবস্থা বোঝবার ক্ষমতা ছিল না তার। কেবল টাকা, আরো টাকার জন্য বায়না। নিজের খেয়ালখুশিতে সে টাকা উড়িয়ে দিত কয়েক মুহূর্তে। সকল প্রকার আমোদ-প্রমোদে যোগ দিয়ে হৈ-হল্লা করবার জন্য সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকত। নাচের আসর ছিল মাতিলদের খুব প্রিয়। কোনো অপরিচিত যুবকের সঙ্গে সে যখন আত্মহারা হয়ে নাচত, তখন হাইনে ঈর্ষা অনুভব করতেন। কিন্তু কিছু বলতে গেলেই মাতিলদে চিৎকার করে একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুলবে। সভ্য সমাজে বাস করতে গেলে যে সংযম ও ধৈর্যের প্রয়োজন মাতিলদের তা নেই। একবার প্যারিসের বাইরে বেড়াতে গেছেন; মাতিলদে সঙ্গে নিয়ে গেছে তার আদরের টিয়াপাখি। হঠাৎ একদিন খাঁচা থেকে পাখি উড়ে গেল। মাতিলদে তার পাখির জন্য পাগল হয়ে

ছুটতে লাগল সারা গ্রামে এবং আশেপাশের ঝোপে-জঙ্গলে। ওখানে সৈন্যদের একটা ছাউনি ছিল। মাতিলদের অবস্থা দেখে কয়েকজন সৈন্য দয়া করে ধরে দিল পাখিটা। হাইনে তো ওকে শান্ত করবার আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন।

মাতিলদের চোখে কবি হিসাবে হাইনের কোনো বিশেষ মর্যাদা ছিল না। হাইনের মনে এই নিয়ে ক্ষোভ ছিল। লেখাপড়া শিখে যাতে তাঁর কবিসত্তাকে বুঝতে পারে এবং স্বভাব ও আচরণের পরিবর্তন হয়, এই উদ্দেশ্যে বোর্ডিং-স্কুলে পাঠানো হলো মাতিলদেকে। বিশেষ লক্ষ্য ছিল ওকে জার্মান ভাষা শেখানো। তাহলে হাইনে তাঁর লেখার কাজে কিছু সহায়তা পাবেন বলে আশা করেছিলেন। কিন্তু স্কুলে পড়েও কোনোই উপকার হলো না। অপরিবর্তিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই মাতিলদে ফিরে এল।

প্রথম কিছুদিন হাইনে মাতিলদেকে দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করতে পারেননি। মাঝে মাঝে অনুশোচনা হয়েছে কেন নিজেকে এমন একটি মেয়ের সঙ্গে জড়িয়েছেন। অসংকোচে মাতিলদেকে গ্রহণ করতে পারেননি বলেই গোড়ার দিকে অনেকের মুখ বন্ধ করতে হয়েছে টাকা দিয়ে। তারা ভয় দেখাত, আমরা প্রকাশ করে দেব তোমার কলঙ্কময় জীবনের কথা ; জার্মানীর কাগজে ছাপিয়ে দেব মাতিলদের কাহিনী। ফরাসী সরকারের সামান্য বৃত্তিই প্রধান ভরসা। ধুরন্ধর প্রকাশক জার্মানীতে ; প্যারিসে বসে তার কাছ থেকে প্রাপ্য টাকা আদায় করা দুরূহ ব্যাপার। মাতিলদে এসব কিছু বোঝে না, দু' হাতে খুশিমতো টাকা খরচ করতে না পারলে তার মেজাজ বিগড়ে যায়। তার উপর আছে যারা মাতিলদের কথা তুলে ভয় দেখায়, তাদের ঘুষ দেওয়া।

কিন্তু ক্রমশঃ সকল দ্বিধা দূর হয়ে মাতিলদে তাঁর জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত হয়ে গেল। চপলতা সত্ত্বেও মাতিলদের চরিত্রে এমন এক আদিম বিশ্বস্ততা ছিল যা হাইনেকে অভিভূত করত। হাইনের দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যহীনতা এবং মৃত্যুর পূর্বে আট বছরের পঙ্গুত্ব

সত্ত্বেও মাতিলদে কখনো তাঁকে ত্যাগ করে যাবার কথা ভাবেনি। এমন কি তাঁর মৃত্যুর পরে কয়েকবার বিয়ের প্রস্তাব এলেও সম্মত হয়নি মাতিলদে।

মাতিলদের প্রাণোচ্ছলতা হাইনের সমস্যাসংকুল অন্ধকার জীবনে সূর্যালোকের কাজ করত। হাইনের রচনায় মাতিলদে জীবনের প্রতিমূর্তি হিসাবে বারবার দেখা দিয়েছে। কবি তাঁর প্রণয়িনী সম্বন্ধে বলেছেন :

"I love her with o'erwhelming might,
A power beyond frustrating,
Like to the wildest cataract
Whose force knows no abating."

বাইরে থেকে দেখে সকলেরই মনে হতো হাইনের স্বাস্থ্য প্যারিসে এসে ভালো হয়েছে। কিন্তু ধীরে ধীরে এক মারাত্মক ব্যাধি যে তাঁকে ক্রমশঃ অকর্মণ্য করে তুলবার আয়োজন করছে তা তিনি নিজেও প্রথম বুঝতে পারেননি। যখন বাঁ হাতের দুটি আঙুল অকর্মণ্য হয়ে পড়ল তখনও তেমন আশঙ্কা হয়নি তাঁর। কিন্তু ১৮৩৭ সালের মাঝামাঝি নাগাদ বাঁ হাতটি কনুই পর্যন্ত শুকিয়ে সরু হয়ে গেল। দেশে থাকতে যে প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণায় ভুগতেন তা নতুন করে আক্রমণ করল, আর চোখের দৃষ্টি হারিয়ে যেতে লাগল ধীরে ধীরে। ডান চোখের দৃষ্টি একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল কিছু দিনের জন্য। বাঁ চোখের দৃষ্টিও ঝাপসা হয়ে এসেছে, চোখের পাতা বন্ধ হয়ে থাকে ; পাতা টেনে ধরে অস্পষ্ট দেখতে পান। অবশ্য চিকিৎসা করে সাময়িক উপকার পাওয়া গেল। কিন্তু এর পর থেকে ফিরে ফিরে কিছু দিনের জন্য দৃষ্টিহীনতায় ভুগতেন।

জার্মান উদ্বাস্তুদের মধ্যে এবং এমনিতেও হাইনের শত্রুর সংখ্যা কম ছিল না। রাজনৈতিক মতবিরোধ এবং সাহিত্যিক ঈর্ষা ছিল এর প্রধান কারণ। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ষ্ট্রস্ নামক এক ব্যক্তি জার্মানীর কাগজে বিজ্ঞাপন দিল যে প্যারিসের রাজপথে সে হাইনের

কান মলে দিয়েছে। এই ঘটনা যারা দেখেছে এমন কয়েকজন সাক্ষীর নামও ছাপিয়ে দেওয়া হলো। ফ্রান্স ও জার্মানীতে এমন একটি মুখরোচক খবর নিয়ে আরম্ভ হলো তুমুল আলোচনা। হাইনে সহজেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। এমন একটা মিথ্যা রটনায় যে তিনি ধৈর্য হারাবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? তিনি স্ট্রস্‌কে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান জানালেন।

এই যুদ্ধের পরিণতি কি হবে কে জানে? মৃত্যু হতে পারে। তাঁর মৃত্যুর পর মাতিলদের কি হবে? স্ত্রী হিসাবে সে মর্যাদা লাভ করেনি; তার জন্য টাকা রেখে যাওয়াও সম্ভব নয়। এখনই দিন চলে না; ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করবার বিন্দুমাত্র আশা নেই। অন্ততঃ মাতিলদেকে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। তাই দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য নির্দিষ্ট তারিখের ঠিক এক সপ্তাহ পূর্বে আনুষ্ঠানিক ভাবে হাইনে মাতিলদেকে বিয়ে করলেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধ শেষ পর্যন্ত বেশী দূর গড়ায়নি।

এর পর থেকে হাইনের একমাত্র চিন্তা হলো মাতিলদের জন্য কিছু সংস্থান করে যাওয়া। প্রকাশককে রচনাবলীর স্বত্ব দিলেন এই শর্তে যে, সে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়ে যাবে মাতিলদেকে। টাকার পরিমাণটা অবশ্য খুবই অল্প। ক্রোড়পতি কাকা সলোমন এবং তাঁর ছেলের নিকট অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছেন মাতিলদেকে যেন একটা ভাতা দেওয়া হয় তাঁর অবর্তমানে। আত্মসম্মানবোধ ক্ষুণ্ণ করেও তিনি মাতিলদের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। দেহ যত অপটু হতে লাগল ততই মাতিলদের জন্য তাঁর দুশ্চিন্তা তীব্রতর হলো।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হাইনে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। হাত-পা অবশ; এক চোখ অন্ধ; পিঠ জুড়ে উন্মুক্ত ঘা। মেঝের ওপর বিছানার চার পাশে বই, কাগজ-কলম ইত্যাদি ছড়ানো। নিজের চেষ্টায় উঠে বসতে পর্যন্ত পারেন না। এই "শয্যা-কবরে" তিনি কাটিয়েছেন দীর্ঘ আট বছর। মাঝে মাঝে অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার

করে উঠতেন। মরফিয়া ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী। উন্মুক্ত ঘায়ে মরফিয়ার আরক মেখে যন্ত্রণা লাঘব করতে হতো। মাতিলদে সেবা করতে মোটেই পটু ছিল না। সুন্দরী তরুণী নার্স এল একবার। তার সেবায় হাইনে খুব সন্তুষ্ট। কিন্তু মাতিলদের ঈর্ষা এমন প্রবল হলো যে নার্সকে বিদায় না দিয়ে উপায় রইল না।

আশ্চর্য এই যে, এই 'শয্যা-কবরে' শুয়ে শুয়ে যা রচনা করেছেন, সমালোচকদের মতে তা-ই হলো হাইনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। হাইনে লিখেছেন অনেক—ভ্রমণ-কাহিনী, সাহিত্য-সমালোচনা, নভেলেট, নাটক ও কবিতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই হলো—ভ্রমণ চিত্র (১৮২৬-৩১); জার্মানীর দর্শন ও সাহিত্য (১৮৩৪); রোমান্টিক স্কুল (১৮৩৬), দি বুক অব সঙ্গস্‌ (১৮২৭); আটাট্রল (১৮৪৭); রোমানসেরো (১৮৫১); এবং শেষ কবিতা (১৮৫৩-৫৪)।

হাইনে আজও বেঁচে আছেন কবি হিসাবে। তাঁর 'দি গ্রেনাডিয়েরস' ও 'লরেলি' গাথাকাব্য দুটি এখনও জার্মানীতে লোকের মুখে মুখে শোনা যায়। তাঁর অসংখ্য গান লোকের মুখে মুখে গীত হলেও অনেক ক্ষেত্রেই রচয়িতার নাম লোকে ভুলে গেছে। মেণ্ডেলসন, স্যুমান ও স্যুবার্ট তাঁর কবিতায় সুর সংযোজন করে জনপ্রিয় করেছেন। হাইনের কবিতায় আছে বিচিত্র অনুভূতির দ্বন্দ্ব। তিনি একাধারে রোমান্টিক, বাস্তববাদী এবং নিরাশাবাদী; একই সঙ্গে পাই তাঁর উদারতা ও সংকীর্ণতার পরিচয়। 'আটাট্রলে'র নায়ক ভালুককে দিয়ে শিলার প্রমুখ জার্মান রোমান্টিকদের বিদ্রূপ করাচ্ছেন; অথচ তাঁর কবিতায় রোমান্টিসিজমের অভাব নেই। ভারতের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও গৌরবময় অতীতের প্রতি হাইনের যে আকর্ষণ তারও মূলে রোমান্টিসিজম। হাইনের রচনায় পরস্পর-বিরোধী অনুভূতির এমন সমাবেশ ঘটেছে যে তাঁকে আধুনিক দ্বন্দ্ব-সংকুল মানসিকতার প্রথম প্রবক্তা বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

নীটশে হাইনে সম্বন্ধে বলেছেন যে তিনি হলেন "highest conception of a lyrical poet"; আর তাঁর কবিতা হলো

"Sweet and passionate music." কিন্তু হাইনে নিজে কবি-খ্যাতির জন্য উৎসুক ছিলেন না। মানুষের মুক্তির জন্য যে আজীবন সংগ্রাম করেছেন, এই কথা স্মরণ রাখবার জন্য তিনি অনুরোধ করে গেছেন; তিনি বলেছেন:

I am the sword, I am the flame.
I brought light into your darkness, and when
the battle began,
I fought in your van, in the first row.

তিনি যে মৃত্যু পর্যন্ত সংগ্রাম করেছেন তার প্রতীক হিসাবে তাঁর কবরে একটি তরবারি রাখবার জন্য বন্ধুদের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এই সংগ্রামে হাইনের প্রধান অস্ত্র ছিল লেখনী। তাই তাঁর রচনার এক বৃহৎ অংশ সাংবাদিকতার উপরে উঠতে পারেনি। কার্ল মার্ক্স যখন প্যারিসে ছিলেন তখন হাইনের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা হয়। এই সংগ্রামী কবিকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। আর এই কারণেই শেক্সপীয়র, তলস্তয়, গোর্কির সঙ্গে হাইনের মূর্তিও মস্কো শহরে দেখা যায়।

ফেব্রুয়ারি ১৮৪৮ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ পর্যন্ত দীর্ঘ আট বছর হাইনে তাঁর শয্যার কবরে শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করেছেন। সেই প্রতীক্ষার যন্ত্রণা মৃত্যুর চেয়ে সহস্র গুণ ভয়ংকর। মাঝে মাঝে আত্মহত্যার কথা মনে হতো, কিন্তু হাত-পা অবশ, নিজের মৃত্যু ডেকে আনবার ক্ষমতাটুকুও নেই। ঘনিষ্ঠ কোনো বন্ধু খানিকক্ষণ গল্প করে যখন চলে যেত তখন হাইনের ছ'চোখ বেয়ে জলের ধারা নামত। মনে হতো আবার তিনি মৃত্যুযন্ত্রণার মুখোমুখি একা দাঁড়িয়েছেন। মরফিয়া আর কবিতা ছিল তাঁর একমাত্র সঙ্গী। মুখে মুখে কবিতা বলে যেতেন, কেউ লিখে রাখত। নিজের অবস্থা সম্বন্ধে লিখেছেন:

How slowly Time, the horrid snail
Seems on his tardy way to crawl,

While I, a prisoner of one spot,
Languish and cannot move at all !
No sunbeam, not a ray of hope
Reaches my cell to pierce the gloom :
I know that for the grave alone
I shall exchange this hateful room....

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে অকস্মাৎ একঝলক সূর্যালোক প্রবেশ করল তাঁর অন্ধকার ঘরে। হাইনে বলতেন, তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে ; দেহটা এখনো কবর দেওয়া হয়নি। সেই মৃতকল্প দেহে শেষবারের মতো প্রাণের স্পন্দন জেগে উঠল।

ক্যামিলা সেলডেনের নাম প্যারিসে একেবারে অপরিচিত নয়। বছর পঁচিশ বয়স ; আকর্ষণ করবার মতো মোহ আছে চেহারায়। মা'র অবৈধ সন্তান সে। তার প্রেম, বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের গুজবে অনেক আড্ডা তখনো মুখরিত। ১৮৫৫ সালের জুন মাসে ক্যামিলা হাইনেকে দেখতে এল। পর্দা সরিয়ে ক্যামিলা মুগ্ধ হয়ে গেল। আর কিছুই সে দেখতে পেল না ; দেখল শুধু হাইনের অপূর্ব সুন্দর মুখ। সে মুখে রোগ বা বয়সের ছাপ নেই। ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীষ্টের মুখের চেহারা মনে পড়ে ক্যামিলার ; শুধু হাইনের ঠোঁটে লেগে আছে মেফিস্টোফেলিসের হাসি। তফাৎ এইটুকু। সেদিন থেকে ক্যামিলা মৃত্যুপথযাত্রী কবির অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়ে গেল। তাঁর জীবনের শেষ বসন্ত ; শেষ সূর্যোদয় ; অন্তিম ভালবাসা। শীত-তাড়িত শরতের শেষ ফুল। ক্যামিলা তাঁর কাছে বসে গল্প করত ; অশক্ত হাত দুটি নিজের উষ্ণ হাতের মধ্যে নিয়ে নীরবে বসে থাকত। আবার যখন হাইনে কিছু রচনা করতেন তা লিখে রাখত। জীবনের শেষ ক'মাস আত্মচরিতটি শেষ করে যাবার জন্য হাইনে বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। প্রায় শেষ হয়েছিল ; কিন্তু ছাপা হয়েছে সামান্য অংশ—হাইনের জীবনের প্রথম দিকের কথা। বাকী অংশ তাঁর আত্মীয়স্বজনরা ধ্বংস করে ফেলেছিল। হাইনে যে-সব অপ্রিয় সত্য

লিখে গিয়েছিলেন তার প্রচার বন্ধ করতে চেয়েছিল তারা।

১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬। হাইনে তাঁর নার্সকে বললেন আর দিন চারেকের মধ্যেই আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ স্মৃতিকথা শেষ হবে। পরদিন সকাল থেকে যন্ত্রণায় মাথা যেন ফেটে পড়তে চায়; তবু তার মধ্যেও বৃদ্ধা মা'র কথা মনে পড়ছে। জার্মানীর এক ছোট শহরে ছেলের সংবাদের অপেক্ষা করছেন তিনি। আক্ষেপ করে হাইনে বললেন, আজ আর মা'র কাছে চিঠি লেখা হবে না।

১৬ই ফেব্রুয়ারি বিকেল বেলা হাইনে চুপি চুপি তিনবার বললেন, লেখ, লেখ, লেখ…। তাঁর শেষ কথা—'কাগজ-পেন্সিল।'

রবিবার। ক্যামিলার নিজের শরীর ভালো নয়। বিছানায় শুয়ে আছে চোখ বুঁজে। কিছুক্ষণ হলো ভোর হয়েছে। হঠাৎ মনে হলো যেন একটা বড় প্রজাপতি ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে; কাচের জানলা ভেদ করে পথ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

হাইনের ঘরে যখন এসে পৌঁছল তখন প্রজাপতি পথ পেয়েছে, সে উড়ে চলে গেছে।

ক্যামিলা চেয়ে দেখল নার্স দেয়াল-পঞ্জীটা বদলে দিয়েছে। সেদিনের তারিখ ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬। সাহিত্যের ইতিহাসে কাল এই ঘরের ক্যালেণ্ডারের তারিখ পালটানো হলো কিনা তা কেউ জানতে চাইবে না।

হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডারসেন

১৮০৫—১৮৭৫

অ্যান মেরি নদীর ঘাট থেকে কাপড় কেচে সবেমাত্র ঘরে ফিরেছে। জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা সাদা হয়ে গেছে। ভিজে কাপড়টা তখনো ছাড়া হয়নি। এক জিপসী মেয়ে এসে দাঁড়াল ভিক্ষাপ্রার্থী হয়ে। মেরি বলল, বেশ, ভিক্ষা দেব, কিন্তু তার আগে আমার ছেলের হাত দেখে দাও।

জিপসীরা ভবিষ্যৎ গুণে বলে দিতে পারে। ওরা এলে সবাই হাত দেখাবার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে। ছেলেটিকে দেখলেই মন বিরূপ হয়। লম্বা সরু সরু হাত-পা; লম্বা ছাঁদের মুখ। কুৎসিত। কোথাও লাবণ্যের ছোঁয়া নেই।

জিপসী গুণে বলল, এই ছেলে বড় হয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করবে, দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে তার নাম। একদিন তোমাদের এই শহর একে অভিনন্দিত করবার জন্য আলোকমালায় সজ্জিত হবে।

মা'র মন গর্বে ভরে যায়। পাড়ার সবাইকে ভবিষ্যদ্বাণী শোনায়। ওরা আড়ালে হাসে। যার মা ধোপানী, বাবা মুচি, যার জামা নেই, খাবার নেই, যে এমন কুশ্রী দেখতে—সে হবে খ্যাতিমান পুরুষ! সবাই তাই নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। কিন্তু বিদ্রূপের বাণ মা'র অন্ধ স্নেহের তুর্গ ভেদ করতে পারে না। মেরি স্বপ্ন দেখে।

মেরি অনেক দুঃখের মধ্য দিয়ে মানুষ হয়েছে। খুব অল্প বয়সেই বাবা তাকে রাস্তায় পাঠিয়ে দিত ভিক্ষা করতে। শূন্য হাতে বাড়ি ফিরলে মার খেতে হত। বিয়ে হবার পরও দারিদ্র্য দূর হয়নি। স্বামী তার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। মুচির কাজ করে; কিন্তু কাজে দক্ষতা নেই। তাই উপার্জন বেশী হয় না। স্বামীকে সাহায্য করবার জন্য মেরি কাপড় ধুয়ে কিছু উপার্জন করে।

ডেনমার্কের অন্তর্গত ছোট একটি গ্রাম; নাম ওডেন্স। সেই গ্রামের জীর্ণ এক গৃহে মেরি তার স্বামী অ্যাণ্ডারসেনকে নিয়ে সংসার পেতেছে। একটি মাত্র ছোট ঘর। তার মধ্যেই খাওয়া-শোওয়া আর জুতো সেলাই করা। ১৮০৫ সালের ২রা এপ্রিল এই ঘরে জন্ম হলো তাদের প্রথম সন্তানের। মেরির নতুন কাজ হলো এবার থেকে। ছেলেকে কেন্দ্র করে স্বপ্নের জাল বোনে। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে জন্ম হয়েছে বলে মেরির প্রথম থেকেই বিশ্বাস হয়েছিল যে ছেলে যশস্বী হবে।

ছেলের নাম হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডারসেন। মা চলে যায় নদীর ঘাটে কাপড় কাচতে। ছেলে বাবার সামনে বসে থাকে, চুপ করে কাজ দেখে। একটু বড় হবার পর থেকে বাবা ছেলেকে গল্প শোনাতে আরম্ভ করল। কাজ করতে করতে গল্প শোনায়। অ্যাণ্ডারসেন মুগ্ধ হয়ে শোনে। তার সবচেয়ে ভালো লাগে আরব্য উপন্যাসের গল্প।

দারিদ্র্যের জন্য পড়া বন্ধ করে মুচির কাজ আরম্ভ করতে হয়েছে বলে অ্যাণ্ডারসেনের বাবা ক্ষুব্ধ। বই পড়তে তার ভালো লাগে, ভালো লাগে কল্পনার জগতে বিচরণ করতে। ছেলে বাবার স্বভাব পেয়েছে। বাবার মুখ থেকে রূপকথা শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যায়, খেলাধুলায় আকর্ষণ নেই।

ঠাকুমা থাকত একটু দূরে। অ্যাণ্ডারসেন তার মুখ থেকেও গল্প শুনতে ভালোবাসত। ঠাকুমার গল্পের ভাণ্ডার অফুরন্ত। নানা দেশের বিচিত্র রূপকথার কাহিনী ছিল সেই ভাণ্ডারে। কদাচিৎ মা-বাবার সঙ্গে থিয়েটারে যাবার সুযোগ ঘটত। অভিনয় দেখে অ্যাণ্ডারসেন একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠত, সহজে সে উন্মাদনা থামত না। ওডেন্সের পথের দু'পাশে যা-কিছু দেখত সবই রহস্যময় মনে হতো অ্যাণ্ডারসেনের। গাছ, পাতা, ফুল, পাখি, ব্যাঙ—সকলেরই যেন একটি গল্প আছে। সেটি জানবার জন্য অ্যাণ্ডারসেনের মন ব্যাকুল হয়ে উঠত।

শস্য কেটে নেবার পর মাঠে সামান্য যা কিছু পড়ে থাকত তা কুড়োবার জন্য গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে কখনো কখনো মেরিও যেত। মা'র সঙ্গে অ্যাণ্ডারসেন কয়েকবার মাঠে গেছে। একদিন স্থানীয় সরকারী কর্মচারী মাঠ থেকে শস্য নিতে দেখে তাড়া করে এল। মেরি এবং অন্যান্য মেয়েরা পালিয়ে গেল, অ্যাণ্ডারসেন ধরা পড়ল। কর্মচারী যখন তাকে মারতে উদ্যত হয়েছে, তখন বিস্মিত কণ্ঠে অ্যাণ্ডারসেন বলে উঠল, ভগবানের চোখের সামনেই আমাকে মারবে? অর্থাৎ, ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান, কোনো অন্যায় ব্যবহার করলে তিনি দেখতে পাবেন। বালকের এমন সরল ও আন্তরিক উক্তিতে কর্মচারী লজ্জিত হয়ে তাকে ছেড়ে দিল।

য়ুরোপে নেপোলিয়ন তখন উল্কার মতো উদয় হয়েছেন। তাঁকে ঘিরে যত ভয়, বিস্ময়ও তার চেয়ে কম নয়। অ্যাণ্ডারসেনের বাবার মনে হলো রূপকথার রাজ্য থেকে একটি অবিশ্বাস্য চরিত্র পৃথিবীতে এসে জন্মগ্রহণ করেছে। নেপোলিয়নকে ঘিরে রূপকথাসুলভ যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তা মুগ্ধ করল তাকে। অন্ধকার ঘরের কোণে বসে ছেঁড়া জুতো সেলাই করে দিন কাটানো দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। স্থির করল নেপোলিয়নের নেতৃত্বে যুদ্ধ করবে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনকে উপভোগ করবে। শত অনুনয়েও তার সংকল্প অটুট রইল। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই সে বাড়ি ফিরে এল। যুদ্ধ করবার সুযোগ হয়নি, আর তার আদর্শ পুরুষ নেপোলিয়নকে এক বার চোখের দেখাও দেখতে পায়নি। অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে। দিন তিনেক পরেই মৃত্যু হলো। মা ছেলেকে বলল, তুহিন-কুমারী তোমার বাবাকে নিয়ে গেছে; তাকে আর ডেকো না।

বাবার যখন মৃত্যু হলো তখন অ্যাণ্ডারসেনের বয়স এগারো। ঢ্যাঙা চেহারা, কোথাও বিন্দুমাত্র স্নিগ্ধতার স্পর্শ নেই। গ্রামের পাঠশালায় যায়। পাঠ্য-বই পড়বার আগ্রহ নেই। এক লাইন শুদ্ধ করে লিখতে পারে না। ব্যাকরণ আর বানানের ভুল অসংখ্য। কিন্তু গল্পের বই পেলে আর কথা নেই। ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব কিছু ভুলে

যায়। তবে বই পাওয়া যায় না। একদিন এক দোকানী তাকে বলল, এই টুপীটা যদি আমার খদ্দেরের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে পার তাহলে তোমাকে একটা পয়সা দেব। রাজী হলো।

সুন্দর একটি বাড়ি। এক বিধবা থাকেন। বসবার ঘরে বই ভর্তি। এত বই অ্যাণ্ডারসেন একসঙ্গে কখনো দেখেনি। অ্যাণ্ডারসেন পরিবেশ ভুলে গেল, বার বার বলতে লাগল, আমি পড়ব, আমি পড়ব। ভদ্রমহিলা তো অবাক! সম্পূর্ণ অচেনা এই কুরূপ বালকটির বইয়ের উপর এমন লোভ তাঁকে মুগ্ধ করল। তিনি হ্যাম্‌লেটের ড্যানিশ অনুবাদ তার হাতে দিয়ে বললেন, এটা পড়া শেষ হলে আবার এসো।

অ্যাণ্ডারসেন হ্যাম্‌লেটের সব কথা বুঝল না। কিন্তু হ্যাম্‌লেটের কাহিনী তার মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করল। হ্যাম্‌লেট পড়ে লেখার প্রেরণা লাভ করল অ্যাণ্ডারসেন। শেক্সপীয়র শেষ করেই অ্যাণ্ডারসেন নাটক লিখতে বসল। নাটকের নাম 'অ্যাবর ও এলভিরা'। মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি। সুন্দরী এলভিরা ভালবাসত অ্যাবরকে। ভাগ্যের পরিহাসে তাদের মিলন হলো না। তিন-চার-জনের মৃত্যু দিয়ে নাটকের সমাপ্তি হয়েছে।

অ্যাণ্ডারসেনের এই প্রথম রচনা। এর পর থেকে লেখার নেশা পেয়ে বসল তাকে। গল্প, নাটক, কবিতা সবই সে লিখছে। ট্র্যাজেডির দিকেই ঝোঁক বেশী। লিখতে গিয়ে তার সব চেয়ে বড় সমস্যা হলো রাজা-রানীর মুখে কি ভাষা দেবে। সাধারণ লোকে যে ভাষায় কথা বলে রাজা-রানীর নিশ্চয়ই সে ভাষা হতে পারে না। তাই অ্যাণ্ডারসেন ফরাসী, জার্মান ও ইংরেজী শব্দ ড্যানিশ ভাষার সঙ্গে মিশিয়ে রাজা-রানীর উপযুক্ত এক নতুন ভাষা তৈরি করেছিল।

শুধু লিখেই তৃপ্তি নেই। শোনাতে হবে। কেমন লাগে লোকের তা না জানলে স্বস্তি নেই। এই বাতিকগ্রস্ত কিশোরটি কেবল শ্রোতা খুঁজে বেড়ায়। কেউ সহানুভূতি দেখালে বা মিষ্টি কথা

বললে অ্যাণ্ডারসেন সুযোগ পেয়ে যায়। লেখা শোনাবে, অভিনয় দেখাবে, গান শোনাবে। কেউ অধৈর্য হলো কি না, চোখে-মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল কি না, সেদিকে তার লক্ষ্য নেই। এক-বার সুযোগ পেলে আর থামতে চায় না। কোপেনহেগেন থেকে একটা ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারের দল এসেছিল ওডেন্সে। তাদের থিয়েটার দেখে অ্যাণ্ডারসেন অভিভূত হয়েছে। বড় হয়ে সে থিয়েটারে অভিনয় করবে সেই স্বপ্ন দেখে। কথায় চলায় সব সময় তার থিয়েটারী ভঙ্গী। পথে বের হলে দুষ্টু ছেলেরা পিছনে লাগে। "ঐ যাচ্ছে ক্ষ্যাপা নাট্যকার।" চিৎকার করে আর ঢিল ছুঁড়ে মারে।

ঠাকুমা একটা ফ্যাক্টরিতে কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, সেখানেও কর্মীরা তাকে উত্ত্যক্ত করতে লাগল। গান শোনাতে ও অভিনয় দেখাতে হবে। প্রথম প্রথম খুব উৎসাহ বোধ করত ওদের আগ্রহ দেখে। কিন্তু পরে অ্যাণ্ডারসেন এমন উত্ত্যক্ত হয়ে উঠল যে কাজ ছেড়ে দিয়ে বাঁচল।

হাতে সামান্য কয়েকটা টাকা জমেছে। স্থির করল এই টাকা নিয়ে কোপেনহেগেন যাবে। জীবন-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে, দেখবে সমুদ্র মন্থন করে কি অমৃত তুলে আনতে পারে। যে শুনল সে-ই অবাক হয়ে গেল। এতটুকু ছেলে অচেনা শহরে গিয়ে কি করবে। মা জিজ্ঞাসা করল, বাড়ি ছেড়ে কেন যাবি ?

অ্যাণ্ডারসেন বলল, আমি বড় হবো, তাই জীবনের আবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই।

মা বাধা দিলেও ছেলেকে ধরে রাখতে চাইল না। তার কারণও ছিল। মেরি আবার বিয়ে করেছে। অ্যাণ্ডারসেন মাকে অনেকটা হারিয়েছে, মেরিও তরুণ স্বামীর মধ্যে নতুন আকর্ষণ পেয়েছে।

ঘোড়ায়-টানা ডাক-গাড়িতে চড়ে অ্যাণ্ডারসেন সংকীর্ণ জগৎ ত্যাগ করে রাজধানী কোপেনহেগেনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

কোপেনহেগেনের রয়েল থিয়েটারে অভিনয় করবে এই ছিল

অ্যাণ্ডারসেনের গোপন বাসনা। তাই রাজধানীতে পৌঁছেই সে গেল রয়েল থিয়েটারের ব্যালে নর্তকী মাদাম স্কলের সঙ্গে দেখা করতে। দরজার সামনে অমন অদ্ভুত চেহারা ও পোশাকের কিশোরকে দেখে শ্রীমতী স্কলের ঝির মনে হলো ভিক্ষা চাইতে এসেছে। ছুঁড়ে দিল একটা পয়সা। পয়সা পেয়ে অ্যাণ্ডারসেন তো অবাক! ফিরিয়ে দিতে গেল, কিন্তু ঝি নিলে না। কর্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতেও দিতে চায় না। প্রায় জোর করেই ঢুকল। শ্রীমতী স্কল সুন্দর সাজানো ড্রইংরুমে এমন একজন অতিথির আবির্ভাবে অবাক হয়ে গেলেন। কাঠির মতো সরু হাত-পা; ঘোড়ার মতো লম্বা মুখ; চেহারায় কোথাও একটু স্নিগ্ধতার স্পর্শ নেই। জুতো ও জামা দুই-ই জীর্ণ ও মলিন।

তার সম্বন্ধে দু-একটি প্রশ্ন করতেই উৎসাহিত হয়ে অ্যাণ্ডারসেন নিজের কাহিনী বলতে লাগল। তার যে কতরকম গুণ আছে তার প্রমাণ দেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল সে। শ্রীমতী স্কল নিস্পৃহ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, থিয়েটারে তুমি কোন্ পার্ট করতে চাও?

কেন, সিণ্ডেরেলার!—বলল অ্যাণ্ডারসেন।

শ্রীমতী স্কল তো হতবাক! এই চেহারা নিয়ে করবে পরীর পার্ট! নিশ্চয়ই পাগল। আর পাগলামির প্রমাণ দিতেই যেন অ্যাণ্ডারসেন জুতো খুলে ড্রইংরুমে উদ্দাম নৃত্য শুরু করে দিল। শ্রীমতী স্কল ভয় পেয়ে বাড়ির লোকজন জড় করে ঘর থেকে বের করে দিল সেই অল্পবুদ্ধি কিশোরটিকে।

অ্যাণ্ডারসেন এতেও দমল না। থিয়েটারের একজন ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করল। ডিরেক্টর তাকে এড়াবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন চীফ ডিরেক্টরের কাছে, সেখান থেকেও তাড়া খেয়ে পথে এসে দাঁড়াতে হলো। এবার কি করবে? পকেটে মাত্র টাকা দুই অবশিষ্ট আছে। ফিরে যেতে হবে হয়তো ওডেন্সে।

বিখ্যাত ইতালিয়ান গায়ক সিবনি তখন কোপেনহেগেনে আছেন। অ্যাণ্ডারসেন শেষ চেষ্টা হিসাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করল। সে গান

শিখবে এবং তাঁর দলভুক্ত হবে, এই প্রার্থনা। চেহারা ও পোশাকের দিকে তাকালে মন বিরূপ হয়ে যায়; কিন্তু চোখের উপর চোখ রাখলে সারল্য ও আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। সিবনি তার কাহিনী শুনলেন। এক নিঃসম্বল কিশোরের ব্যর্থ স্বপ্নের ইতিহাস তাঁর মন স্পর্শ করল। গান শুনলেন। গলা মন্দ নয়। সাধনা করলে গান শিখতে পারবে। সিবনির কয়েকজন বন্ধু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সকলে কিছু কিছু টাকা দিলেন অ্যাণ্ডারসেনকে। সিবনি বললেন, তুমি আমার বাড়িতেই খাবে; থাকবার ব্যবস্থা বাইরে করে নাও।

অ্যাণ্ডারসেনের সব সমস্যা আপাততঃ মিটে গেল। হতাশ হয়ে ওডেন্সে ফিরে যেতে হবে না। আবার আশার আলো দেখতে পেয়েছে। কিন্তু এ সৌভাগ্য বেশীদিন রইলো না। বয়ঃসন্ধির প্রভাবে কয়েক মাস পরে তার গলা ভেঙে গেল। সিবনি সস্নেহে বললেন, গান তোমার হবে না, কোনো হাতের কাজ শেখ।

মুচির কাজ? বাবার মতো অন্ধকার ঘরে মাথা গুঁজে ছেঁড়া জুতো সেলাই করবে? অভিনয়, সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চার স্বপ্নের সঙ্গে এই ভবিষ্যতের কত প্রভেদ!

এত সহজেই সে হাল ছাড়বে না, তার স্বপ্ন বিসর্জন দেবে না। ওডেন্সের কর্নেল গুলদবার্গের ছোট ভাই কোপেনহেগেনে অধ্যাপনা করেন। দাদার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র ধরে সে অধ্যাপকের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। এই ছিটগ্রস্ত কিশোরের ইতিহাস শুনে অধ্যাপকের মায়া হলো। তিনি দেখলেন, লেখাপড়া কিছুই শেখেনি। তিনি বুঝিয়ে বললেন, কিছু লেখাপড়া না শিখলে জীবনের কোনো বিভাগেই উন্নতি করা সম্ভব নয়। অধ্যাপক ও তাঁর বন্ধুরা অ্যাণ্ডারসেনের শিক্ষার ভার নিলেন। আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থাও করা হলো। কিন্তু তার পড়ায় মন নেই। ব্যাকরণ না শিখেই সে লেখক হতে চায়।

অ্যাণ্ডারসেনের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল যে কোনো বাড়ি গিয়ে আলাপ জমাবার। কেউ ফিরিয়ে দিলে কিংবা অপমানকর কথা

বললেও তার মনে দাগ পড়ত না। মাছির মতো নাছোড়বান্দা সে। তাড়িয়ে দিলেও ফিরে আসবে। তখন আর কি করা যায়? তোমার গুণপনা যা আছে দেখাও। অ্যাণ্ডারসেন তার নাচ, গান, অভিনয় ও আবৃত্তি দিয়ে সবাইকে আমোদ দেয়। ক্রমে অভিজাত-মহলে তার নাম ছড়িয়ে পড়ল। বিনা পয়সায় বেশ স্ফূর্তি পাওয়া যায়। ইচ্ছা হলে কিছু দিতে পারো। অ্যাণ্ডারসেনের নাম গিয়ে পৌঁছল রাজপ্রাসাদেও। সেখান থেকে একদিন আমন্ত্রণ এল। রাজ-পরিবারের সামনে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে সে কৃতার্থ হলো; রাজকুমারী ক্যারোলাইন নিজের হাতে তাকে কয়েকটি টাকা দিলেন। মুচির ছেলের রাজপ্রাসাদে এমন অভ্যর্থনা কে কল্পনা করতে পেরেছে! তার স্বপ্ন বুঝি সত্য হতে চলেছে।

কিন্তু এদিকে বিপদ! পড়া কিছুই শিখছে না দেখে অধ্যাপক ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আবার তাকে নিঃসম্বল অবস্থায় পথে দাঁড়াতে হতো যদি না সৌভাগ্যক্রমে রাজার উপদেষ্টা পরিষদের সভ্য জোনাস কলিনের সঙ্গে পরিচয় হতো! কলিন দেখলেন, ছেলেটি অন্তরে খাঁটি। তিনি তাকে নিজের ছেলের মতো গ্রহণ করলেন। বাইরে থেকে নয়, প্রকৃত আত্মীয়ের মতো বললেন, সকলের আগে তোমাকে লেখা-পড়া শিখতে হবে, তারপর অন্য কথা।

কলিন রাজার কাছে অ্যাণ্ডারসেনের কথা বলে সরকারী বৃত্তি মঞ্জুর করালেন। সরকারী অর্থে তার থাকা-খাওয়া, ইস্কুলের মাইনে সব হয়ে যাবে। যতদিন পড়বে ততদিন টাকার চিন্তা করতে হবে না। কলিন বুঝলেন, কোপেনহেগেনে অ্যাণ্ডারসেনের মন বিক্ষিপ্ত থাকবে। তাই মফঃস্বলের এক ইস্কুলে পাঠালেন। এ ব্যবস্থা অ্যাণ্ডারসেনের মনঃপূত না হলেও উপায় ছিল না।

একেবারে নতুন করে পড়া শুরু করতে হবে। বয়স্ক ঢ্যাঙা ছেলেকে বসতে হলো ছোট ছেলেদের সঙ্গে। ছেলেরা তাকে ঠাট্টা করে; শিক্ষকরা এত বড় ছেলের অজ্ঞতায় বিস্মিত হন। স্কুলের বাঁধা-ধরা জীবনের মধ্যে অ্যাণ্ডারসেনের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

মুক্ত পাখিকে খাঁচায় বন্দী করা হয়েছে। স্কুলের হেডমাস্টার সাইমন মেইসলিঙের কেন যে তার উপর প্রথম থেকেই একটা বিজাতীয় আক্রোশ সৃষ্টি হয়েছে তার কোনো কারণ সে ভেবে পায় না। অ্যাণ্ডারসেন কবিতা লেখে জানতে পেরে মেইসলিঙ জোর করে লেখা দেখে বললেন, কিচ্ছু হয়নি ; ও লেখা আঁস্তাকুড়েতে ফেলে দাও। এর পর থেকে তাঁর বিরূপতা আরো বেড়ে গেল। কিছুদিন মেইসলিঙ-এর বাড়িতে থাকতে হয়েছিল তাকে। ঠিক চাকরের মতো ব্যবহার পেয়েছে। বাড়ির সকলের কাছ থেকে। শ্রীমতী মেইসলিঙ চার সন্তানের জননী হলেও সন্ধ্যার পরে পথে বেরিয়ে গ্রামের যে কোনো পুরুষের সঙ্গে কোনো নিভৃত কোণে চলে যায়। গ্রামের সবাই এ কথা জানত। অ্যাণ্ডারসেন বাড়িতে আসবার পর শ্রীমতী মেইসলিঙ রাত্রিতে মাঝে মাঝে তার ঘরে আসত। মাতৃস্নেহ দেখাবার ভাণ করে তার সঙ্গে যে ব্যবহার করত তাতে অ্যাণ্ডারসেনের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। সন্ধ্যার পর থেকেই সে আতঙ্কে কাঁটা হয়ে থাকত ; কখন শ্রীমতা মেইসলিঙ এসে ঘরে ঢুকবে।

কলিন সব জানতে পেরে অ্যাণ্ডারসেনকে নিয়ে গেলেন অন্য স্কুলে। বিদায় নিয়ে চলে আসবার সময় মেইসলিঙ অভিসম্পাত দিলেন, তোর লেখাপড়া কখনো হবে না ; যদি বই লিখিস সে বই দোকানে পচবে, কেউ কিনবে না ; আর শেষজীবন কাটবে পাগলা-গারদে, সেখানেই মৃত্যু হবে।

অভিসম্পাত সত্ত্বেও অ্যাণ্ডারসেন পরীক্ষায় পাস করেছিল। পরীক্ষার সাফল্যে সে খুব উল্লাস বোধ করেনি। কতকগুলি কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, সেই আনন্দে মগ্ন হয়ে আছে।

অল্পদিন পরেই বের হলো অ্যাণ্ডারসেনের প্রথম বই 'এ জার্নি অন ফুট'। টুকরো-টুকরো প্রবন্ধের সমষ্টি। পাঠকদের নিকট সমাদৃত হলো। পর পর তিনটে সংস্করণ বেরিয়ে গেল। সুইডেনেও আর একটি সংস্করণ বেরিয়েছে। সবাই ভালো বলছে তার বই।

শুরু হয়েছে সৌভাগ্যের দিন। ছোট একটা নাটক লিখে

পাঠিয়েছিল থিয়েটারে। সে নাটক গৃহীত হলো, অভিনয় হলো যথা-সময়ে। শুধু তার বন্ধুরা নয়, দর্শকরাও প্রশংসা করেছে নাটকের। তারা লেখককে দেখতে চেয়েছে, অ্যাণ্ডারসেন মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে নমস্কার জানিয়েছে নাটকের ভাগ্য-বিধাতা দর্শকদের, শুনেছে তাদের করতালি। আনন্দের জোয়ার এসেছে। তুই চোখ আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ।

বয়স হলো বিশ। লম্বা হাত-পা। বিশেষ করে পায়ের পাতা এত বড় যে দৈত্যের পা বলে মনে হবে। ভগবান তার দেহে এক-বিন্দু লাবণ্যের ময়ান দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। কোপেনহেগেনে সে 'লম্বু অ্যাণ্ডারসেন' নামে পরিচিত ছিল। তারও পূর্বে ওডেন্সে কত অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ সইতে হয়েছে। এই কুৎসিত, স্বল্পবুদ্ধি মুচির ছেলের লেখা নাটক ডেনমার্কের অভিজাত সম্প্রদায়ের দর্শকদের আনন্দ দেয়; তার লেখা বই পড়ে তারা আনন্দ পায়। রূপকথা তার জীবনে সত্য হয়ে উঠেছে।

বড় হয়ে অ্যাণ্ডারসেন 'আগ্‌লি ডাকলিং'-এর গল্প লিখেছিল। পাতিহাঁসের ছানা কি বিশ্রী দেখতে। ডানা গজায়নি তখনো, নোংরা জায়গায় ঘুরে ঘুরে পোকামাকড় খায় আর কর্কশ গলায় প্যাঁক-প্যাঁক করে। এই বাচ্চা বড় হয়ে যদি রাজহাঁসে পরিণত হয় তাহলে সে কী বিস্ময়ের কথা! রাজহাঁসের কত রূপ, তার মধ্যে কি সুন্দর মর্যাদাবোধের দীপ্তি! অ্যাণ্ডারসেন গল্প শেষ করেছে এই মন্তব্য দিয়েঃ যখন পাঁতিহাসের কুরূপ বাচ্চা ছিলাম তখন রাজহাঁস হবার সুখ যে কত, তা কল্পনাও করতে পারিনি।

এ গল্পে অ্যাণ্ডারসেনের নিজের কাহিনী আত্মগোপন করে আছে। যে অ্যাণ্ডারসেন ওডেন্সে ছিল পাতিহাঁসের বাচ্চা সে এখন রাজহাঁসে রূপান্তরিত হতে শুরু করেছে।

পরীক্ষায় পাস করবার পর নতুন ভাবনা দেখা দিল। সরকারী বৃত্তি শেষ হয়ে যাবে। এবার উপার্জনের পথ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কলিন একবার ভাবলেন, ডাক্তারী বা ওকালতী পড়লে

মন্দ হয় না। কিন্তু পরে আবার মনে হলো, সাহিত্যচর্চা ওর নেশা। টাকা উপার্জন সম্ভব হলেও অন্য বৃত্তিতে আনন্দ ও মানসিক শান্তি পাবে না। বড় লেখক হবার সম্ভাবনা নেই; দারিদ্র্য জীবনের সঙ্গী হয়ে থাকবে; কিন্তু আনন্দ পাবে। সেটা তো কম কথা নয়! সুতরাং লেখা নিয়েই থাক।

লেখার জন্য অভিজ্ঞতা চাই,—একথা জানতেন কলিন। বললেন, বই লিখে যে টাকা পেয়েছ তা দিয়ে বেড়িয়ে এস।

মনের মতো প্রস্তাব। বেরিয়ে পড়ল অ্যাণ্ডারসেন।

প্রথম দেখল নিজের দেশ ডেনমার্ক; তারপর অন্য দেশ। ঘুরতে ঘুরতে এল একটা পুরনো দুর্গে। দুর্গের ভিতরের চিত্রশালায় চমৎকার সব ছবি টাঙানো। একটি তরুণীর ছবির সামনে তার পা আটকে গেল। এমন সুন্দর মুখ সে কখনো দেখেনি। যেন রূপকথার রাজকন্যা! মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। এমন করে সে কখনো মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। সে কুশ্রী, সে উপহাসের পাত্র, সে দরিদ্র—সুতরাং কোনো মেয়েই তাকে ভালবাসবে না, বিয়ে করতে চাইবে না। তাই মেয়েদের প্রতি তার বিশেষ কোনো আকর্ষণ ছিল না।

দুর্গের নিকটেই তার এক বন্ধুর বাড়ি। সেখানে গেল আমন্ত্রণ রক্ষা করতে। বন্ধুর বোন রিবর্গকে দেখেই সে চমকে উঠল। সেই ছবিতে দেখা তরুণী যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। আলাপ করে যখন জানতে পারল রিবর্গ তার বই পড়েছে এবং ভালো লেগেছে তখন তো আর কথাই নেই। অ্যাণ্ডারসেনের চোখে রিবর্গ বিশ্বের সেরা সুন্দরী। আসলে রিবর্গ তেমন সুন্দরী নয়। কিন্তু যে প্রশংসা করে সে অ্যাণ্ডারসেনের কাছে রূপে-গুণে শ্রেষ্ঠ। তার মতো লোক পৃথিবীতে আর নেই। দুর্গে তরুণীর ছবি দেখে হঠাৎ নারীর প্রতি যে আকর্ষণ জেগেছে রিবর্গের সান্নিধ্যে এসে তা আরো বৃদ্ধি পেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে স্থির করে ফেলল, রিবর্গই হবে তার জীবনের যোগ্য সঙ্গিনী। বন্ধু অ্যাণ্ডারসেনের মনোভাব বুঝতে পেরে সাবধান করল,

রিবর্গের বিয়ে কিন্তু আগে থাকতেই স্থির হয়ে আছে।

অ্যাণ্ডারসেনের প্রথম প্রেমের জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে সময়ের ব্যবধান সামান্য। তাই হতাশার বেদনা বড় তীব্র হয়ে বাজল। কোপেন-হেগেন ফিরে এসে বেদনার্ত হৃদয়ের প্রকাশ হতে লাগল তার রচনায়, বৈঠকে এবং থিয়েটারে। তবু আশা একেবারে ছাড়েনি সে। যখন শুনতে পেল রিবর্গ কয়েক দিনের জন্য রাজধানীতে এসেছে, অমনি গিয়ে দেখা করল। তার সঙ্গে বেড়াল, গল্প করল, কিন্তু মনের কথা মুখে কিছুতেই প্রকাশ করা গেল না। চিঠি লিখে বন্ধুর মারফৎ পাঠিয়ে দিল। লিখল, এখনও সময় আছে। ভেবে দেখ যার সঙ্গে তোমার বিয়ে স্থির হয়েছে তাকে পেলে সত্যি সুখী হবে কি না।

রিবর্গের জবাব এল একটু পরেই। ধন্যবাদ, এখন আর বদল করা যাবে না। প্রত্যাখ্যান করে যে চিঠি লিখেছিল রিবর্গ, অ্যাণ্ডারসেন খুব ছোট একটি চামড়ার ব্যাগে সেটি বন্ধ করে দীর্ঘ চল্লিশ বছর ঝুলিয়ে রেখেছিল বুকের কাছে। প্রেমপত্র নয়, প্রত্যাখ্যানপত্র; প্রত্যাখ্যানপত্রের এত বড় মর্যাদা আর কেউ দেয়নি। মৃত্যুর পরে অ্যাণ্ডারসেনের বুকের কাছ থেকে এই ব্যাগটি পাওয়া গিয়েছিল। এখন সেটি আছে ওডেন্সের অ্যাণ্ডারসেন মিউজিয়ামে। সেই মিউজিয়ামে রিবর্গের একটি ছবি রাখা হয়েছে। ছবির নীচে আছে একটি ফুলের তোড়া; শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। কবে অ্যাণ্ডারসেন এই তোড়ার সঙ্গে রিবর্গকে প্রেম নিবেদন করেছিল কে জানে! শুকনো তোড়ার সঙ্গে একটুকরো কাগজে লেখা আছে: অ্যাণ্ডারসেনের কাছ থেকে।

অ্যাণ্ডারসেনের হৃদয়ে প্রেম জাগ্রত করে রিবর্গ দূরে সরে গেল। প্রেম সর্বদাই অবলম্বন সন্ধান করে, না হলে বিকাশ সম্ভব নয়। কলিনের কনিষ্ঠা কন্যা লুইসাকে সে দেখছে ছেলেবেলা থেকে। কত গল্প শুনিয়েছে, খেলা করেছে দু'জনে। অকস্মাৎ লক্ষ্য করল সেই ছোট মেয়েটি কত বড় হয়ে উঠেছে, রূপে মাধুর্যে পূর্ণ। তাকে উদ্দেশ্য করে কবিতা লিখল অ্যাণ্ডারসেন; মুখোমুখি কথা না বলে হাতে চিঠি গুঁজে

দিয়ে যায়। লুইসা বুঝতে পেরে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। দিদির সঙ্গে পরামর্শ করে একদিন স্পষ্টই বলে দিল, কোনো আশা নেই। সে আর একজনকে ভালোবাসে। কলিনও কথাটা জেনে বিরক্ত হলেন। তিনি অ্যাণ্ডারসেনের মঙ্গল কামনা করেন, কিন্তু তাই বলে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া যে কল্পনাতীত!

পাতিহাঁসের ছানা এখনো রাজহাঁস হতে পারেনি। কলিন ভাবলেন, কিছুদিন বিদেশে ঘুরে এলে অ্যাণ্ডারসেনের বেদনা দূর হবে। রাজার কাছে গিয়ে সুপারিশ করলেন যাতে সে একটা ভ্রমণ-বৃত্তি পায়। রাজা আলাপ করতে চাইলেন। আবার আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। মুচির ছেলে রাজার সামনে গিয়ে উপস্থিত হলো। রাজা তাকে পাশে নিয়ে এক টেবিলে ডিনার খেলেন। অ্যাণ্ডারসেন মদ খায় না। স্বাস্থ্য-কামনার সময় রাজার হাতে মদের গ্লাস। সে তুলে নিল জলের গ্লাস। রাজা অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আমাকেও তুমি ফাঁকি দিচ্ছ? মদের বদলে গ্লাসে জল নিয়েছ?

অ্যাণ্ডারসেন বলল, না মহারাজ, আপনাকে ফাঁকি দিচ্ছি না। আপনার সামনে জলও মদ হয়ে গেছে।

হীনমন্যতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছে অ্যাণ্ডারসেন। দরিদ্র মুচির ছেলে রাজার সামনেও কত সপ্রতিভ। পাতিহাঁসের বাচ্চা রাজহাঁস হলো বুঝি?

রাজা আলাপ করে খুশি হলেন। বৃত্তি মঞ্জুর হলো। অ্যাণ্ডারসেন বেরিয়ে পড়ল দেশ ভ্রমণে। ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী ও জার্মানী ঘুরে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করল অ্যাণ্ডারসেন। দিনগুলি বেশ আনন্দেই কেটেছে। শুধু একটি কারণে কিছুদিন গভীর দুঃখ পেয়েছে। তার পরবর্তী বই 'অ্যাগনেট ও মারম্যান' মোটেই সমাদর লাভ করেনি। কলিন প্রত্যেক চিঠিতেই উপদেশ দিয়ে লিখেছেন, লেখা ছেড়ে দাও, অন্য পথ ধরো। না হলে খাবে কি? একটু প্রশংসা পেলে লাফিয়ে ওঠে, একটু নিন্দা হলে ভেঙে পড়ে।

গভীর হতাশা নিয়ে ফিরে এল কোপেনহেগেনে। সরকারী

বৃত্তি বন্ধ হয়ে গেল। একটি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি তার একমাত্র সম্বল। এ বই সফল হলে ভবিষ্যতের পথ উন্মুক্ত হবে। অনেক প্রকাশকের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি প্রত্যাখ্যাত হয়ে এল। শেষ পর্যন্ত সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে এক প্রকাশক রাজী হলো বই ছাপতে। বাজারে বের হবার সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয়তার আশীর্বাদ লাভ করল অ্যাণ্ডারসেনের উপন্যাস। যারা এতদিন লেখা ত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছে, তারা এখন লিখতে উৎসাহ দেয়। আজ অ্যাণ্ডারসেনের প্রথম উপন্যাস 'দি ইম্প্রভাইজারে'র নাম আমরা ভুলে গেছি। কিন্তু এই উপন্যাসটি অ্যাণ্ডারসেনের সাহিত্য-জীবন গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। উপন্যাসটি সফল না হলে তাকে হয়তো লেখা ছেড়ে দিতে হতো। মন্ত্রী কাউণ্ট কনরাডের উপন্যাসটি এত ভালো লেগেছিল যে, তিনি নিজে অ্যাণ্ডারসেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। মন্ত্রীর চেষ্টায় অ্যাণ্ডারসেনের জন্য আজীবন সরকারী ভাতার ব্যবস্থা হলো। এই ব্যবস্থা না হলে আমরা হয়তো অপূর্ব রূপকথাগুলি পেতাম না।

পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তার কাছে আসত পুতুলের লোভে। সুন্দর পুতুল তৈরি করতে পারত অ্যাণ্ডারসেন। কখনো কখনো তারা গল্প শুনতে চাইত। ওডেন্সে ছেলেবেলায় শোনা গল্পগুলি বলত একটু নতুন করে। নতুন গল্প রচনা করতেও তার দেরী লাগত না। অ্যাণ্ডারসেনের মনে হতো পৃথিবীর সবকিছুর পেছনেই একটা করে গল্প আছে। গাছ, ফুল, কুকুর, চেয়ার, টেবিল প্রত্যেকেই তাদের গল্প বলতে উৎসুক; শোনবার ক্ষমতা থাকা চাই। অ্যাণ্ডারসেনের আছে সেই ক্ষমতা।

অ্যাণ্ডারসেনের আকাঙ্ক্ষা ছিল সে গ্যেটে, শেক্সপীয়র, ডিকেন্স প্রভৃতির মতো বড়দের জন্য বই লিখবে। সে বই পড়ে পাঠকদের হৃদয় অভিভূত হবে। যে-গল্প এত সহজে মনে আসে তা লেখার কথা সে ভাবেনি। এই গল্পগুলি সে অবজ্ঞা করেছে।

টাকার দরকার। প্রকাশকের হাতে পাণ্ডুলিপি তুলে দিতে পারলে কিছু টাকা পাওয়া যেতে পারে। অথচ মাথায় ভালো কোনো

প্লট নেই। তাগিদের প্রেরণায় সে চারটি রূপকথা লিখে ফেলল। এর মধ্যে তিনটি সে ছেলেবেলায় ঠাকুরমার কাছে শুনেছে। একটি তার নিজের রচনা।

বই বের হবার পর সাড়া পড়ে গেল। এমন গল্প এমন ভাবে কেউ বলেনি। শুধু ছেলেরাই নয়, তাদের মা-বাবারাও পড়ে আনন্দ পায়। অ্যাণ্ডারসেনের রূপকথার শ্রোতা ছোট-বড় সকলেই। একে একে রূপকথার সংকলন বের হতে লাগল; দ্রুত সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায়। বিদেশী ভাষায় অনুবাদ বেরিয়েছে। কোপেনহেগেনে কোনো বালক-বালিকার অচেনা নয় সে। পথে বের হলেই অতি-পরিচিতের মতো অভিবাদন জানায়। রাজার সঙ্গে ডিনার খায় প্রায়ই। অভিজাত মহলে সে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত।

এই সময় বের হলো 'আগলি ডাক্‌লিং' গল্পটি। তার নিজের জীবনের কাহিনী। পাতিহাঁসের কুৎসিত ছানাটি কত দুঃখ ও লাঞ্ছনা অতিক্রম করে রাজহাঁসে পরিণত হয়েছে, তারই গল্প। এবার মুচির ছেলে জীবনের সরোবরে রাজহাঁসের রূপ পেয়েছে।

কিন্তু তার সব দুঃখ দূর হয়নি। নিঃসঙ্গ জীবন। যশ পেয়েছে, টাকার চিন্তা নেই; ভালোবাসার স্পর্শ না পেয়ে শূন্যতা দূর হয়নি। রিবর্গ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে; লুইসা যে স্বামীর কল্পনা করেছে তার সঙ্গে অ্যাণ্ডারসেনের মিল নেই। এবার তার পরিচয় হলো সুইডেনের খ্যাতনামা গায়িকা জেনি লিণ্ডের সঙ্গে। জেনির অন্তরঙ্গ ব্যবহারে তার মনে জাগল নতুন আশা। বরাবরই সে মুখচোরা; চিঠিতে লিখে দিল মনের কথা। জেনি কোনো জবাবই দিল না। সরব প্রত্যাখ্যান সহ্য করা এর চেয়ে সহজ। বার বার তিন বার প্রত্যাখ্যাত হলো। আর নয়, সংকল্প করল অ্যাণ্ডারসেন।

নিঃসঙ্গ জীবনে অ্যাণ্ডারসেনের একমাত্র বৈচিত্র্য ছিল ভ্রমণ। ফ্রান্স, জার্মানী ও ইংলণ্ডে বেড়াতে তার ভালো লাগত। ডুমা, বালজাক, ভিক্টর হুগো প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকদের সঙ্গে পরিচয়

হলো প্যারিসে। বার্লিনে রূপকথার লেখক গ্রিম ভাইদের সঙ্গে পরিচয় করতে গিয়ে হতাশ হতে হলো। গ্রিমরা নাকি তার নামই শোনেনি। ইংলণ্ডে এসে ডিকেন্সের সঙ্গে পরিচয় হলো। ডিকেন্স তার রূপকথার ভক্ত পাঠক। দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে বেড়াতে এসে ডিকেন্সের বাড়িতেই অতিথি হলো। একদিন শ্রীমতী ডিকেন্স আবিষ্কার করলেন, বাগানে ঘাসের উপর শুয়ে অ্যাণ্ডারসেন ফুলে ফুলে কাঁদছে; তার হাতের মধ্যে এক কপি ড্যানিশ সংবাদপত্র। ডিকেন্স তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। কি হলো? আত্মীয়-স্বজন কারো মৃত্যুর খবর আছে? না, সে সব কিছু নয়। তার বইয়ের বিরূপ সমালোচনা বেরিয়েছে।

ইংলণ্ডে এবং স্কটল্যাণ্ডে সমাদর লাভ করে দেশে ফিরে হলো অন্য এক অভিজ্ঞতা। জানালা দিয়ে পথের লোক চলাচল দেখছে। শুনতে পেল, দু'জন লোক তাকে দেখিয়ে বলছে, ঐ যে আমাদের ওরাং ওটাং এতদিন পরে দেশে ফিরে এসেছে।

কেন সে তার রূপকথার রাজপুত্রের মতো সুন্দর নয় এই তার অপরাধ। ছোট-বড় সবাই তার গল্প পড়ে মুগ্ধ হয়। কিন্তু লেখককে কেউ পছন্দ করে না। এত বিশ্রী সে দেখতে। অবশ্য জাতির কাছ থেকে সম্মানও কম পায়নি। অ্যাণ্ডারসেনের হয়তো কখনো কখনো এর আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়েছে। ১৮৬৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর ওডেন্সের নাগরিকরা তাকে সম্মানিত করল। ওডেন্সের সকল বাড়ি আলোকমালায় সজ্জিত হলো, ভোজ, বক্তৃতা, মশাল শোভাযাত্রা—জমকালো আয়োজন। এত দিনে সত্য হল সেই জিপসী মেয়ের ভবিষ্যদ্বাণী। অ্যাণ্ডারসেনের সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে তার মর্মর মূর্তি স্থাপন করা হলো কোপেনহেগেনের রাজ-উদ্যানে।

বসন্তকালে যখন কোকিল ডাকত তখন দেশের সংস্কার অনুসারে অ্যাণ্ডারসেন জিজ্ঞাসা করত, আর ক'বছর বাঁচব বল তো? কোকিল অনেক বার কুহু কুহু করে ডেকে উঠত। অ্যাণ্ডারসেন ভাবত,

পরমায়ু আছে অনেক বছর। সে বছর কোকিল প্রশ্ন শুনে এক বারও ডাকল না। আয়ু ফুরিয়েছে।

বড় দুর্বল হয়েছে শরীর। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করে না। ঘুম ভাঙলেও অনেকক্ষণ শুয়ে থাকে। একদিন আর ওঠা হলো না, কখন প্রাণ বেরিয়ে গেছে কেউ জানতে পারেনি। সেদিন ৪ঠা অগস্ট, ১৮৭৫।

জীবনের রূপকথা শেষ হলো। অন্য রূপকথার মতো নয়। গল্পে রাজকুমারের সঙ্গে দেখা হয় রাজকুমারীর, তারা পরস্পরকে ভালোবাসে, তাদের বিয়ে হয়। সমাপ্তিতে থাকে ঃ বাকী দিনগুলি তাদের সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটল।

তার জীবনেও রাজকুমারী এসেছে, পর পর তিনজন। তারা রাজকুমারকে দেখতে পায়নি; দেখেছে পাতিহাঁসের কুরূপ বাচ্চাকে। চমকে উঠে সবাই দূরে সরে গেছে।

বন্ধুরা বলেছে, মেয়ের অভাব কী! আমরা পাত্রী সংগ্রহ করে দেব।

না, তেমন বিয়ে সে চায়নি। যে মেয়ে তাকে ভালোবেসে এগিয়ে আসবে সে তার কল্পনার রাজকুমারী; ভালোবাসি, তুমি ভালোবাসো, তাই আমাদের বিয়ে। শুধু বিয়ের জন্যই বিয়ে সে করবে না। কেমন সে ভালোবাসা?

লুইসা কলিনের বিয়েতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে সে যেতে পারেনি। সেদিন একটি গল্প লিখেছে। 'লিটল মারমেড'। সাগরতলের পরমাসুন্দরী মৎস্যকন্যা পৃথিবীর রাজকুমারকে ভালোবেসে তার দীর্ঘ তিনশো বছরের আনন্দের জীবন পিছনে ফেলে চলে এল লোকালয়ের সান্নিধ্যে। মৎস্য-পুচ্ছের পরিবর্তে দুটি পা পাবার জন্য নিরন্তর কী অসহ্য যন্ত্রণা সয়েছে সে। সবই রাজকুমারের জন্য। অথচ রাজকুমার বিয়ে করল অন্য এক মেয়েকে।

এমন করে কোনো মেয়ে যদি ভালোবেসে এগিয়ে আসত! যদি ভালোবাসার দীপ্তিতে তার কুৎসিত চেহারা সুন্দর হয়ে উঠত।

সাহিত্যের দরবারে সে পেয়েছে রাজহাঁসের মর্যাদা। কিন্তু মেয়েদের চোখে সে পাতিহাঁসের বিরূপদর্শন ছানা ছাড়া কিছু নয়। রাজ-কুমারের সন্ধান পাওয়া যাবে অ্যাণ্ডারসেনের রূপকথায়; লেখকের জীবনে কোথাও সে নেই।

বারট্রাণ্ড রাসেল

১৮৭২—১৯৭০

কোথায় যেন গ্যেটে বলেছেন, ইতিহাসের যুগকে প্রধানতঃ দু'ভাগে চিহ্নিত করা যায়। বিশ্বাসের আর অবিশ্বাসের যুগ। বিশ্বাসের যুগ উজ্জ্বল, সফল, গতিশীল; যে যুগে অবিশ্বাসের আধিপত্য তা অনুজ্জ্বল ও বন্ধ্যা; সেই অধ্যায়গুলি ইতিহাসের পশ্চাৎপটে থাকে। লোকে ভুলে যায়।

মানুষের বেলাতেও এই শ্রেণীবিভাগ প্রয়োগ করা যেতে পারে। জীবনে যাঁরা প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন তাঁরা সকলেই একটা-কিছু গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে আঁকড়ে ধরেছেন। কোনো কিছুতেই যাঁদের বিশ্বাস নেই তাঁরা ভেসে যান, তলিয়ে যান জীবনের আবর্তে। রাসেল পুরনো ঐতিহ্যের নোঙর ছিঁড়ে যখন নতুন পথে চলতে চাইলেন তখনই অভিযোগ উঠল, তিনি স্কেপ্‌টিক, সংশয়বাদী, কিছুতেই আস্থা নেই। কিন্তু রাসেলের জীবন, রচনা ও কাজের সঙ্গে পরিচয় থাকলে আজ কেউ তাঁকে সংশয়বাদী বলবার অবকাশ পাবেন না বরং তাঁর জীবন প্রত্যয়ের প্রভায় দীপ্ত। সেই বিশ্বাসের দীপ্তি পাঠক উপলব্ধি করেন তাঁর লেখায়। মতের পার্থক্য হতে পারে; কিন্তু এই বিশ্বাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে রাসেল অনায়াসে পাঠককে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। দর্শন, রাজনীতি, সমাজবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের ওপরে লেখা বইগুলির জনপ্রিয়তার এটি অন্যতম প্রধান কারণ।

রাসেল যা লিখতেন তা নিজের জীবনে প্রয়োগ করতেন। সেখানেই তাঁর বিশ্বাসের জোর। ১৯৩৭ সালে রাসেল নিজের যে মৃত্যু-বার্তা রচনা করেছিলেন তাতেও এই দিকটার ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাঁর চিন্তা-ভাবনাগুলি বাঁধা পথ ধরে চলে না বটে, কিন্তু তাদের তিনি জীবনে অনুসরণ করেন এবং সেই জন্য কৃতিত্বের

দাবি তাঁর প্রাপ্য।

যা প্রচার করা যায় তা জীবনে গ্রহণ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। যৌন আচরণ সম্বন্ধে রাসেলের মতামত ছিল বিপ্লবাত্মকরূপে উদার। পরীক্ষামূলক বিয়ের প্রবর্তন করবার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি; বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ শান্ত ও সুস্থ হবে যদি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের স্বাধীনতা দেওয়া যায়,—এই ছিল তাঁর মত; ব্যভিচার বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ হওয়া উচিত নয়, বলতেন রাসেল। এই সব মতবাদ শুধু 'ম্যারেজ অ্যাণ্ড মর্যাল্স'-এর পৃষ্ঠায় নিবদ্ধ ছিল না; নিজের জীবন সেই অনুসারে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। রাসেলের বান্ধবী ছিলেন বেশ কয়েকজন এবং তাঁদের সম্পর্ক প্লেটোনিক ছিল বলা চলে না। রাসেল তাঁর স্ত্রীকেও পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনের পূর্ণ সুযোগ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে ডোরা রাসেলের এক প্রণয়ী, তাঁদের বাড়িতেই কিছুকাল থেকেছেন। ডোরা নিজেই স্বীকার করেছেন, তাঁর চারটি সন্তানের মধ্যে মাত্র দুটির পিতা রাসেল। যদিও তাঁদের মধ্যে পরে বিচ্ছেদ ঘটেছিল, তথাপি রাসেল স্ত্রীর প্রণয়ঘটিত ব্যাপার নিয়ে ঈর্ষান্বিত হননি। এর প্রমাণ দুজনের মিলিত উদ্যমে বই লেখা, স্কুল পরিচালনা, ইত্যাদি।

যদিও রাসেল বছর তিনেক বয়সের মধ্যেই মা-বাবাকে হারিয়েছেন, তথাপি তাঁদের উদার মতবাদের প্রভাব পড়েছে তাঁর জীবনে। বাবার নাম লর্ড অ্যাম্বার্লি, মার নাম কেট। রাসেল তাঁদের তৃতীয় ও শেষ সন্তান। জন্মের তারিখ ১৮ই মে, ১৮৭২। শ্রীমতী অ্যাম্বার্লি কনিষ্ঠ ছেলের বর্ণনা দিয়ে মাকে যে চিঠি লিখেছেন তাতে বারট্রাণ্ডকে 'আগ্লি' বলা হয়েছে। কিন্তু খুব পোক্ত দেহ। পরিবারের ডাক্তার বলেছিলেন, সচরাচর এমন দেখা যায় না।

বারট্রাণ্ডের বয়স যখন মাত্র দু বছর তখন তাঁর মা ও দিদির মৃত্যু হয় ডিপথেরিয়ায়। বাবা কিছুদিন থেকে মৃগীরোগে ভুগছিলেন; বছর দেড়েক পরে তিনিও মারা যান। উইলে তিনি বারট্রাণ্ড ও দাদা ফ্রাঙ্কের দায়িত্ব দিয়েছিলেন দুই ফ্রী-থিঙ্কার বন্ধুর ওপরে। কিন্তু লর্ড

অ্যাম্বার্লির পিতা লর্ড জন রাসেল আদালতে আবেদন করে ছুই নাতিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। বছর ছুই পরেই ঠাকুর্দার মৃত্যু হলো। বারট্রাণ্ডকে মানুষ করেছেন ঠাকুরমা লেডি রাসেল।

জন রাসেল ছিলেন লিবারেল পার্টির অন্যতম নেতা। ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এবং পার্লামেণ্টের সদস্য হিসাবে উদার নীতি সফল করবার জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। লেডি রাসেলের স্বামীর আদর্শে গভীর আস্থা ছিল। আয়র্ল্যাণ্ডের হোম রুল আন্দোলন সমর্থন করে এবং বিদেশে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রতিবাদ জানিয়ে সেদিন-কার রক্ষণশীল ইংরেজ-সমাজের বিরাগভাজন হয়েছিলেন তিনি। মা-বাবাও ছিলেন প্রচলিত সংস্কার থেকে মুক্ত। লর্ড অ্যাম্বার্লি জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করেননি বলে পার্লামেণ্টের সদস্যপদপ্রার্থী তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এমন বিরূপ প্রচার শুরু করলেন যে ভোট পাওয়া কঠিন হয়েছিল।

বারট্রাণ্ড বাড়িতেই পড়তেন, স্কুলে ভর্তি করা হয়নি। সমবয়স্ক সঙ্গী ছিল না। দাদা বয়সে একটু বড়, প্রকৃতি অন্যরকম। সঙ্গী বই আর ঠাকুরমা। শৈশব একা কেটেছে বলে মন অন্তর্মুখীন হতে পেরেছে, এই ছিল বারট্রাণ্ডের ধারণা। মনের বিকাশের জন্য নিঃসঙ্গতা আবশ্যক। নিউটন সম্বন্ধে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছিলেন : চিন্তা-সমুদ্রের নিঃসঙ্গ নাবিক। সকল চিন্তানায়ক সম্পর্কেই কথাটি সত্য।

বারো বছর বয়সে জন্মদিনে ঠাকুরমার কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলেন বাইবেল। ঠাকুরমা বাইবেল থেকে ছুটি উদ্ধৃতি নিজের হাতে লিখে দিয়েছিলেন। একটি হলো : দাউ শ্যাল্ট নট ফলো এ মালটিচিউড টু ডু ইভিল'; এবং আর একটি : 'বী স্ট্রং, অ্যাণ্ড অব এ গুড কারেজ; বী নট আফ্রেইড, নিদার বী দাউ ডিসমেইড'। এই ছুটি উপদেশ তাঁর মানসিকতাকে প্রভাবান্বিত করেছে।

আঠারো বছর বয়সে রাসেল কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন। ১৮৯৩ সালে তিনি র‍্যাংলার হলেও পরীক্ষার ফল তেমন ভালো

হয়নি। গণিত ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। যদিও প্রথম নামতা মুখস্থ করতে বসে তিনি কেঁদেছিলেন, পরে কিন্তু গণিতের প্রেমে পড়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি বলেছেন, নিঃসঙ্গ কিশোর-জীবনে গণিতের প্রতি মন আকৃষ্ট না হলে হয়তো আত্মহত্যা করতে হতো। গণিতের সূত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে অধ্যাপকদের সঙ্গে তাঁর মত-বিরোধ ছিল, তাই ফল ভালো হয়নি। এমন আঘাত পেয়েছিলেন রাসেল যে, গণিতশাস্ত্রের সবগুলি বই তিনি বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

কলেজে প্রথম যখন এলেন তখন রাসেল ছিলেন মুখচোরা, লাজুক। ক্রমশঃ তাঁর সংকোচ কেটে গেল, সভা-সমিতিতে নিয়মিত বক্তৃতা দিতে লাগলেন। এই সময় পরিচয় হলো অ্যালাইস পীয়ারসল স্মিথের সঙ্গে। অনাত্মীয়া মেয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় প্রেমে পরিণত হতে বিলম্ব হলো না। এ বিয়েতে ঠাকুরমার মত ছিল না। ১৮৯৪ সালে তাঁদের বিয়ে হলো ; স্ত্রী বয়সে পাঁচ বছরের বড়।

রাসেল এগারো থেকে আটত্রিশ বছর পর্যন্ত গণিতশাস্ত্রের মূল তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেছেন। এর পর আরম্ভ করেছেন দর্শনশাস্ত্রের চর্চা। তার পরে দেখতে পাই সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতিতে তাঁর আগ্রহ। রাসেলের প্রথম বই বের হয় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে, বইটির নাম ঃ 'জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্রাসি'। ১৯১০-১৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয় 'প্রিনসিপিয়া ম্যাথমেটিকা' তিন খণ্ডে অধ্যাপক হোয়াইটহেডের সহযোগিতায়। এই বিরাট গ্রন্থ মানবমনীষার স্তম্ভস্বরূপ।

১৯১০ সালের অক্টোবর মাসে রাসেল ট্রিনিটি কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধবিরোধী প্রচার চালাবার জন্য তাঁর চাকরি যায়। জরিমানার টাকা না দেওয়ায় রাসেলের ব্যক্তিগত লাইব্রেরিটি বিক্রি করে দেওয়া হয়। আর একটি অভিযোগে তাঁকে ছ' মাসের জন্য জেলেও যেতে হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাঁর সমর্থন ছিল নাৎসীবাদকে পরাজিত করবার উদ্দেশ্যে। যুদ্ধের সময় তিনি আমেরিকার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের ওপর বক্তৃতা দিয়েছেন। কিন্তু নিউ ইয়র্কে অধ্যাপক পদ লাভের পর

একজন নাগরিক এই নিয়োগের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করে। কারণ শিক্ষকের যেরূপ চরিত্রবল থাকা দরকার রাসেলের তা নেই। তাঁর লেখা বইগুলি—lecherous, salacious, libidinous, lustful, venerous, erotomaniac, aphrodisiac, atheistic, irreverent, narrow-minded, untruthful and bereft of moral fibre.

বিচারে তাঁর নিয়োগ বাতিল হয়ে যায়। আইনস্টাইন এ ব্যাপারে ব্যথিত হয়ে চার লাইনের এই কবিতাটি লিখেছিলেন :

It keeps repeating itself
In this world fine and honest
The parson alarms the populare
The genius is executed.

১৯৪৪ সালে ইংলণ্ডে ফিরে আসবার পর রাসেলের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিরোধিতা না করায় এই পরিবর্তন। ট্রিনিটি কলেজ তাঁকে আমন্ত্রণ জানালো অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতে। এই সময় ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়।

১৯৩১ সালে দাদা ফ্রাঙ্কের মৃত্যুর পর বারট্রাণ্ড পারিবারিক সম্পত্তি ও উপাধির উত্তরাধিকারী হন : তিনি অবশ্য নামের আগে লর্ড ব্যবহার পছন্দ করতেন না। লর্ড পরিবারের ছেলে হলেও প্রায় ষাট বছর বয়স পর্যন্ত তাঁকে লিখে জীবিকার্জন করতে হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সরকারের বিরাগভাজন হবার ফলে সম্মানজনক এবং অর্থকরী পদ লাভ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর স্বদেশবাসী তাঁকে সম্মানিত করতে কার্পণ্য করেনি। ১৯৪১ সালে সরকার তাঁকে ভূষিত করলেন ‘অর্ডার অব মেরিট’ দিয়ে।

কিন্তু তাঁকে সম্মানিত করেছে পৃথিবীর সকল দেশের লোক। কারণ যখনই পৃথিবীর যে-কোনো দেশে কোনো অত্যাচার-অবিচার

ঘটেছে তিনি প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছেন। সমকালীন ইতিহাসের গতি তিনি অনুধাবন করে চলতেন সাগ্রহে। য়ুরোপ, রাশিয়া, চীন, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকায় ভ্রমণ করে তিনি লাভ করেছিলেন প্রত্যক্ষ জ্ঞান সেই সব দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে।

১৯৫০ সালে রাসেল সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন 'in recognition of his great services to the cause of humanity and freedom of thought.' নোবেল কমিটির একজন সদস্য আরও বলেছেন যে, দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁর সমগ্র রচনাবলী সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের উদ্দেশ্যে লেখা। আজকের জড়বাদের যুগে তাঁর রচনা স্বাধীন চিন্তার শিখা প্রজ্বলিত করে রেখেছে। তা ছাড়া 'His whole life's work is a stimulating defence of the reality of common sense.'

রাশিয়া, চীন, ভারত, পর্তুগাল এবং সর্বশেষে ভিয়েতনাম সম্বন্ধে রাসেল বিশেষরূপে আগ্রহান্বিত ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ছিল পূর্ণ সমর্থন। তিনি ইণ্ডিয়া লীগের সভাপতিত্ব করেছেন। গান্ধীজীর সব নীতি তিনি মানতেন না, কিন্তু মানুষ হিসাবে শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে এবং তিনি যে 'মহাত্মা' তাও স্বীকার করেছেন। গান্ধীজীর জীবনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে, গান্ধীজী প্রথমবার আফ্রিকায় পৌঁছে ভারতীয় বলে যে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন সেই অভিজ্ঞতাই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়েছে। না হলে ছেলেবেলা থেকে ঐ পর্যন্ত তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের কোনো আভাস পাওয়া যায়নি। গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রাসেল বলেছেন ঃ

> 'To build him up psychologically from European ingredients we must make a combination of early Christian saints with mediaeval ecclesiastics, adding to both, however, something of the sweetness of St. Francis.'

গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ নাৎসী কিংবা কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে সফল হতো কি না সে সম্বন্ধে রাসেল সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শেষ জীবনে আণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে নিজে লণ্ডন শহরে অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছেন। ১৯৬৩ সালে কমিটি অব হাণ্ড্রেড-এর সভাপতির পদ ত্যাগ করবার সময়ও তিনি বলেছেন: 'I am still a believer in mass civil disobedience.' নিশ্চয়ই গান্ধীজীর দৃষ্টান্ত থেকে এ বিশ্বাস তিনি পেয়েছেন।

১৯৬২ সালে চীন ভারত আক্রমণ করবার পর এ বিষয়ে তিনি জওহরলাল নেহরুকে যে চিঠি লেখেন তাতে আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছি। চীনের প্রতি রাসেলের পক্ষপাত ১৯২১ সালে সে দেশ ভ্রমণের পর থেকেই আরম্ভ হয়েছে। 'দি প্রবলেম অব চায়নায় (১৯২২)' চীন সম্বন্ধে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার অনেকগুলি যে সত্য তা এখন দেখা যায়। তাঁর চোখে চীনারা আর্টিস্টের জাত; আর্টিস্টের যেসব দোষ-ত্রুটি থাকে এই জাতটারও তাই আছে। তিনি বলেছিলেন, দারিদ্র্য চীনকে বলশেভিজমের পথে নিয়ে যাবে। পঞ্চাশ বছর আগেকার চীনের জনসাধারণ কোনো অভিযোগ না করে নীরবে সকল পীড়ন সহ্য করেছে। কিন্তু এরাই ভবিষ্যতে সমাজবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অদম্য গতিতে এগিয়ে যাবে; হয়তো দেশের সীমানার বাইরে প্রভুত্ব বিস্তারের লিপ্সাও জাগবে। নিজেদের শক্তিতেই চীনারা প্রাধান্য লাভ করবে, বাইরের কোনো শক্তির সমর্থন প্রয়োজন হবে না। সাম্প্রতিক কালের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বাড়াবাড়িতে তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন।

প্রায় একশো বছরের ঘটনাবহুল জীবনের মোটামুটি পরিচয় দেওয়াও এখানে সম্ভব নয়। রাসেল সম্বন্ধে সর্বাগ্রে যে কথাটি মনে পড়ে তা হলো, তিনি ছিলেন এক অসামান্য জীবনশিল্পী। জীবনকে ভালোবেসেছিলেন গভীরভাবে। তাই সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকলেও জীবন তাঁর কাছে কখনো দুর্বহ হয়নি। তিনি এক জায়গায় বলেছেন, মানুষ কেন অসুখী হয় তার নানা কারণ নিয়ে অনেক

আলোচনা হয়েছে। কিন্তু একঘেয়েমির ক্লান্তি যে সুখের কত বড় শত্রু তার যথার্থ গবেষণা হয়নি। একঘেয়েমিকে রাসেল কখনো কাছে ঘেঁষতে দেননি। বিয়ে করেছেন চার বার। শেষ বিয়ে হয়েছে আশি বছর বয়সে। নানা বিষয়ের বই লিখেছেন প্রায় পঁচাত্তরটি: গণিত, জ্যামিতি, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি, বিজ্ঞান, গল্প, ইত্যাদি। লেখা ছাড়া করেছেন অধ্যাপনা, সভায় ও বেতারে বক্তৃতা, দেশভ্রমণ ও সত্যাগ্রহ। তাঁর লেখা ও বক্তৃতা পাঠক ও শ্রোতাকে খুঁচিয়ে প্রতিবাদে মুখর করে তুলত। প্রতিবাদ কোনো পক্ষকেই ঝিমিয়ে পড়তে দেয় না। অবশ্য প্রতিবাদের তীব্রতা তাঁর শেষ জীবনে ছিল না। কারণ রাসেলের যেসব মতবাদ তাঁর প্রথম জীবনে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে, শেষ জীবনে দেখেছেন সমাজ তাদের মেনে নিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আণবিক অস্ত্র বন্ধ ও যুদ্ধশান্তির জন্য রাসেল সংগ্রাম করেছেন লিখে, বক্তৃতা দিয়ে এবং সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব করে।

এই অম্লান জীবন-শিখার মূল প্রেরণা তাঁর সুন্দর স্বাস্থ্য,—দেহের এবং মনের। রাসেল বলেছেন, স্বাস্থ্য ভালো রাখা নিয়ে আমি কখনো ভাবিনি। খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে বিধিনিষেধ ছিল না তাঁর। যা ভালো লেগেছে তাই খেয়েছেন। স্বাস্থ্য নিয়ে না ভাবা স্বাস্থ্যরক্ষার সবচেয়ে ভালো পথ। তাঁর একটি অভ্যাস হয়তো দেহ সুস্থ রাখবার কারণ। সেটি দৈনিক বেড়ানোর অভ্যাস। প্রতিদিন তিনি দশ-পনেরো মাইল হাঁটতেন।

রাসেলের বড় পরিচয় লেখক হিসাবে। শুধু দার্শনিক নন তিনি। দর্শন ছাড়াও অনেক বিষয়ের ওপর বই লিখেছেন। প্রথম গল্পের বই বের হয় ১৯৫৩ সালে—'স্যাটান ইন কি সাবার্বস্ অ্যাণ্ড আদার স্টোরিজ্'। পরের বছর বের হয় আর একটি গল্পের বই। 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা' ছাড়া প্রায় সব বই-ই সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের উপযোগী করে লেখা। কঠিন বিষয়কে এমন প্রাঞ্জল করে

বলবার দক্ষতা কম লেখকেরই আছে। চিন্তার স্বচ্ছতার জন্যই রচনা এমন সাবলীল হতে পেরেছে। কোনো বিষয় লিখতে বসার আগে রাসেল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর বক্তব্য কি হবে তা সম্পূর্ণ ভেবে নিতেন। লেখা শুরু করলে পাণ্ডুলিপিতে একটিও কাটাকুটি হতো না, পরিবর্তন বা সংযোজন কিছু করতেন না। পুরনো বইয়ের নতুন সংস্করণেও সাধারণত কোনো বদল হতো না। লেখকদের তিনি বলতেন, ভেবেচিন্তে যা লিখবে তা আর পরিবর্তন করবে না, বিশেষ করে অন্যের কথায়।

হেগেল কাণ্ট প্রমুখের মতো রাসেল কোনো দার্শনিকতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর চিন্তার বনিয়াদ গড়ে উঠেছে সমকালীন ইতিহাসের ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে। আজকের সমস্যা বিশ্লেষণ করেছেন এবং পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন মানব-সভ্যতার ঐতিহ্য এবং মানব-কল্যাণের আদর্শ সামনে রেখে। রাসেল বলেছেন, 'Science is what you know, philosophy is what you don't know.'

লেখার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের কি দিতে চেয়েছেন? 'I want to stand at the rim of the world and peer into the darkness beyond, and see more than others have seen, of the strange shapes of mystery that inhabit that unknown night....I want to bring back into the world of men some little bit of new wisdom.'

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন কি, কি পেতে পারি দর্শন থেকে? রাসেল বলেছেন: দর্শন আমাদের শেখাতে পারে—'how to live without certainty, and yet without being paralysed by hesitation, is perhaps the chief thing that philosophy, in our age, can still do for those who study it.'

রাসেল চেয়েছেন, রাষ্ট্রের নাগরিকরা চিন্তাশীল হবে, নিজস্ব চিন্তার সাহায্যে পথ ও কর্তব্য স্থির করবে, গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাবে না। তিনি চিন্তার স্ফুলিঙ্গ বিকীরণ করেছেন যাতে পাঠকের অন্তরে মানস-প্রদীপ প্রজ্বলিত হতে পারে। সমাজের স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা স্বাধীন চিন্তার বিরোধিতা করে।

'Men fear thought more than they fear anything else on earth—more than ruin, more even than death. Thought is subversive and revolutionary, destructive and terrible; thought is merciless to privilege, established institutions and comfortable habits; thought is anarchic and lawless, indifferent to authority, careless of the well-tried wisdom of the ages···Thought is great and swift and free, the light of the world, and the chief glory of man.'

এই জন্যই সামাজিক এবং রাজনৈতিক নেতারা আমাদের বুলি শুনিয়ে, ধ্বনি শিখিয়ে, বিধিনিষেধ আরোপ করে স্বাধীন চিন্তার পথ থেকে দূরে রাখতে চান। এই জন্যই রাসেল বলেছেন, বিবেকের নির্দেশ মেনে চলবার জন্য রাষ্ট্রের বা অন্য যে-কোনো কর্তৃত্বের আদেশ অমান্য করবার অধিকার মানুষের থাকা উচিত।

স্বাধীন চিন্তার ওপর জোর দিয়ে রাসেল ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, সমাজ বা গোষ্ঠীকে নয়। তাঁর কম্যুনিজম বিরোধিতার প্রধান কারণ রাশিয়ায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ছোট করে দেখা। ডিমো-ক্রাসির বদলে স্টালিনের আমলে প্রায় ডিক্টেটরশিপ এসে গেছে। ফেবিয়ান সোসাইটির সক্রিয় সদস্য হিসাবে সমাজবাদের ওপরে তাঁর গভীর আস্থা ছিল। কার্ল মার্ক্স-এর রচনাবলী পড়ে এবং ১৯২০ সালে রাশিয়া ভ্রমণ করে কম্যুনিজমের ওপর তাঁর বিশ্বাস চলে যায়। তাঁর মনে হয়েছে, মার্ক্স-এর চিন্তাধারা ঈর্ষা ও ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর্থিক প্রয়োজনকেই সবচেয়ে বড় করে দেখা হয়েছে।

মানুষের জীবনের অন্য দিকগুলি উপেক্ষা করে শুধু অর্থনৈতিক জীব হিসাবে তাকে দেখলে কম্যুনিজম এবং ক্যাপিটালিজমের দ্বন্দ্ব কখনো শেষ হবে না, পৃথিবীতে শান্তি আসবে না। কম্যুনিস্টরাও যে জীবনের অন্য দিকগুলি অস্বীকার করতে পারে না তার একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন রাসেল।

রাশিয়ার এক অপেরা হাউসে ট্রট্স্কির সঙ্গে পরিচয় হলো। তিনি রাসেলকে লক্ষ্য করে বললেন, 'যে যুদ্ধের বিরোধিতা করে, শান্তির কথা বলে, এ দেশে তার স্থান নেই।' তারপর নাটকে যখন একটি মধুর প্রেমের দৃশ্যের অভিনয় হচ্ছে তখন সেই কট্টর কম্যুনিস্ট নায়ক আবিষ্ট কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'এ প্রেম হলো আন্তর্জাতিক ভাষা।'

রাশিয়ার প্রতি বিরূপ ছিলেন বলে একথা কেউ যেন মনে না করেন আমেরিকার প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল। আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদকে তিনি বারবার তীব্র আক্রমণ করেছেন। অষ্টাদশ শতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীতে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, আমেরিকাও তাই করতে চাইছে।

স্বাধীন ব্যক্তি-মানস গড়ে তুলতে হলে চাই উপযুক্ত শিক্ষা। তাই রাসেল স্ত্রী ডোরার সঙ্গে একটি স্কুল পরিচালনা করেছেন শিক্ষা সম্বন্ধে পরীক্ষা করবার জন্য। সে সময় রাসেল ফ্রয়েডের এই তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন যে, ছেলেবেলার অবদমিত কামনা-বাসনা পরবর্তী জীবনে মানুষের ব্যক্তিত্বকে বিকৃত করে। সুতরাং পরবর্তী জীবন যাতে সুস্থ ও সুখী হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে রাসেল তাঁর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের যা-খুশি তাই করবার পূর্ণ সুযোগ দিয়েছিলেন। এই পরীক্ষা থেকে তিনি একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, বিভিন্ন স্তরের বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ছাত্রদের বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত। ফ্রান্সে এই ব্যবস্থা আছে বলে সেখানে প্রতিভার এত বিকাশ দেখা যায়।

বর্তমান কালের নির্মম নিরানন্দ পরিবেশে বাস করেও কি করে

সুখ ও শান্তি জয় করা যায় তার পথ বলে দিয়েছেন রাসেল. তাঁর 'দি কংকোয়েস্ট অব হ্যাপিনেস' গ্রন্থে। এখানেও দেখা যাবে সুখ বা অ-সুখের জন্য ব্যক্তিরই প্রধান দায়িত্ব।

রাসেল তাঁর তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ অনবদ্য আত্মচরিতের ভূমিকায় বলেছেন :

Three passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life : the longing for love, the search for knowledge ; and the unbearable pity for the suffering of mankind. These passions, like great winds, have blown me hither and thither, in a way-ward course, over a deep ocean of anguish, reaching to the very verge of despair.

কিন্তু হতাশার সমুদ্রে ডুবে যাননি, যেমন ডুবে মরেননি নরওয়ের সমুদ্রে এরোপ্লেন ভেঙে। বিশ্বাস তাঁকে বাঁচিয়েছে বারবার। আইনস্টাইনের কথা দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই : "আই রিগার্ড ইট অ্যাজ ফরচুনেট দ্যাট সো অ্যারিড অ্যাণ্ড ক্রুট্যাল এ জেনারেশন ক্যান ক্লেইম দিস ওয়াইজ্ অনারেবল, বোল্ড অ্যাণ্ড হিউমারাস্ ম্যান।"

রাসেলের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যটি পৃথক্‌ভাবে আলোচনার যোগ্য, কোথাও কোথাও পুনরুক্তির আশঙ্কা সত্ত্বেও।

ইংরেজী ইন্‌টেলেক্‌চুয়েলের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে বুদ্ধিজীবী একান্তই বেমানান। বুদ্ধির সাহায্যে জীবনধারণ যেমন মানুষ করে তেমনি পিঁপড়েও করে। প্রত্যেক প্রাণীকেই তা কম-বেশী করতে হয়। সুতরাং বুদ্ধিজীবী হিসাবে চিহ্নিত করে শুধু কয়েকজনকে সমাজের অন্য সকলের কাছ থেকে পৃথক করে দেখবার যুক্তি নেই।

অবশ্য প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্যের জন্য বুদ্ধিজীবী কথাটি ঘিরে একটি বিশেষ অর্থ সৃষ্টি হয়েছে। তবে যাঁরা নিজেদের বুদ্ধিজীবী বলে প্রচার করেন তাঁদের কার্যকলাপ দেখে শব্দটির উপর অনেকেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে

উঠেছেন। এই তথাকথিত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশকে সুবিধাজীবী আখ্যা দিতেই তাঁরা পছন্দ করেন।

ইনটেলেকচুয়েল কাকে বলব? যিনি গভীর জ্ঞান অর্জন করেছেন, সর্বদাই জ্ঞানের সমুদ্রে ডুবে থাকেন, তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী হলেও তাঁকে ইনটেলেকচুয়েল বলা চলে না। প্রকৃত বুদ্ধিজীবী তিনিই যিনি অর্জিত জ্ঞানকে মুক্তবুদ্ধির সহায়তায় সামাজিক কল্যাণের জন্য প্রয়োগ করেন। শুধু জ্ঞানের পুঁজিপতি হয়ে বসে থাকলে চলবে না, মানুষের কল্যাণের জন্য জ্ঞান-শাণিত বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হবে। আর কাজে লাগাতে গিয়ে জাতি, ধর্ম বা দেশের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা চলবে না।

বিদ্যা, বুদ্ধি, মনের উদারতা এবং সত্যনিষ্ঠা ও মানবকল্যাণের ব্রত আদর্শ বুদ্ধিজীবীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বোধ হয় সর্বশেষ বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্রনাথ। য়ুরোপে আছেন বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবী। কিন্তু বারট্রাণ্ড রাসেল দ্বিতীয়রহিত। যেখানেই মানুষের লাঞ্ছনা দেখেছেন, যে দেশেই হোক না কেন, রাসেল প্রতিকারের জন্য সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাঁর জীবন এই সংগ্রামের ইতিহাস। একশো বছরের কাছাকাছি পৌঁছেও তাঁর দেহ ও মন দুই-ই ছিল সচল। কেউ বিস্ময় প্রকাশ করলে বলতেন, এই সংগ্রামই আমাকে কর্মক্ষম রেখেছে। তিনিই বোধ হয় একালের শেষ বুদ্ধিজীবী।

সংবাদপত্রে বিবৃতি ছাপিয়ে বা শুধু পুস্তিকা লিখে কর্তব্য পালন করেননি, সক্রিয় প্রতিবাদের নায়ক ছিলেন তিনি মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব পর্যন্ত। শুধু বক্তৃতা দেননি, কাজ করেছেন। কত সময় দিয়েছেন এ সব কাজে, যে সময়ে দর্শনের বড় বড় বই লিখতে পারতেন,—খ্যাতি আর অর্থ দুই-ই পেতেন তাহলে।

তরুণ বয়সে ফেবিয়ান সোসাইটির সভ্য হলেন। কম্যুনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। মার্কসের চিরাগত মূল্যবোধ ও নীতিবোধের প্রতি অবজ্ঞা এবং ধর্মকে প্রাধান্য না দেওয়া ও মোহমুক্ত-

দৃষ্টিতে জীবনকে দেখবার প্রয়াস—রাসেলের বিশেষ ভালো লেগেছিল।

কিন্তু তাই বলে কোনো মতবাদেরই তিনি অন্ধ ভক্ত ছিলেন না। বিপ্লবের পরে রাশিয়া ভ্রমণ করে সেখানকার সবকিছুকেই তাঁর ভালো মনে হয়নি এবং সেকথা বলতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। কিন্তু ফেবিয়ান সোসাইটির অনেক সভ্যই পছন্দ করেননি তাঁর এই স্পষ্টবাদিতাকে। রাসেল নিজের মত বিসর্জন দেওয়া অপেক্ষা ফেবিয়ান সোসাইটি ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ মনে করেছিলেন।

বুয়র যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন রাসেল ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের সমর্থক। কিছুদিন পরে যেই জানতে পারলেন তাঁর নিজের গভর্নমেণ্টের নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিবরণ, সঙ্গে সঙ্গে তিনি যুদ্ধবিরোধী হয়ে উঠলেন। স্বদেশের দুষ্কৃতিকে দেশপ্রেমের ধাপ্পা দিয়ে সমর্থন করবার মতো দুর্মতি তাঁর হয়নি।

ত্রিশ বছর পূর্ণ হবার পূর্বেই রাসেল তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য মোটামুটি স্থির করে ফেলেছিলেন। প্রথম পদক্ষেপ, স্বেচ্ছায় নিজেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সকল সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা। যে সম্পত্তি নিজে অর্জন করেননি, সে সম্পত্তি ভোগ করবার অধিকার নেই তাঁর। যদি করেন, তাহলে সমাজবাদের কথা বলবেন কোন্ মুখে? সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে দিলেন কয়েকটি মানবকল্যাণব্রতী সংস্থার নামে। একমাত্র অবলম্বন রইলো লেখার আয় এবং অধ্যাপনার বেতন।

সম্পত্তি থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে গ্রহণ করলেন একটি আদর্শ। কি সেই আদর্শ? তাঁর কথায়ঃ

The life of man is a long march through the night, surrounded by invisible foes, tortured by weariness and pain, towards a goal that few can hope to reach, and where none may tarry long. One by one, as they march, our comrades vanish from our sight, seized by the silent orders of omnipresent

death. Very brief is the time in which we can help them, in which their happiness or misery is decided. Be it ours to shed sunshine on their path, to lighten their sorrows by the balm of sympathy, to give them the pure joy of a never-tiring affection, to strengthen their failing courage, to instil faith in their hours of despair.

এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে রাজনীতিকে একেবারে এড়ানো যায় না। বর্তমান জগতে রাজনীতির সর্বব্যাপী প্রভাব। ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে এই প্রভাব এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। কিন্তু রাসেলের মতে কোনো বুদ্ধিজীবীর কোনো রাজনৈতিক দলের সভ্য হওয়া চলে না। সভ্য হিসাবে দলের সঙ্গে যুক্ত হলে কিছুদিনের মধ্যেই গোঁড়ামি এসে যায়, আর সেই গোঁড়ামি ক্রমে আদর্শ থেকে চ্যুত করে। রাসেল রাজনৈতিক দলের সমর্থনে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সেই দলে নাম লেখাননি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাসেল শান্তির পক্ষে আন্দোলনে নেমেছিলেন। শান্তির পক্ষে আরও অনেকেই ছিলেন। কিন্তু তাঁর মতো সক্রিয় ভূমিকা আর কেউ গ্রহণ করেননি। জোরালো প্রবন্ধ ও জোরালো বক্তৃতা দিয়ে রাসেল একদিকে যেমন ব্রিটিশ নাগরিকদের সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন, তেমনি অন্যদিকে বিচলিত করেছিলেন সরকারকেও। একটি যুদ্ধবিরোধী পুস্তিকা রচনার জন্য রাসেলের জরিমানা হলো একশো পাউণ্ড। তাঁর লেখা সৈন্য সংগ্রহে বাধা সৃষ্টি করবে এবং সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ভাঙবে—এই ছিল সরকারের আশঙ্কা।

পরবর্তীকালে যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর মতামত নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের তিনি বিরোধিতা করেছেন, অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ করেছেন সমর্থন। এর কারণ কি?

রাসেলের বিশ্বাস ছিল হিটলারের ফ্যাসিজম মানবসভ্যতার

ঘোর শত্রু। সুতরাং হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সমর্থনযোগ্য। প্রথম মহাযুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে স্বার্থের সংঘর্ষ,—মানব-সভ্যতার পক্ষে সংগ্রাম নয়। এই যুক্তির মধ্যে ফাঁক থাকতেও পারে। কিন্তু রাসেলের বিশ্বাস ছিল অকৃত্রিম।

উদারপন্থী রাসেল প্রথম মহাযুদ্ধের পরে হয়ে উঠলেন সমাজবাদী। কারণ তিনি উপলব্ধি করলেন পুঁজিপতিরাই যুদ্ধ লাগাবার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-বাণিজ্য তাঁর সমাজবাদের মূল আদর্শ ছিল না। পুঁজিপতির পরিবর্তে রাষ্ট্র যদি শিল্প-বাণিজ্যের মালিক হয় তাহলে মূল অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন চাই। না হলে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পেও কর্মীর অবস্থা একই থেকে যায়। আধুনিক কালে রাষ্ট্র এবং তার উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা ক্ষমতা করায়ত্ত করবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। আরও বেশী ক্ষমতা চাই। সেই ক্ষমতালিপ্সু সরকারের তাঁবেদারে থাকলেই কি সমাজবাদ সফল হবে? সফল হবে না, এই ছিল তাঁর আশঙ্কা। তাই তিনি সমর্থন করতেন গিল্ড সোসালিজম। কর্মীরাই কারখানা চালাবে, তারাই হবে লাভ লোকসানের ভাগীদার। রাশিয়ার সমাজবাদ সম্বন্ধে তাঁর ছিল উচ্চ আশা। বলতেন, এই হতাশাময় পৃথিবীতে লেনিন ও ট্রট্স্কি দুই উজ্জ্বল বিন্দু।

কিন্তু রাশিয়া ভ্রমণের পর নানা বিষয়ে তাঁর মোহমুক্তি ঘটেছিল। ব্রিটিশ সোস্যালিস্টদের বিরূপতা সত্ত্বেও তা প্রকাশ করেছেন 'প্র্যাক্‌টিস্ অ্যাণ্ড থিওরি অব বোলশেভিজম' নামক গ্রন্থে। চীনে ব্রিটিশ নীতির নিন্দা করায় অবশ্য সোস্যালিস্টরা কিছুটা সন্তুষ্ট হয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকেই আমেরিকার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাসেল বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পান। কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ শেষ করে নিউ ইয়র্ক যেতেই তাঁর বিরুদ্ধে উঠল প্রবল আন্দোলন। এমন দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা দেবার জন্য নিযুক্ত করা যায় না। সুপ্রীম

কোর্ট রায় দিল এই অভিযোগ সমর্থন করে। শুধু যে নিউ ইয়র্ক সিটি কলেজের কাজ গেল তাই নয়, আমেরিকার কোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অধ্যাপনা করবার সম্ভাবনা রইলো না। সত্তর বছর বয়সে বিদেশে নিরুপায় হয়ে পড়লেন। সমুদ্রপথে বিপদ; দেশে ফিরে আসাও সহজ ছিল না। আয়ের একমাত্র পথ পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা। ১৯৪৪ সালে ইংলণ্ডে ফিরে আসবার সুযোগ পেলেন।

রাসেল কিন্তু সংগ্রামী মনোবৃত্তি বিসর্জন দেননি। আবার নতুন উদ্যমে আরম্ভ করলেন তাঁর কাজ। সবচেয়ে বড় কাজ পারমাণবিক অস্ত্র বন্ধ করবার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলা। বিজ্ঞানীদের এক করে আলোচনা করা দরকার প্রথমে। পৃথিবীর সকল দেশের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে চিঠিপত্র লিখে একটি বিবৃতির খসড়া ঠিক করলেন। বিজ্ঞানীদের সম্মেলন ভারতে হতে পারে কিনা তা জানতে চাইলে নেহরু খুব উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু ডঃ ভাবার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। রাসেলের আশঙ্কা হয়েছিল, 'অফিসিয়েল' বিজ্ঞানী ডঃ ভাবার জন্যই হয়তো ভারতে সম্মেলন করা সম্ভব হবে না। শেষ পর্যন্ত অন্য কারণে ভারতে সম্মেলন করবার কথা ওঠেনি।

পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করবার সমর্থনে লণ্ডনে সত্যাগ্রহ শুরু হয়। নেতৃত্ব দিলেন রাসেল। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ তাঁকে অনেক পূর্বেই আকৃষ্ট করেছিল। সেই পদ্ধতি এবার অবলম্বন করা হলো। পার্কে সভা করে মিছিল করে যাওয়া হতো সরকারী দপ্তরে। কয়েক ঘণ্টা দপ্তর অবরোধ করে রাখা হতো। রাসেল থাকতেন এঁদের সঙ্গে। বৃষ্টিবাদলকেও অগ্রাহ্য করে চলতেন মিছিলে। ক্যাম্পেন ফর নিউক্লিয়ার ডিস্‌আর্মামেন্টের তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্ট। আটাশি বছর বয়সে একটা বিবৃতি ছাপিয়ে বা প্রবন্ধ লিখে কর্তব্য শেষ করলে কেউ তাঁর নিন্দা করতে পারত না। কিন্তু তিনি সকলের সঙ্গে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। পরিণামে দু মাসের জেল হলো রাসেল দম্পতির। অভিযোগ, তাঁরা অসহযোগ আন্দোলন করবার

জন্য জনতাকে ক্ষিপ্ত করে তুলছেন।

জীবনের শেষ কুড়ি বছর ছিল সবচেয়ে কর্মময়। পৃথিবীর যেখানেই কোনো সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে তিনি কারণ অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করেছেন এবং যে-পক্ষ ন্যায়ের দিকে সকল প্রকারে তাকে সমর্থন জানাতে দ্বিধা করতেন না। দ্বিধা করতেন না অন্যায়কারীদের ধিক্কার দিতে,—সে রাষ্ট্র সাম্যবাদী হোক বা পুঁজিবাদী হোক। হাঙ্গারী, চেকোস্লোভাকিয়া, পর্তুগাল, গ্রীস, পোল্যাণ্ড, ইস্রায়েল-আরব, আফ্রিকা, চীন-ভারত, ভিয়েৎনাম, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, কিউবা ইত্যাদি সকল দেশের সমস্যাকেই তিনি স্বদেশের সমস্যার মতো সযত্নে আলোচনা করেছেন এবং সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজেছেন। ভিয়েৎনাম তাঁর শেষ জীবনের অনেকটাই অধিকার করে ছিল। 'ওয়ার ক্রাইম্‌স্‌ ইন ভিয়েৎনাম' রাসেলকে আর একবার আমেরিকা এবং তার সহযোগী রাষ্ট্রগুলির কাছে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেছে। ভিয়েৎনামে যে নৃশংস অত্যাচার সংঘটিত হয়েছে তা এমন নির্ভীকরূপে এবং এমন ক্রমাগত আর কে বলতে পেরেছেন?

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বহু ব্যক্তিকে বন্দী করে রাখা হয়েছে অন্যায় ভাবে। এঁদের অনেকেই নিরপরাধ অথবা কোনো উচ্চ আদর্শের জন্য নিঃস্বার্থরূপে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছিলেন। রাসেল এঁদের মুক্ত করবার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। চল্লিশটি দেশের সরকার ও নেতাদের সঙ্গে মুক্তির প্রসঙ্গে ক্রমাগত আলোচনা করেছেন চিঠিপত্রের মাধ্যমে। যেখানে প্রয়োজন বোধ হয়েছে নিজের প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন পৃথিবীর যে কোনো দেশে।

সমগ্র পৃথিবী ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র। তাঁর সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়নি নিগ্রো, নাগা, চীনা, ইহুদী, আফ্রিকান। মানব-কল্যাণের জন্য অসংখ্য চিঠি, প্রবন্ধ ও পুস্তিকা লিখেছেন; বক্তৃতা দিয়েছেন, সত্যাগ্রহ করেছেন, চাঁদা তোলবার জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরেছেন। দেশের ও বিদেশের সরকারের বিরাগভাজন হতে তাঁর কোনো

দ্বিধা ছিল না। অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন যখনই দেখেছেন তাদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে নিঃস্বার্থ মানব-কল্যাণের প্রকৃত যোগ নেই। এই কারণেই কোনো কোনো পুরস্কার ও সম্মান প্রত্যাখ্যান করেছেন।

শতবর্ষের প্রান্তে পৌঁছেও সংগ্রামের শক্তি পেতেন কোথা থেকে? মানবতার শত্রুদের প্রতি ঘৃণাই তাঁকে শক্তি যোগাত। কারণ, "Without some admixture of hatred one becomes soft and loses energy."

তাছাড়া তিনি বিশ্বাস করতেন প্রতিবাদই জীবন, মেনে নেওয়া মৃত্যু: "Conformity means death, only protest gives a hope of life."

নিজের আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা থাকবার ফলে অনেক সময় তাঁকে কঠোর হতে হয়েছে। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ছিল তাঁর মতবিরোধ। তিনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। রাসেলের বন্ধুরা বললেন, কিছু ফুল নিয়ে ওঁর সঙ্গে এ সময় দেখা করলে বেশ হয়। রাসেল অস্বীকার করে বললেন, না, হাসপাতালে আছে বলেই ভাণ করতে পারব না। যার সঙ্গে মিল নেই অসুস্থ হয়েছে বলে হঠাৎ তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে পারে না।

রাসেলের চরিত্রের এই দিকটা সংক্ষেপে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন বিয়াট্রিস ওয়েব: "Compromise, mitigation, mixed motives, phases of health of body and mind, qualifying statements, uncertain feelings, all seem unknown to him. A proposition must be true or false; a character good or bad; a person loving or unloving, truth-speaking or lying."

রাসেলের আদর্শ অনুসরণ করে মানব-কল্যাণের কাজ যাতে তাঁর মৃত্যুর পরও চলতে পারে এই উদ্দেশ্যে বারট্রাণ্ড রাসেল পীস্ ফাউণ্ডেশান এবং আটলান্টিক পীস্ ফাউণ্ডেশান নামে দুটি সংস্থা

স্থাপিত হয়েছে।

কিন্তু রাসেলের অনন্য ব্যক্তিত্বের স্ফুলিঙ্গ এরা পাবে কোথায়? কোনো প্রতিষ্ঠানই এমন বিরাট ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত হতে পারে না। রাসেলের মতো বুদ্ধিজীবী পৃথিবী আবার পাবে তার কোনো সম্ভাবনা তো দেখা যায় না। তাঁর পরবর্তী কালের বুদ্ধিজীবীরা সরকার ও অবস্থা বদলের সঙ্গে সঙ্গে অতি সহজেই মত বদলাতে পারেন। নিজেদের আদর্শে যে বুদ্ধিজীবীদের অটল বিশ্বাস নেই পৃথিবী কি পাবে তাদের কাছ থেকে?

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কি? রাসেল তাঁর আত্মচরিত সমাপ্ত করেছেন সেই প্রশ্ন দিয়ে। নিজে এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উদ্ধৃত করেছেন শেলীর এই লাইন কটি:

Oh, cease! must hate and death return?
Cease! must men kill and die?
Cease! drain not to its dregs the urn
Of bitter prophecy.
The world is weary of the past,
Oh, might it die or rest at last!

ইভো আন্দ্রিচ

১৮৯২—১৯৭৫

আধুনিক যুগোস্লাভ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ইভো আন্দ্রিচ (Ivo Andrić) ১৯৬১ সালের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। যুগোস্লাভ সাহিত্যের পরিচয় আমাদের সামান্যই জানা আছে; বিশেষ করে আন্দ্রিচের নাম এদেশে একেবারেই অপরিচিত ছিল। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ১৯৫৮ সাল থেকে তিনি পরিচিত হতে আরম্ভ করেছেন। আটান্ন-উনষাট সালে পর পর তাঁর দু'খানি উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ হয়। অনুবাদের মাধ্যমে তাঁর খ্যাতি বিস্তার লাভ করবার পূর্বেই এল এই অপ্রত্যাশিত সম্মানের ঘোষণা।

যুগোস্লাভিয়া বলকান উপদ্বীপের একটি রাষ্ট্র। বলকান যুদ্ধবিগ্রহের দেশ। মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য যে শান্তি অত্যাবশ্যক বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ বলকান তার সুযোগ পায়নি। পঞ্চদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই অঞ্চল ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। তার ফলে মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে খ্রীষ্টান ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরোধ দীর্ঘকাল যাবৎ বলকানবাসীর জীবন বিক্ষুব্ধ করেছে। যুগোস্লাভিয়ার সংস্কৃতি ও সাহিত্যে এই বিরোধের প্রভাব এখনো সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। অটোমান সাম্রাজ্যের পর যুগোস্লাভিয়া অন্তর্ভুক্ত হলো অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের। ১৯১৮ সালে যুগোস্লাভিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যুগোস্লাভিয়ায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়; তার পূর্বে ছিল রাজতন্ত্র।

যুগোস্লাভিয়ার আয়তন প্রায় ছিয়ানব্বই হাজার বর্গমাইল: অসমতল পার্বত্য দেশ। জনসংখ্যা এক কোটি সত্তর লক্ষ। এতটুকু দেশের প্রধান ভাষা তিনটি—স্লোভেন্স, ম্যাসিডোনিয়ান ও সার্বো-

ক্রোট। সবচেয়ে সমৃদ্ধ সার্বো-ক্রোট। আন্দ্রিচ এই ভাষার লেখক।

সমগ্র বলকান,—বিশেষতঃ যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র য়ুরোপের রাজনৈতিক ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। য়ুরোপে যুদ্ধ বা রাজনৈতিক বিক্ষোভ আরম্ভ হলে যুগোস্লাভিয়ার উপায় নেই দূরে থাকবার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যুগোস্লাভিয়ার জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। যুগোস্লাভিয়ার ঘটনাবহুল বিক্ষুব্ধ ইতিহাসই আমাদের নিকট বড় হয়ে দেখা দিয়েছে; সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচয় অন্তরালে রয়ে গেছে। প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও আন্দ্রিচ যে প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস রচনা করে নোবেল কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন তা প্রকৃতই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। যখন জার্মান বোমা বেলগ্রেড শহর ও অন্যান্য অঞ্চল বিধ্বস্ত করছে তখন আত্মসমাহিত হয়ে আন্দ্রিচ রচনা করেছেন তাঁর কয়েকটি অসাধারণ উপন্যাস।

বোস্‌নিয়ার অন্তর্গত ট্রাভনিকে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর ইভো আন্দ্রিচ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন স্বল্প আয়ের কারিগর। আন্দ্রিচের বয়স যখন মাত্র দু'বছর তখন তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। পারিবারিক কারণে তাঁকে চলে আসতে হয় ছোট শহর ভিশেগার্ড। আন্দ্রিচের শৈশব কেটেছে ভিশেগার্ডের সমাজ ও চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে এখানকারই স্কুলে। পরবর্তী জীবনে ভিশেগার্ডের জীবন নিয়ে লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা'।

আন্দ্রিচের মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হয় সারাজেভোর বিদ্যালয়ে। এর পর দর্শনশাস্ত্র পড়বার জন্য তিনি ভিয়েনা, জাগ্রেব, ক্রাকোভো প্রভৃতি স্থানে ঘুরেছেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন গ্রাৎস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

কিন্তু তাঁর পড়াশুনা মাঝপথে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল রাজনৈতিক কারণে। যুগোস্লাভ জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকবার 'অপরাধে' অষ্ট্রিয়ান কর্তৃপক্ষ আন্দ্রিচকে প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়াতেই বন্দী করেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর জেল থেকে বেরিয়ে এসে নতুন

করে পড়া আরম্ভ করলেন। পড়া শেষ করে যুগোস্লাভ সরকারের কূটনৈতিক দপ্তরে পেলেন চাকরি। কার্যোপলক্ষে তাঁকে কিছুকাল করে থাকতে হয়েছে রোম, বুখারেস্ট, মাদ্রিদ, জেনিভা ও বার্লিন শহরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার সময় আন্দ্রিচ ছিলেন বার্লিনে। বার্লিন ত্যাগ করে দেশে পৌঁছবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বেলগ্রেড শহরের উপর পড়েছিল জার্মান বোমা।

যুদ্ধের পর যুগোস্লাভিয়ায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েক বছর তিনি পীপলস্ অ্যাসেম্বলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যুগোস্লাভ লেখক সংঘের সভাপতিত্বও তিনি করেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্ত থেকে দূরে নিভৃতে সাহিত্যচর্চা করতেই তাঁর ভালো লাগে। ব্যবহারিক জীবনে আন্দ্রিচ যতটুকু সাফল্য অর্জন করেছেন তা একান্তই নিজের উদ্যম ও অধ্যবসায়ের ফল।

সতেরো-আঠারো বছর যখন বয়স তখন থেকেই আন্দ্রিচের কবিতা, প্রবন্ধ এবং অনুবাদ যুগোস্লাভিয়ার জনপ্রিয় সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হতে থাকে। জেলে যাবার আগে তিনি হুইটম্যানের কবিতা অনুবাদ করেছেন। অথচ সে সময় হুইটম্যানের কবিমানসের ঠিক বিপরীত ছিল আন্দ্রিচের মানসিক অবস্থা। হুইটম্যানের কবিতার অনুবাদ বৈপরীত্যের প্রতি আকর্ষণের দৃষ্টান্ত।

আন্দ্রিচের প্রকৃত সাহিত্যচর্চা আরম্ভ হয় জেলের ভিতরে। ব্যক্তিগত জীবনের গভীর বেদনার অনুভূতি থেকে তিনি পেয়েছিলেন লেখার প্রেরণা। দুঃখ, দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন কেটেছে। যৌবনে পদার্পণ করে যুক্ত হলো একটি নতুন যন্ত্রণা। অনুভব করতে শিখলেন পরাধীনতার জ্বালা। এই জ্বালা প্রকাশ করবার অভিযোগে বিদেশী সরকারের প্রতিনিধিরা তাঁকে অনন্ত জীবন-প্রবাহ থেকে ছিঁড়ে এনে কারাগারের শীতল পরিবেশে রাখল। কবে মুক্তি পাবেন, কোনোদিন পাবেন কিনা—কেউ জানে না।

এর ফলে আন্দ্রিচ গভীর দুঃখবাদী হয়ে উঠলেন। তাঁর মনে হলো,

জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শুধু দুঃখময়। একমাত্র নিজের অভিজ্ঞতার ফলেই যে জীবন কালো হয়ে গেল তা নয়। কির্কেগারের (Soren Kierkegaard) একটি বই লুকিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন জেলের মধ্যে। নিঃসঙ্গ বন্দী জীবনে এই একটি মাত্র বই তাঁর কাছে হলো জপমন্ত্রের মতো। প্রতিদিন বারবার পড়ে কির্কেগারের অস্তিবাদ তাঁর মজ্জাগত হয়ে গেল। বেদনার শরশয্যা আশ্রয় করে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করাই জীবন। তাই জেলে বসে আন্দ্রিচ লিখলেন: জীবনে বেদনাই একমাত্র সত্য; দুঃখ ছাড়া আর সবই অলীক; জলের প্রতিটি বিন্দুতে, প্রতিটি ঘাসে, স্ফটিকের প্রতি পলে, প্রতিটি কণ্ঠস্বরে কেবল দুঃখ ও যন্ত্রণার প্রকাশ; কি নিদ্রায়, কি জাগরণে; জীবনে, জীবনের পূর্বে এবং হয়তো জীবনের পরেও—এই বেদনার অস্তিত্বটাই একমাত্র সত্য।

বন্দী জীবনের রচনাগুলি ১৯১৮ ও ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় Ex Ponto ও Unrest নামে। এ দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রধানতঃ গদ্যকবিতার সংকলন। এদের মধ্যে আন্দ্রিচ নিজেকে প্রকাশ করেছেন অকুণ্ঠভাবে। ব্যক্তিগত জীবনের বেদনা এবং জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে নানা জিজ্ঞাসা কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য। 'এক্স পণ্টো'-তে কবি বলেছেন: Encircled by an alien and hardly well-meaning world, I withdrew into myself and felt alone and abandoned, alone beneath the vast indifferent sky, outside any community, any society, and so I have always lived, unprotected by the privileges of any class, without occupation, without a future, without family or friends who could help me. Alone, outcast, ill.

আন্দ্রিচ তাঁর হৃদয়কে তুলনা করেছেন কালো জলের হ্রদের সঙ্গে। কারো কলসীর স্পর্শে সে জলে ঢেউ ওঠে না, কালো জলে কারো ছবির প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে না।

সমকালীন জীবনের প্রতিটি ঘটনা এবং পরিচিত মানুষের সঙ্গ দুঃখের কারণ। এই জীবন কেমন?

For me and for my age there is no expression :
Paces unnumbered in a narrow cell,
Day after day, eyes full of fear,
Maddened hell of my times, break-up and
end of everything.

সমকালীন জীবনের যন্ত্রণা প্রেতচ্ছায়ার মতো কবির নিদ্রাহীন রাত্রিগুলি আতঙ্কিত করে তোলে :

Nightly the knavish guests arrive,
Unseen, unheard,
And fill with burning sand
My mouth and eyes....

বর্তমান জীবনের বেদনা এড়াবার উপায় অতীতের দিকে মুখ ফেরানো। আন্দ্রিচ বলেছেন : দুঃসহ দুর্দিনে যখন অন্তঃসারশূন্য কথা এবং বিকৃত আদর্শ সান্ত্বনা দিতে পারে না তখন শান্তি পাই পূর্বপুরুষদের মঙ্গলময় উত্তরাধিকার থেকে। তাঁদের দেহ পড়ে আছে পুরনো কবরখানায় কিন্তু তাঁদের গুণগুলি রোপণ করে গেছেন আমাদের আত্মার জমিতে। তাই আত্মার গভীরে অনুসন্ধান করলে শাশ্বত জীবনের ধারা উপলব্ধি করা যায়।

প্রথম মহাযুদ্ধ কোনো বিশেষ দেশ কিংবা জাতির জয় অথবা পরাজয় নির্দেশ করে না। আন্দ্রিচ যুদ্ধের মধ্যে দেখেছেন সমগ্র মানবজাতির পরাজয়। আত্মবিধ্বংসী সমাজে তাই তাঁর মন আশ্রয় খুঁজে পায়নি। 'এক্স পন্টো'তে কবি নিজেকেই প্রশ্ন করেছেন : এই নিষ্ঠুর সংসার এবং দুর্বল মানুষের সঙ্গে তোমার মনের শান্তি যুক্ত করেছ কেন? কেন আঙুল দিয়ে সুখ স্পর্শ করতে চাও? পৃথিবী ছাড়িয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে আরো দূরে কেন তাকাও না?

আন্দ্রিচের কবিতা প্রথম শ্রেণীর এমন কথা বলা যায় না। অন্ততঃ

আজ আন্দ্রিচের কবিতা সম্বন্ধে তাঁর দেশবাসীর খুব আগ্রহ নেই। তবে একথা মনে করা ভুল হবে যে, অনেক লেখকের মতো আন্দ্রিচ কবিতা দিয়ে সাহিত্যজীবন শুরু করেছিলেন, এবং উপন্যাস-শাখায় সাফল্য লাভ করবার পর তা একেবারেই হারিয়ে গেছে। কবি আন্দ্রিচ ও ঔপন্যাসিক আন্দ্রিচের মধ্যে নিবিড় যোগ রয়েছে। উপন্যাসের সম্পূর্ণ রসোপলব্ধির জন্য তাঁর কাব্যের পরিচয় প্রয়োজন। কবির মন যে জীবন-জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল হয়েছে, ঔপন্যাসিক তার উত্তর দিয়েছেন।

ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ, দারিদ্র্য, কারাবাস ও ভগ্নস্বাস্থ্যের যন্ত্রণা থেকেই আন্দ্রিচের অধিকাংশ কবিতার জন্ম হয়েছে। আত্মতান্ত্রিক কবি ছোটগল্পে বিষয়তান্ত্রিক হয়েছেন দেখতে পাই। এই রূপান্তর উপন্যাসে সম্পূর্ণ হয়েছে।

উপন্যাস ও ছোট গল্প মিলিতভাবে আন্দ্রিচের জীবনোপলব্ধিকে পূর্ণ করেছে। তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা'য় নরনারীর সম্পর্কের চিত্র প্রায় অনুপস্থিত। এই অভাব পূর্ণ হয়েছে ছোট গল্পে। আনিকা এবং গণিকা মারার কাহিনী আমাদের দিয়েছে দুটি বিস্ময়কর নারীচরিত্র। আন্দ্রিচ যে-সব গল্পে নারীচরিত্রের প্রাধান্য দিয়েছেন নারী সেখানে যৌনানুভূতির দ্বারা গভীররূপে প্রভাবান্বিত। পুরুষকে বাঁধবার প্রধান অস্ত্র যৌন আকর্ষণ। তাই আন্দ্রিচ বলেছেন, অন্য সব দুর্ভাগ্য ঠেকানো যায়, ঠেকানো যায় না নারীর আকর্ষণকে। পুরুষের মুক্তির পথ রুদ্ধ করে রেখেছে নারীদেহ।

১৯২৪ থেকে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আন্দ্রিচের তিনটি গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয়। ১৯৩৬ সালে তাঁর লেখক-জীবনের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটে। এই পর্বে তাঁর দান—যুগোস্লাভ সাহিত্যে গদ্যকবিতার প্রবর্তন এবং অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর ছোটগল্প রচনা।

দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হয় ১৯৩৯ সাল থেকে। যুগোস্লাভিয়া এবং য়ুরোপের জীবন যখন যুদ্ধের আঘাতে বিপর্যস্ত তখন একান্ত নির্লিপ্ত চিত্তে আন্দ্রিচ রচনা করেছেন তাঁর তিনটি অনন্যসাধারণ উপন্যাস।

বর্তমান পীড়াদায়ক; তাই সৃষ্টির আনন্দে ডুবে থেকে বর্তমানকে তিনি ভুলতে চেয়েছিলেন। বর্তমান জীবনও তাঁর উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করেনি। 'বোসনিয়ান স্টোরি' ও 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা' বিগত দিনের কাহিনী। 'মিস এক্স' বা 'অজানিতা' ঐতিহাসিক গল্প না হলেও যুদ্ধ অনুপস্থিত। এই তিনটি উপন্যাসই যুদ্ধ শেষ হবার অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয়েছে।

বোসনিয়ার রাজধানী ট্রাভনিক 'বোসনিয়ান স্টোরি'র পটভূমি। কাহিনীর সময় ১৮০৭ থেকে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ। এই শহরে ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার দূতাবাস ছিল। নেপোলিয়নের পরাজয়ের সাত-আট বছর পূর্বে ফ্রান্সের দূত হয়ে ট্রাভনিকে এলেন জঁ। দাভিল। অষ্ট্রিয়ান দূতের নাম ভন মিত্তেরার। নাগরিকদের নিকট এঁরা পেলেন বিরূপ অভ্যর্থনা। দাভিল শহরে পৌঁছবার পর মুসলমান জনতার কাছ থেকে পেলেন ধিক্কার ও অপমান। নেপোলিয়ন পোপের বিরুদ্ধাচরণ করবার ফলে দাভিল শহরের ক্যাথলিক নাগরিকদের কাছ থেকেও পেলেন ঘৃণা। অষ্ট্রিয়ান দূতও ক্যাথলিক বাদে অন্য সকলের নিকট পেলেন অবজ্ঞা। অথচ এই বিরূপ পরিবেশের মধ্যেও দুই দেশের দুই দূতকে সপরিবারে বাস করতে হয়েছে দীর্ঘ সাত বছর। এই দিক থেকে দুজনের মধ্যে মিল আছে; কিন্তু নিজের নিজের দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য আবার দুজনের মধ্যে সর্বদাই ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দাভিল। ট্রাভনিকের অস্বস্তিকর জীবনযাত্রার মধ্যেও সাহিত্যচর্চা করে। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সে লিখতে বসে আলেকজাণ্ডারের জীবনের মহাকাব্য। বিরাট পরিকল্পনা। প্রেরণা নেই, তবু সে পরিকল্পিত মহাকাব্যের বৈচিত্র্যহীন লাইনগুলি রুটিন করে লিখে চলে। শিল্পকে রুটিনে পর্যবসিত করাই তার জীবনের ট্র্যাজেডি।

দুই দূতের কথাই সব নয়। বোসনিয়ার জনসাধারণের দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা এবং অনগ্রসরতাও নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। ছোটখাটো বহু ঘটনা ও বহু তথ্যের সমাবেশ পাঠককে অভিভূত করে। কাহিনীর

প্রতিটি চরিত্র এবং ঘটনা ইতিহাস থেকে সমর্থন করা যেতে পারে।

'বোসনিয়ান স্টোরি'র আঙ্গিক এবং চরিত্রচিত্রণ অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় অনেক উন্নত। কিন্তু নোবেল কমিটি পুরস্কার দেবার যে-কারণ ঘোষণা করেছেন তা 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা' সম্বন্ধেই বিশেষরূপে প্রযোজ্য। আন্দ্রিচ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন "for the epic force with which he has depicted themes and human destinies from the history of his country."

'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা' যে এপিকের গুণসম্পন্ন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুদীর্ঘ চার শত বছরের ইতিহাস নিয়ে কাহিনী রচিত হয়েছে; অসংখ্য চরিত্রের মিছিল পাঠকের সামনে দিয়ে চলে যায়; আর কাহিনী সমাপ্ত করবার পর জীবন সম্বন্ধে গভীর ভাবনা পাঠকের মন আচ্ছন্ন করে।

১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দ। বোসনিয়া তখন অটোম্যান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। বোসনিয়ার খ্রীষ্টান অধিবাসীদের সম্রাটকে দিতে হত 'রক্ত-কর'। অর্থাৎ পালা করে প্রতি বছর কিশোর বালকদের দিয়ে দিতে হত সম্রাটকে। চিরদিনের জন্য দেওয়া। বাড়ির সঙ্গে তাদের আর সম্পর্ক থাকত না। মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে নতুন নাম দিয়ে এদের সম্রাটের কাজে ভর্তি করা হত।

এমনি একদল কিশোরকে বোসনিয়ার পথ দিয়ে সম্রাটের কর্মচারীরা নিয়ে চলেছে ইস্তানবুল। একটু দূরে থেকে কয়েকজন নারী তাদের অনুসরণ করছে। দীর্ঘ পথ চলার ক্লান্তিতে, অনাহারে এবং গভীর শোকে তারা প্রায় উন্মাদিনী। কেঁদে কেঁদে তাদের চোখ মুখ ফুলে উঠেছে। ঐ যে সামনে চলেছে বন্দী কিশোরদল, তাদের মধ্যে আছে কারো ছেলে বা ভাই। যতক্ষণ সম্ভব দেখবে বলে পিছে পিছে আসছে। কিন্তু বেশী নিকটে যেতে পারে না। পাহারাদার লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে আসে। ড্রিনা নদীর তীরে এসে থামতে হলো। রাজকর্মচারীরা সদলবলে পার হয়ে গেল। তাদের

ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক ছিল। এ-পাড়ে পড়ে রইল মা-বোনেরা।

এই কিশোরদের মধ্যে একজন কর্মদক্ষতার জন্য সুলতানের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। সুলতান নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন তার সঙ্গে। অটোম্যান সাম্রাজ্যের সে এখন এক শক্তিশালী স্তম্ভ। কোথায় কোন গ্রামে বাড়ি ছিল এখন মনে নেই; ভুলে গেছে মা-বাবার নাম; ভুলে গেছে তাঁরা কি-নামে আদর করে তাকে ডাকতেন। এখন সে মহম্মদ পাশা সোকোলি নামে বিখ্যাত।

সোকোলির বয়স হয়েছে ষাট। পরিপূর্ণ জীবন। অর্থ, যশঃ, পারিবারিক শান্তি—কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু কিছুকাল যাবৎ বুকে একটা তীব্র বেদনা দেখা দেয় মাঝে মাঝে। কিছুক্ষণ থাকে, তারপর চলে যায়। চিকিৎসায় ফল হয় না। একদিন এমনি এক বেদনার আক্রমণে যখন আচ্ছন্ন হয়ে বিছানায় শুয়েছিল তখন একটা পুলের ছবি ভেসে উঠল। যেন স্বপ্ন দেখছে, নদীর উপর পাথরের তৈরী একটা পুল,—তার উপর দিয়ে কত লোক চলাচল করছে। তন্দ্রার মধ্যেই শুনতে পেল কে যেন বলছে, ড্রিনা নদীর উপর একটা পুল তৈরী করে দাও, তাহলে তোমার ব্যথা সেরে যাবে।

মা পার হতে পারেননি ড্রিনা নদী, আসতে পারেননি তার সঙ্গে। মার সেই নিরুপায় কান্না কিশোরের অবচেতন মন আশ্রয় করে সংগোপনে বেঁচে আছে এতদিন। সে কান্না আজ বুক ভেঙে বের হতে চায়। সোকোলি ঘোষণা করল, ড্রিনা নদীর উপর পুল তৈরী করা হবে। রাজকোষের অর্থে নয়, সম্পূণ ব্যয় বহন করবে সে নিজে।

ড্রিনা পার্বত্য নদী। ছোট, কিন্তু তীব্র তার স্রোত। বোসনিয়া ও সার্বিয়ার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে এই নদী। ছোট গ্রাম ভিশেগার্ড নির্বাচিত হলো। পুল তৈরী হবে এখানে। পুল তৈরী হলে শুধু যে বোসনিয়ার সঙ্গে সার্বিয়া যুক্ত হবে তাই নয়, প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের মিলনের পথ হবে সহজ।

গ্রীস থেকে, রোম থেকে, আরও অনেক জায়গা থেকে খুঁজে

খুঁজে আনা হলো পাথরের কাজ জানা মিস্ত্রী ও কারিগর। শ্বেত পাথরের বড় বড় খণ্ড এসে পৌঁছল; এল নানারকম মাল-মসলা যন্ত্রপাতি। ভিশেগার্ড হঠাৎ সরগরম হয়ে উঠল, গ্রাম ক্রমশঃ শহর হয়ে উঠতে লাগল। পুলের কাজ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পড়েছে আবিদাগার উপর।

স্থানীয় লোক বিশ্বাস করতে পারে না যে ড্রিনার উপর সত্যি কখনো পুল হবে। ভগবানের ইচ্ছা নয় মানুষ ড্রিনার জলস্রোতের উপর দিয়ে হেঁটে যাবে। সে ইচ্ছা থাকলে তিনি নদী সৃষ্টি করলেন কেন? জলপরীরা নিশ্চয়ই বাধা দেবে।

আবিদাগার আদেশে চারপাশের খেতখামার থেকে কৃষকদের ধরে আনা হলো। পুল তৈরীর কাজে বেগার খাটতে হবে। পড়ে রইল চাষাবাদের কাজ। জবরদস্তিটা বেশি হলো খ্রীষ্টান প্রজাদের উপর।

একে একে তিন বছর পার হয়ে গেল। কাজ যে কতদূর অগ্রসর হচ্ছে তা বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। লোকের মনে সন্দেহ দৃঢ় হলো,—ড্রিনা নদীর উপরে পুল তৈরী করা সম্ভব নয়। কিন্তু আবিদাগা তার তাড়না শিথিল করেনি। বেগার খাটিয়ে নিচ্ছে কঠোরভাবে। শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠছে। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস করে না। শুধু রাদিসাভ গোপনে সকলকে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করে। আর কতদিন এই অত্যাচার সহ্য করা যায়? রাদিসাভ নিজেই প্রতিশোধ নেবার সংকল্প করল। দিনে যতটুকু কাজ হয় রাত্রির অন্ধকারে রাদিসাভ তা ভেঙে দিয়ে আসে। শহরে গুজব রটল নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং পুলের কাজ ভেঙে দিয়ে যান। তিনি পুল করতে দেবেন না।

আবিদাগা চতুর লোক। গুজবে তার বিশ্বাস নেই। রাত্রিতে কড়া পাহারা বসাবার ফলে রাদিসাভ ধরা পড়ল। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তার ওপর চলল বর্বরোচিত অত্যাচার। তারপর পুল যেখানে তৈরী হচ্ছে সেখানে শূলে চড়ানো হলো। জল্লাদ খুব ওস্তাদ; তাই শূলের ওপর অনেকক্ষণ বেঁচে রইল রাদিসাভ। মুমূর্ষু

রাদিসাভের শেষ অসংলগ্ন কথা ঃ তুর্কীরা—তুর্কীরা—পুল।

আকাশের পশ্চাৎপটে অনেক উঁচুতে শূলের উপরে যন্ত্রণাবিদ্ধ রাদিসাভ দর্শকদের মনে অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করল। প্রকাশ্যে কিছু বলতে না পারলেও মনে মনে সবাই রাদিসাভকে শহীদ বলে স্বীকার করে নিল।

এরপর নতুন তত্ত্বাবধায়ক এল। এবার পুলের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলল। পুল সমাপ্ত হলো একদিন, বাঁধা পড়ল নদীর দুই তীর। বিরাট ভোজ দিয়ে পুল-সমাপ্তি-উৎসব সম্পন্ন হলো। ঐ অঞ্চলের কেউ নিমন্ত্রণ থেকে বাদ পড়ল না। সাদা পাথরে তৈরী ঝকঝকে সুন্দর পুলের রূপে সকলে মুগ্ধ। আকাশে উড়বার এবং জলের উপর দিয়ে চলবার বাসনা মানুষের চিরদিনের। এই পুল তার একটি বাসনা সফল করল। সেই আনন্দে সবাই মত্ত। রাদিসাভের স্মৃতি সেই আনন্দ ম্লান করতে পারল না।

এ পর্যন্ত কাহিনীর গতি দ্রুত, পাঠকের কৌতূহলও থাকে অক্ষুণ্ণ। তার পর থেকে কাহিনী ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। উত্তেজনা ও ঔৎসুক্য প্রায় অনুপস্থিত। সমতল ভূমির শান্তগতি নদীর মতো।

নদী পার হবার জন্য দূরদূরান্ত থেকে কত লোক আসে এই পথ দিয়ে। পুল হওয়ায় সুবিধা হলো ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের। ভিশেগার্ড ক্রমশঃ বড় শহরে পরিণত হলো। এই অঞ্চলের জীবন এখন থেকে আবর্তিত হতে লাগল পুলকে কেন্দ্র করে। এই পুলের উপর দিয়ে বিয়ের শোভাযাত্রা এবং মৃতের শোকযাত্রা যায়; যুদ্ধের সময় সৈন্যের দল কুচকাওয়াজ করে এপার-ওপার হয়; শত্রুসৈন্য ঠেকাবার জন্য পুলের মুখে বসে সামরিক পাহারা। শুধু কি প্রয়োজন মেটায়? ভিশেগার্ডের নাগরিকদের নিকট পুলটি বন্ধুর মতো। পুলের উপর প্রশস্ত খোলা জায়গা রাখা হয়েছে। বেঞ্চ আছে বসে গল্পগুজব করবার। যারা বেড়াতে আসে তাদের জন্য খোলা হয়েছে কফি ও ফলের দোকান। ভিশেগার্ডের নাগরিকরা এখানে আসে আড্ডা জমাতে। অনেক বিষয়ের পরামর্শও এখানেই

হয়। কত লোকের ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখের স্মৃতি পুলের সঙ্গে অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত হয়ে পড়েছে! ভিশেগার্ডের সেরা সুন্দরী ফাতা, তার নামে শহরের তরুণরা উন্মত্ত হয়ে ওঠে। প্রেমহীন বিয়ের বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পাবার জন্য শ্বশুরবাড়ি যাবার পথে পুলের উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে আত্মহত্যা করেছিল। পুলের উপর পাহারারত তরুণ সৈনিক ফেড়ুন বোরখা-পরা এক তুর্কী মেয়ের কালো চোখ দেখে যে ভুল করেছিল তার জন্য তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল প্রাণ দিয়ে। পুলের সংলগ্ন হোটেলে ইহুদী তরুণী লোটি হিসাব পরীক্ষা করে। তার সুগঠিত দেহ কত পুরুষের হৃদয় উন্মনা করে; কিন্তু লোটির মনে কোনো চাঞ্চল্য নেই। সে রাত জেগে শুধুই টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাব রাখে।

এই পুলকে কেন্দ্র করে বোসনিয়ার ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে। কত যুদ্ধ হলো, কত রাজা এল আর গেল! সবকিছু ড্রিনা নদীর পুলের উপর ছায়া ফেলেছে।

এল নতুন যুগ। ভিশেগার্ড শহরে মিউনিসিপ্যালিটি হলো। সেখানকার শ্রমিকেরা করেছে ট্রেড ইউনিয়ন। বিজ্ঞানের দান পৌঁছে গেছে এত দূর অঞ্চলেও। ভিশেগার্ডের পথঘাট এবং পুল বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত হয়েছে। পুলের ধারেই আছে ঝরনা। এতদিন সবাই ভিড় করে আসত ঝরনার জল নিতে। এখন বাড়ি বাড়ি গেছে জলের কল। ঝরনা এখন পরিত্যক্ত। আর এসেছে রেলপথ। একেবারে পুল পর্যন্ত।

আগে মেয়েরা পুলের উপর বেড়াতে আসত না। নতুন কালের মেয়েরা লেখাপড়া শিখে অসংকোচে চলাফেরা করে। পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে পুলের উপর বেড়াতে আসে। শিক্ষিকা জোরকার বিয়োগান্ত প্রেমের সূচনা হয়েছিল এই পুলের উপর।

জীবনের এই নব রূপায়ণ আলিহোজার ভালো লাগে না। সে আতংকিত হয়ে ওঠে। জীবন বড় দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। আলিহোজা সেই পরিবারের শেষ বংশধর, যে-পরিবারের কর্তার

উপর সাড়ে তিনশত বৎসর পুর্বে এই পুল রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হয়েছিল। আলিহোজা এখন বৃদ্ধ; ভিশেগার্ড শহরে একটি দোকানের মালিক সে। দোকানে বসে চাইলেই পুল দেখা যায় সাদা পাথরের পুল রোদে ঝক্‌ঝক্‌ করছে, নীচে বয়ে চলেছে ড্রিনা নদী। আলিহোজা মাঝে মাঝে চুপ করে চেয়ে থাকে।

নদীর জলের মতো মানুষের জীবনের ধারা বয়ে চলে। রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। ব্যক্তি জীবনের স্রোতে হারিয়ে যায়। তবু জীবন চিরন্তন, তার ক্ষয় নেই। ড্রিনার জলধারা, জীবনের গতিপ্রবাহের এবং নদীর উপরকার অচঞ্চল পুলটি জীবনের চিরন্তন অংশের প্রতীক: life was an incomprehensible marvel, since it was wasted and spent, yet none the less it lasted and endured like the bridge on the Drina.

১৯১৪ সালের গ্রীষ্মকাল। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ভিশেগার্ড এবং পুল এখন অস্ট্রিয়ান সেনাবাহিনীর হাতে। শহরে থমথমে ভাব। বাজারে দোকানপাট বন্ধ। আলিহোজা দোকানের দরজা বন্ধ করে ভিতরে বসে আছে। শুনতে পাচ্ছে দূর থেকে কামানের গোলা এসে পড়ছে ড্রিনার জলে, পুলের উপর। হঠাৎ প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে আলিহোজা অজ্ঞান হয়ে পড়ল। জ্ঞান হবার পর সামনে চেয়ে দেখল পুলের মাঝখানটা ফাঁকা,—শত্রুর গোলায় পুল ভেঙে গেছে। আলিহোজার জীবনের ভিত্তিভূমি টলে উঠল। এই পুল কখনো ভাঙতে পারে তা কল্পনাও করেনি। পূর্বপুরুষের কাছ থেকে সে পেয়েছে পুলের অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে সুদৃঢ় বিশ্বাস। বিশেষ একজন মানুষ এবং তার কীর্তি হারিয়ে যাবে; কিন্তু পুল থাকবে শাশ্বতকাল ধরে। সেই পুল ভেঙে যাবার ফলে আলিহোজার যেন বাঁচবার অবলম্বন হারিয়ে গেল। বুকে একটা ব্যথা অনুভব করায় সে বাড়ির পথ ধরল। টিলার উপর উঠতে খুব কষ্ট হচ্ছে। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে তার মনে হলো—If they

destroy here, then somewhere else someone else is building. Surely there are still peaceful countries and men of good sense who know of God's love? If God had abandoned this unlucky town on the Drina, she had surely not abandoned the whole world that was beneath the skies? They would not do this for ever.

অর্ধেক পথ উঠে আলিহোজা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আর উঠল না। তার মৃত্যু পাঠকের মনে তীব্র বেদনার সৃষ্টি করে না, কারণ আলিহোজা আশার বাণী শুনিয়ে গেছে শেষ মুহূর্তে। ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি শুধুই ধ্বংস করেন না, গড়েনও—এই বিশ্বাসের মধ্যেই আলিহোজার আশার জন্ম।

আন্দ্রিচ নিজে 'বোসনিয়ান স্টোরি' এবং 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা'-কে উপন্যাস বলেন না। তিনি বলেন, ক্রনিক্‌ল্‌, ঐতিহাসিক কাহিনী। 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা'র নায়ক পুলটির জন্ম-মৃত্যু দেখানো হয়েছে। অন্য চরিত্রগুলি মিছিলের মুখের মতো একটু দেখা দিয়ে হারিয়ে গেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম আলিহোজা। পুলের কথা বলবার জন্য এমনি একজন মানুষের প্রয়োজন ছিল। তুর্কী, ইহুদী, জিপসী, সার্ব, খ্রীষ্টান, মুসলমান—কত জাতি ও ধর্মের লোক সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে উঠে এসেছে তাঁর তুলির স্পর্শে। প্রত্যেকের জন্যই তাঁর গভীর মমতা। আন্দ্রিচের গল্পে নারী প্রধান, পুরুষকে তারা কাঁচপোকার মতো আকর্ষণ করে। কিন্তু 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা'য় নারীচরিত্র এবং প্রেম প্রায় অনুপস্থিত। লোটি এবং জোরকার জীবন সম্বন্ধে আন্দ্রিচ শুধু ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাদের সামনে আনেননি।

'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা'য় আন্দ্রিচের জীবনদর্শন পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রথম জীবনে বার বার আঘাত পেয়ে তিনি প্রশ্ন করেছেন: Why do you not look above the earth and over

yourself? But above there had been only the high frozen sky, and below the hard pitiless earth. The former unattainable and the latter unacceptable.

তাহলে আশ্রয় কোথায়? আলিহোজা পুলের স্থায়িত্বে আস্থা স্থাপন করে ঠকেছে। আন্দ্রিচ দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফলে উপলব্ধি করেছেন মানব-জীবনের শাশ্বত সত্যের উপর নির্ভর করলেই যথার্থ শান্তি পাওয়া যায়। পাপ, অন্যায়, অবিচার—এসব প্রত্যেক যুগেই ছিল এবং এখনও আছে। প্রত্যেক যুগের লোকই সমকালীন জীবনের ত্রুটিগুলি বড় করে দেখেছে। কিন্তু এগুলি জীবনের বহিরঙ্গ। অন্তরালবর্তী শাশ্বত জীবন অবিনশ্বর। মহাকালের পটভূমিকায় বর্তমান জীবনের দুঃখ-দুর্দৈব দুঃস্বপ্নের মতোই ক্ষণস্থায়ী।

জীবনের যে-অংশ অস্থায়ী তার রূপ বার বার পরিবর্তিত হয় এবং সেই পরিবর্তন সাধারণ মানুষের মনে দুঃখ এবং অতৃপ্তির কারণ হয়। কিন্তু যা চিরন্তন তার রূপ ও ধর্ম বদল হয় না। আকাশের নীলিমা কত লক্ষ বছর যাবৎ অবিকৃত রয়েছে; চালের খাদ্যগুণেরও কোনো পরিবর্তন হয়নি মানুষের অন্তরের দয়া, ভালোবাসা, ন্যায়বোধ এত আঘাত সত্ত্বেও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। শুধু ভালো দিক নয়; মন্দ দিকটাও যুগযুগান্তর ধরে তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। তাই আন্দ্রিচ তাঁর কাহিনীর প্রথমে দেখিয়েছেন রাদিসাভের শূলের উপরে মৃত্যু; আর সমাপ্তি পর্বে দেখছি অস্ট্রিয়ান সেনাধ্যক্ষ ভিশেগার্ড শহরে ভাজোকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে হত্যা করছে। শূল এবং ফাঁসিকাঠ অবশ্যই আলাদা; কিন্তু এই পার্থক্য একান্তই বাইরের। চার শতাব্দীর ব্যবধান সত্ত্বেও অত্যাচারীর মনের চেহারাটা এক।

মানুষের তৈরী পুল একদিন মানুষের হাতের আঘাতেই ভেঙে পড়ে। কিন্তু মানব-জীবনের ধারা চিরন্তন, অবিনশ্বর। সুতরাং পুল নয়, অন্য কিছু নয়, মানুষই মানুষের শেষ আশ্রয়। বিশেষ করে মানুষের সেই অংশটুকু, যা শাশ্বত জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত।